ডিসেম্বর ২০১৯

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২৬তম সংখ্যা

বিজয় দিবস সংখ্যা

যুদ্ধদিনের কথা

নিরীক্ষা

২২৬তম সংখ্যা : ডিসেম্বর ২০১৯ (বিশেষ সংখ্যা)

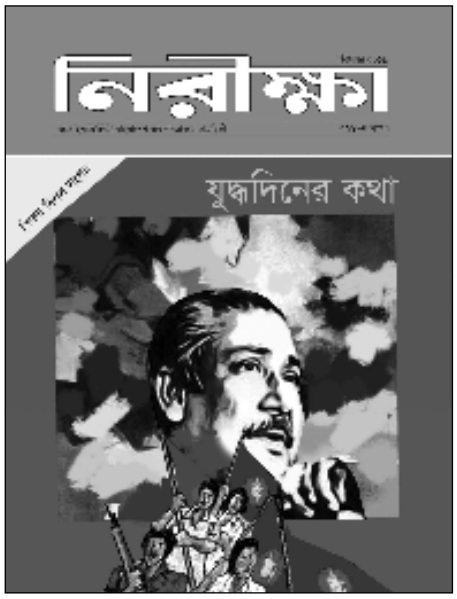

বিজয় দিবস মানেই বাঙালির নবজন্মকাল। জাতি হিসেবে বাঙালির হাজার বছরের সাধনা শেষে অর্জিত চূড়ান্ত বিজয়ের দিন। স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দিন। দখলদার বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস আর শান্তি কমিটিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার দিন।

৪৮ বছর আগে এই দিনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল নয় মাসের যুদ্ধ শেষের গান। সমবেত কণ্ঠে শব্দসৈনিকরা গেয়ে উঠেছিলেন, 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ ..., খুশির হাওয়ায় ঐ উড়ছে ..., মুক্তির আলোয় জ্বলছে...।' সেই আলোর ঝরনাধারায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল বিশ্বমানচিত্রে এক নতুন দেশ– বাংলাদেশ। গৌরবের, আনন্দের, অহংকারের, আত্মমর্যাদার ও আত্মোপলব্ধির দিনটি ছিল ১৬ ডিসেম্বর। একাত্তরের পঁচিশ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর মেশিনগান, কামান, ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শুরু করেছিল নির্বিচারে গণহত্যা। রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে। হাতে তুলে নিয়েছিল প্রতিরোধের অস্ত্র। গড়ে তুলেছিল দুর্গ। জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছিল। সেদিন কেবল পাকিস্তানি বর্বরদের সঙ্গে নয়, তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়েছে। বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে আলবদর, রাজাকাররা বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরও হত্যা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের সহযোগীরা পর্যুদস্ত হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। রেসকোর্স ময়দানে বিজয়ের দিন বিকেলে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনী। দখলদারমুক্ত হয় বাংলাদেশ। দিনটি বাঙালির বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার।

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নিরীক্ষা'র বিশেষ আয়োজন 'যুদ্ধদিনের কথা'। দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, যারা মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিক হিসেবে গিয়েছেন অথবা মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছেন– তাঁদের লেখা-স্মৃতিচারণ এবং সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হয়েছে এই সংখ্যায়। থাকছে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখা ভারতীয় সাংবাদিক-গণমাধ্যমকর্মীদের স্মৃতিচারণ। রয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক, কলামিস্ট ও সাংবাদিকদের লেখাও। আমরা বিশ্বাস করি, এই বিশেষ সংখ্যাটি থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে। নতুন প্রজন্ম জানবে তাদের পূর্বসূরিদের ইতিহাসগাথা। জয় বাংলা।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
ফায়জুল হক

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

আমার তীর্থ যাত্রা ৫
তোয়াব খান

যুদ্ধকালীন দিনগুলো ১৪
আবেদ খান

মনি ভাই আমাকে গেরিলা ট্রেনিং নিতে দেরাদুনে পাঠান ১৬
সৈয়দ আহমাদ ফারুখ

যুদ্ধদিনের কথা ১৯
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে বিলেতপ্রবাসী ছাত্রসমাজ ২৪
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

রাঙ্গামাটি মুক্ত হলো যেদিন ২৮
শামসুদ্দিন পেয়ারা

মা ও মাটির জন্য যুদ্ধ ৩১
ড. আরএম দেবনাথ

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ৩৪
আকরাম হোসেন খান

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নয় মাস ৩৬
মৃণাল কৃষ্ণ রায়

একদিনের রোজনামচা ৪০
আতিয়ার রহমান আতিক

মুক্তিযুদ্ধঃ দেরাদুনের টুকরো স্মৃতি ৪২
আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া

জুমন আলীর মানিকরতন ৪৮
আবু তাহের

১৯৭১ঃ কিছু স্মৃতিকথা ৫১
তরুণ তপন চক্রবর্তী

আমার মুক্তিযুদ্ধ ৫৪
মোহাম্মদ শাহজাহান

৫৭ **একাত্তরের 'জাগ্রত বাংলা'**
এসএ কালাম

৬০ **ফিরে আসেনি সেজো ভাই**
রেজা এনায়েত

৬৪ **৭ মার্চের ভাষণ জানিয়ে দেয় যুদ্ধ আসন্ন**
রাজন ভট্টাচার্য

৬৬ **সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প একাত্তরের 'সংবাদ পরিক্রমা'**
প্রণবেশ সেন

৮০ **ক্যাপ্টেন ডুগ্গাল: এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ**
মানস ঘোষ

৮২ **ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয় বাংলাদেশের জন্ম**
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

৯১ **দীপক-সুরজিৎ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ**
মানিক ব্যানার্জি

৯৩ **সেইসব দিন**
জহর সরকার

৯৬ **মুহিত পাল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ**
আইয়ুব রানা

৯৯ **যুদ্ধদিনে অবরুদ্ধ সংবাদপত্র**
ড. কামরুল হক

১০৭ **যুদ্ধদিনে মুক্তিবার্তা 'জয়বাংলা'**
শাহেলা আক্তার

১১২ **একাত্তরের ফটোসাংবাদিকতা ও মিশেল লরেন্ট**
মিনহাজ উদ্দিন

১১৫ **মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সন্ধানে**
জাফর ওয়াজেদ

১১৭ **চরণ ছুঁয়ে যাই**
পপি দেবী থাপা

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২২৬তম সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৯ (বিশেষ সংখ্যা)

সূচিপত্র

১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহের এক বিকেল। অফিসে সকালের কাজ শেষে বাসায় ফিরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি। এমন সময় আমাদের পত্রিকার চিফ রিপোর্টার ফোন করলেন। জানতে চাইলেন আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে। আমি একটু অবাকই হলাম। সকালে অফিসে দেখা হলো। সম্পাদকীয় ও বার্তা বিভাগে সকলের সঙ্গে মিটিং-আলোচনায় নানা কথা উঠেছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন শুনিনি

দেখুন- পৃষ্ঠা ৫

১৯৭১ সাল। কলকাতা শহর। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। তখনও এলাকাটি ততটা কর্মচঞ্চল ছিল না। সার্কুলার রোডের মোড়ে একটি পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্ট। চা, তরকা (একটি পাঞ্জাবি রেসিপি) থাকত খাবার। সবসময়ই রেস্টুরেন্টে ভিড় জমে থাকত। সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাদ্যদ্রব্যাদি অত্যন্ত অল্পদামে পাওয়া যেত। ফলে এ দোকানটি ছিল আমাদের (স্বাধীন বাংলা বেতারের মুক্তিযোদ্ধাদের) একটি আকর্ষণ কেন্দ্র

দেখুন- পৃষ্ঠা ৩৬

শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে প্রথম স্মৃতি আমার মর্মমূলে গেঁথে আছে, কারণ সেটা আইনের সঙ্গে আমার প্রথম সংঘর্ষও বটে। মাসটা ছিল জানুয়ারি, **১৯৬৯** সাল। আমার একাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ঠিক এক মাস পরের কথা। আমার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু বলেছিলেন, পাকিস্তানি হাইকমিশনের বাইরে শেখ মুজিবের জেল থেকে মুক্তির দাবিতে আমাদেরকে এক প্রতিবাদ অবস্থানে অবশ্যই শামিল হতে হবে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৯৩

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক উজ্জ্বল ইতিহাস। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী অধ্যায়। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কত কঠিন সংগ্রাম আর আত্মদান করতে হয়েছে, জানে তা বাঙালি। কিন্তু এই অবদানচিত্র ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। 'বাঙালির ইতিহাস নাই' বলে এককালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ১১৫

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

লেখা আহবান

বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাপরিচালক এবং সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহ আলমগীর স্মরণে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগ্রহী সাংবাদিক, লেখক, সহকর্মী ও গুণগ্রাহীদের আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইলঃ pibnirikkha@gmail.com
dgpib@yahoo.com

আমার তীর্থ যাত্রা

তোয়াব খান

১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহের এক বিকেল। অফিসে সকালের কাজ শেষে বাসায় ফিরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি। এমন সময় আমাদের পত্রিকার চিফ রিপোর্টার ফোন করলেন। জানতে চাইলেন আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে। আমি একটু অবাকই হলাম। সকালে অফিসে দেখা হলো। সম্পাদকীয় ও বার্তা বিভাগে সকলের সঙ্গে মিটিং-আলোচনায় নানা কথা উঠেছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন শুনিনি। চিফ রিপোর্টারকে জানালাম, স্বাস্থ্যে আবার নতুন কিছু তো ঘটেনি, ভালই আছি। তাঁর জবাব, না, আপনার স্বাস্থ্য ভালো নেই। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখান। টেলিফোনে আর কোনো কথা হলো না। ভাবছিলাম হঠাৎ স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেন। চিফ রিপোর্টার কোনো নবীন সাংবাদিক নন। দীর্ঘদিন পেশায় ও রাজনীতিতে পোড় খাওয়া ব্যক্তি। সাংবাদিক ইউনিয়নেরও একজন সক্রিয় নেতা। সব মহলেই যথেষ্ট পরিচিতি আছে। তাই স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর এই প্রশ্ন একটু চিন্তার বিষয়। ইতোমধ্যে আবার টেলিফোন। এবার আমাদের পত্রিকার একজন সিনিয়র সহকারী সম্পাদক। তিনি অবশ্য হেঁয়ালিতে যাননি। সরাসরি জানালেন, যা কিছু করার আজ রাতের মধ্যেই শেষ করে ফেলুন। কাল আপনার সঙ্গে দেখা না হলেই মঙ্গল। ওরা দুজনেই যে বার্তাটি দিতে চাচ্ছেন– এবার আমার কাছে সেটা পরিষ্কার হলো। সহকারী সম্পাদক আরও জানালেন, আপনার স্বাস্থ্যটা বাইরে কোনোখানে পরীক্ষা-টরীক্ষা করান। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই স্বাস্থ্যবিষয়ক বার্তা তিনি পেয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম, সকালেই আমাকে ঢাকা ছাড়তে হবে।

২৫ মার্চের কালরাত্রির পর পাকিস্তানি বাহিনী দিনের পর দিন গোটা দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ, লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল তাতে প্রতিটি নাগরিকেরই নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কথা। অন্যদিকে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর দেশপ্রেমিক মাত্রই মুক্তিযুদ্ধে যে কোনো উপায়ে শামিল হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। এপ্রিলেই আমাদের পরিবারের সকলে ঢাকা ছেড়ে আগরতলা হয়ে কলকাতায় চলে যান। বাড়িতে শুধু আমি আর আমার ছোটো ভাই বাচ্চু। আমরাও যাওয়ার

প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। অফিসেও অনেকে অনুপস্থিত। কেউ কেউ চলেও গেছেন। সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী তো রীতিমতো জানিয়েই ঢাকা ছেড়ে গেছেন।

সংবাদপত্র অবরুদ্ধ। কঠোর সেন্সর বলবৎ করা হয়েছে। যা বলা হবে অর্থাৎ পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যা বলবে, যেভাবে বলবে, সেভাবেই লিখতে হবে। ছাপাতে হবে। পঁচিশে মার্চের পর বেশ কয়েক দিন তো সংবাদপত্র বন্ধই ছিল। প্রকাশনা পুনরারম্ভের পর দখলদার বাহিনীর দেওয়া খবরই শুধু ছাপা হতো। সম্পাদকীয় কেউ লিখত না। নিজস্ব প্রতিবেদন প্রকাশের ধারেকাছেও কেউ যেত না। দখলদারদের দেওয়া তথ্যবিবরণী (হ্যান্ডআউট) এবং তাদের বার্তা সংস্থা এপিপি (অ্যাসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তান) পরিবেশিত খবরই ছাপা হতো। কয়েকদিনের মধ্যেই দখলদারদের খেয়াল হলো সংবাদপত্রগুলো তো নিজেদের কোনো অভিমত বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করছে না। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি, অবশ্যই সম্পাদকীয় লিখতে হবে। পত্রিকা পড়ার লোক নেই অর্থাৎ পাঠক। গ্রাহক সংখ্যা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। দলে দলে লোক ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। ইত্তেফাক আর সংবাদ দুটো সংবাদপত্র অফিস কামানের গোলা দেগে জ্বালিয়ে দিয়েছে। পত্রিকাগুলো পৃষ্ঠাসংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছে। সেন্সরের জাঁতাকলে পাঠকের জন্য আকর্ষণীয় কোনো কিছুই ছাপানো যাচ্ছে না। চারটি পত্রিকা প্রথমে সম্পাদকীয় লিখতে আরম্ভ করল– অবজারভার হাউসের পাকিস্তান অবজারভার আর পূর্বদেশ। প্রেস ট্রাস্টের মর্নিং নিউজ আর দৈনিক আজাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই দৈনিক পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হলো, কাল থেকে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপায়ন্তর না দেখে দৈনিক পাকিস্তানও সম্পাদকীয় লেখার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যত্র। সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে কবি হাসান হাফিজুর রহমান পঁচিশে মার্চের পর কোনোদিনই আসেন না। তিনি নাকি ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন। হাসান সাহেব ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ বিজয় দিবসের আগে আর কোনোদিনই দৈনিক পাকিস্তানে কাজে যোগ দেননি। কবি শামসুর রাহমান ঢাকাতেই ছিলেন, তবে অফিসে আসেন না। আহমেদ হুমায়ুন অফিসে আসেন; কিন্তু সম্পাদকীয় লেখার ফরমান জারি হওয়ার পর ঢাকা ছেড়ে দেশের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে গেছেন। নিয়মিত অফিস করেন সহকারী সম্পাদকের মধ্যে সানাউল্লাহ নূরী আর মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। এরা ওইদিন সম্পাদকীয় লিখতে অস্বীকৃতি জানান। তাদের বক্তব্য, দখলদারদের গুণকীর্তনে তাদেরকেই শুধু ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই তারা প্রথমদিন লিখবেন না। অনন্যোপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রবীণ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকেই সেদিন সম্পাদকীয় লিখতে হয়েছিল। সম্পাদকীয়টির বিষয়বস্তু, ভাষা, তথ্য ও উপস্থাপনাটি শতভাগ দখলদার পাকিদের নির্দেশনা অনুসরণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের যথারীতি মিসক্রিয়ান্টস দেশদ্রোহী ভারতীয় দালালরূপে আখ্যায়িত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ এবং দলে দলে মানুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াকে রুশ-ভারতের আগ্রাসনের পরিণতিরূপে উল্লেখ করা হয়।

এই সম্পাদকীয় যেদিন লেখা হলো, সেদিনই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট প্রদগর্নি এবং প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার নিন্দা জানালেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় সমস্যার নিষ্পত্তি করতে বললেন। রাতে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার পুরোপুরি বিরোধী এই সম্পাদকীয়টি এমন একটি দিনে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নও প্রকারান্তরে বাংলাদেশের পক্ষ নিয়েছে। সম্পাদকীয়টি জাতিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। আমরা চাইনি এমন একটি মুক্তিযুদ্ধদ্রোহী সম্পাদকীয় নিয়ে পত্রিকাটি পাঠকের হাতে পৌঁছাক। টেলিফোনে পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহসান আহমদ আশকের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হলো, ছাপানোর পর পত্রিকার সব কপি তাঁর কক্ষে আটকে রাখা হবে। কালরাত্রির সেই সব দিনগুলোয় পত্রিকা ছাপা হতো মাত্র কয়েক হাজার। আটকে রাখার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা ঘটেনি। কিন্তু ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হয়ে গেছে। পরদিন সকালেই তোলপাড়। দখলদার বাহিনী, তাদের আজ্ঞাবহ প্রশাসন, পাকি দালাল সবাই হামলে পড়ে দৈনিক পাকিস্তানের কপি খুঁজতে। আহসান আহমদ আশক সকালেই দখলদারদের ঘাঁটিগুলোয় পত্রিকার কপি সবার আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবেই সেদিন কোনোমতে ধাক্কাটি সামাল দেওয়া গিয়েছে। তবে এ বিষয়ে আশক সাহেব যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর বড়ো সুবিধা এটাই যে তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত উর্দু কবি। তদুপরি ফরিদপুরের বিখ্যাত লাল মিয়া-মোহন মিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে লাল মিয়ার জামাতা। এই সূত্রে দখলদার বাহিনী, পাকি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি এবং পাকিস্তানের উর্দুভাষী ব্যবসায়ী– এদের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিল। ফলে তিনি অনেক ক্ষেত্রে পার পেয়ে যেতেন।

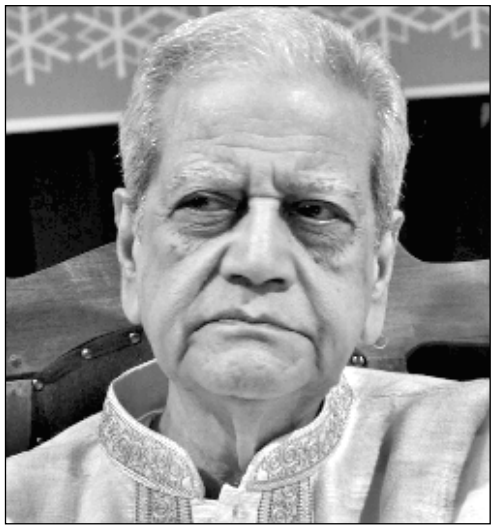
তোয়াব খান

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে দখলদাররা এটা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগে যে সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে। যদিও প্রতিদিন সেনাবাহিনীর ট্রাক বোঝাই করে লাল ত্রিপল দিয়ে ঢেকে নিয়ে যেতে আমরা অফিসে দাঁড়িয়েই দেখেছি। সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দল তারা পাঠালো স্বাভাবিক অবস্থার প্রচারের জন্য। এই প্রতিনিধিদলে লাহোর-করাচির অনেক নামকরা সাংবাদিক ছিলেন। ছিলেন এসআর ঘোরি, এবিএম জাফরি প্রমুখ। আবার এটাও শুনেছি মাজহার আলী খান, (প্রখ্যাত বামপন্থি নেতা তারিক আলীর বাবা), এটি চৌধুরী, আসরার আহমদের মতো সম্পাদক-সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। পাকি দখলদারদের 'স্বাভাবিক অবস্থা' প্রমাণের ঢাক পেটানো চেষ্টার সবচেয়ে বড়ো ব্যাক ফায়ার অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস। তিনি এখানে এসে ঘুরে গিয়ে পাকি দখলদারদের মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর মতো একটি বই লিখেছিলেন– দ্য রেপ অব বাংলাদেশ।

সাংবাদিকদের প্রতিনিধিদলটি আমাদের অফিস দৈনিক পাকিস্তানেও আসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। মতবিনিময়ের বৈঠকে সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আহসান আহমদ আশক, সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে মাহফুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী এবং বার্তা সম্পাদক হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম। আলোচনার একপর্যায়ে পাকি সাংবাদিকরা জানতে চান নূরুল আমিনের নেতৃত্বে যদি একটি অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে কি মানুষের আস্থা ফিরবে? সম্পাদকসহ কেউ কেউ সম্মতিসূচক মত দিতে থাকেন। আমার মনে হলো, এটা দখলদার বাহিনীর গণহত্যায় নিহত লাখ লাখ শহিদের প্রতি চরম অবমাননার শামিল। আমার ধারণাটা আমি কোনো রকমের রাখঢাক না করেই জানিয়েছিলাম। কেউ কেউ মনঃক্ষুণ্ন, ক্ষুব্ধ হলেন। আমার বক্তব্যটি ছিল ভাষা আন্দোলন ও শহিদ মিনারকেন্দ্রিক। এ পর্যন্ত এদেশের মানুষের আন্দোলন দমনের জন্য জেল-জুলুম ইত্যাদি নানা ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউই শহিদ মিনারের ক্ষতি করেনি। কিন্তু দখলদার বাহিনী কামান দেগে শহিদ মিনার ভেঙে দিয়েছে। বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতি। সব আন্দোলনের তীর্থভূমি একুশের শহিদ মিনার। এই শহিদ মিনার গুঁড়িয়ে দিয়ে, যার নির্দেশে নৃশংস গুলিবর্ষণের ফলে সালাম-বরকত-রফিকরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে; সেই ব্যক্তির নেতৃত্বে সরকার গঠন করলে বাঙালির আস্থা ফিরবে কীভাবে? তারপরেও লাখ লাখ শহিদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করার বিষয়টি তো রয়েই গেল। আমার এই বক্তব্যে সম্পাদক খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রয়োজন হলে ১০ লাখ লোককে মারতে হবে। পাকি দখলদার বাহিনী সম্পাদকের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। তারা ১০ লাখ নয়, ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করে। তাতেও অবশ্য ওদের পাকিস্তানের অস্তিত্ব পূর্ব বাংলার এই ভূখণ্ডে টিকে থাকেনি।

অন্যদিকে দখলদাররা তাদের বশংবদ ও দালাল বুদ্ধিজীবী খুঁজতে শুরু করে দিল। রেডিও পাকিস্তানে কাজ করতেন এক কবি, তাদের হয়ে অফিসে অফিসে ধরনা দিতে শুরু করলেন পাকিস্তানি দখলদারদের পক্ষে সাফাই গাওয়া এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর জোগাড়ের জন্য। এই লোকটি আমাকেও অনুরোধ করেছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্মদিনে একটি কথিকা লেখার জন্য। আমার প্রাথমিক ধারণা ছিল শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্মদিনে গণতন্ত্রের কথাটা জোরেশোরে বলা যাবে। গণতন্ত্রহীন গণহত্যার দেশে গণতন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এটি মন্দ হবে না।

ঘটনাচক্রে ওই কবির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল আমাদের অফিসেই। তিনি পাকি দখলদার বাহিনীর গণহত্যার পক্ষে সাফাই গাওয়া এক বিবৃতিতে কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সম্পাদক-সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য সংবাদপত্র অফিসে অফিসে ধরনা দিচ্ছিলেন। জানালেন আমাদের অফিসের বেশ কয়েকজন আলোচ্য বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। স্বাক্ষরদাতাদের তালিকায় ছিলেন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী, কবি আহসান হাবিব প্রমুখ। স্বাক্ষর সংগ্রহকারী বিবৃতিটিতে স্বাক্ষরের অনুরোধ জানানোর সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিচ্ছিলেন, যারা স্বাক্ষর করবেন না, তাদের ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে কৈফিয়ত দিয়ে আসতে হবে, কেন তাঁরা স্বাক্ষর করবেন না। চরম এক বৈরী সময়ে এ ধরনের হুমকির কাছে নতি স্বীকার না করার মতো ক'জনের সাহস ছিল বলা মুশকিল। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় সানাউল্লাহ নূরী সাহেব এসে আমাকে জানালেন, আগে তো নিজের জীবন বাঁচাই, পরে কী হয় দেখা যাবে। আমি ক্যান্টনমেন্টে যেতে পারব না। তিনি অবশ্য আমার জবাব প্রত্যাশা করেননি। করলেও কী বলতে পারতাম। একটা কথা অবশ্য ছিল। এখন তো জীবনটা বাঁচল, পরে প্রাণটা না যায়। প্রাণ অবশ্য তাঁদের কারও যায়নি। বহালতবিয়তেই ছিলেন। পরবর্তীকালে শুনেছি, পাকি দখলদার বাহিনীর এই অনুচরটি দৈনিক অবজারভার অফিসে বিশিষ্ট সাংবাদিক কে জি মুস্তাফা সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিপ্রায়ে। কিন্তু কে জি মুস্তাফা যিনি কেজি ভাই হিসেবেই সাংবাদিক-মহলে সমধিক পরিচিত, ওই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ অবজারভার অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তা না করলে তাকে অবজারভার ভবনের দোতলার বারান্দা থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। জান বাঁচানোর পরোয়া না করার এটা একটি দৃষ্টান্ত। গণহত্যাকে সমর্থন, আওয়ামী লীগের নিন্দা এবং মুক্তিবাহিনী তথা মুক্তিযুদ্ধকে নাশকতা আখ্যাদান এবং ঘাতক ইয়াহিয়া খানের প্রশস্তি গাওয়া বক্তব্যটি ৫৫ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি হিসেবে পরিচিতি পায়।

পাকি বাহিনীর অনুচরটির সঙ্গে অফিসের বারান্দায় দেখা হওয়ায় জানতে চেয়েছিলাম সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জন্মদিনের কথিকায় আমি তো গণতন্ত্রের কথাই বলব। কারণ গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিয়ে বলতে যাওয়াটা বাতুলতা মাত্র। এ কথা শুনে ওই ব্যক্তি, যিনি রেডিও পাকিস্তানের একজন কর্মকর্তাও, আমাকে জানালেন, শুধু পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ঐক্য বজায় রাখতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভূমিকা নিয়ে বলতে হবে। তিনি যে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, এ কথাই বলবেন। আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের প্রস্তাবের বিষয়ে আমার বক্তব্য পরে জানাব। বলা বাহুল্য, রেডিও পাকিস্তানের ওই অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করিনি।

এভাবেই শ্বাসরুদ্ধকর সন্ত্রাসী পরিবেশে আমাদের সাংবাদিকদের দিন কাটছিল। অফিসে নিজের রুম থেকেই দেখতে পেতাম দখলদার সেনাবাহিনীর ট্রাকে মানুষের লাশ বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। কোথায়-কীভাবে লোকগুলোকে হত্যা করা হয়েছে, কে বলবে! এত লাশের পরও বলতে হবে, দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে!

১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের দিন পাকি দখলদাররা বিমান, ট্যাঙ্ক ও কামানের বহর নিয়ে ময়মনসিংহ দখল করে। একটি বিবৃতিতে তারা আজগুবি সব কথা বলে। তাদের ভাষ্যমতে, মুক্তিবাহিনী তথা বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈনিকরা লুটপাট করেছে, মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করেছে ইত্যাদি। এসব মিথ্যা বয়ান পত্রিকায় ফলাও করে ছাপার নির্দেশ দেয় পাকি দখলদার বাহিনী। পরের দিন শান্তি ও সংহতি পরিষদের নামে একই ধরনের বিবরণ ফের সাংবাদপত্র অফিসে পাঠানো হয়। এই শান্তি ও সংহতি পরিষদ নামের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংগঠনটির ঢাকায় আবির্ভাব ঘটে মেজর জেনারেল ওমরাও খানের অধিনায়কত্বে। এই জেনারেল ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের মার্শাল ল'কালে ছিলেন ঢাকায় চতুর্দশ (১৪) ডিভিশনের জিওসি। '৭১ সালে এই লোকের জামায়াতে ইসলামীর অনুষঙ্গ ঘটে এবং দেশবাসীকে জামায়াতের হয়ে হেদায়েত করতে শুরু করে।

দখলদার বাহিনীর অনুচর জামায়াত নেতারা শান্তি ও সংহতি কমিটির আলখেল্লা নিয়ে সাংবাদিক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর নজরদারি শুরু করে। তারা নিয়মিত পাকি সেনা ইনফরমারের কাজ করছিল। মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাসরত এক মহিলা আমাদের পত্রিকার মহিলা সাংবাদিকের মাধ্যমে আমাকে সাবধানে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। কারফিউর মধ্যে আটকা পড়ে তাঁকে তাঁর আত্মীয় জামায়াত নেতার বাসায় রাত কাটাতে হয়। সেখানে তিনি জামায়াত নেতার সহকর্মীদের আলোচনা থেকে জানতে পারেন দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদককে সরিয়ে না দিলে পাকিস্তানপ্রেমিদের খবরাখবর ওই পত্রিকায় ভালোভাবে যাবে না। তাই পাকিস্তানকে হেফাজত করার স্বার্থেই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জামায়াত নেতাদের মুখে 'কঠোর ব্যবস্থা'র কথা শুনে ভদ্রমহিলা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। একই সময়ে আরও একটি ঘটনা আমার নিরাপত্তা নিয়ে সহকর্মীদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। আগের রাতে মর্নিং নিউজ অফিসের গেটে মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা গ্রেনেড হামলা চালায়। এ নিয়ে তদন্তে এসে পাকি বাহিনী মর্নিং নিউজ দৈনিক পাকিস্তান ভবনটিতে তদন্ত তল্লাশির নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। সন্ধ্যায় পাকি সেনাদের আরও একটি দল এসে বিকেলের শিফটে কর্মরত সাংবাদিকদের রীতিমতো জেরা শুরু করে দেয়। 'জাসুস' শব্দের অর্থ না জেনেই শিফট ইনচার্জ পাকি সেনাদের বক্তব্যে স্বীকৃতি দেন। পাকিরাও সঙ্গে সঙ্গে 'জাসুস' কোথায় আছে জানাতে বলে। শিফটে উর্দুজানা সাংবাদিক মাওলানা আউয়াল তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলেন জাসুস শব্দের অর্থ না জানার ফলেই বিপত্তি ঘটেছে। এই মাওলানা আওয়াল পরবর্তীকালে ইসলামী ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত হয়েছিল। শিফট ইনচার্জ তখন আবার উর্দুতে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন– 'ও মেরা মালুম নেহি। নিউজ এডিটর সাব জানতা হ্যায়।' এই জবাবে পাকিরা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, 'তুম এক দফা বলতা তুম জানতা হ্যায়। দোসরা দফায় ক্যাহেতা হ্যায় তুরকো মালুম নেহি। নিউজ এডিটার জানতা হ্যায়। তুম সাচ্চা আদমি নেহি। হামারি সাথ চলো ক্যান্টনমেন্ট।' এভাবেই বিকেলের শিফটের ইনচার্জ সৈয়দ আবদুল কাহারকে পাকি সেনারা ধরে নিয়ে যায়।

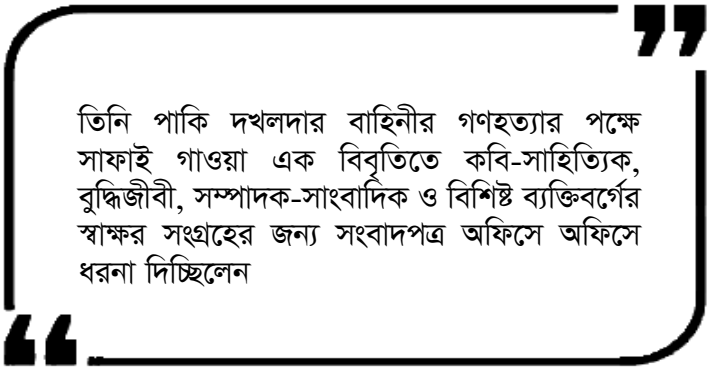

আমাকে সতর্ক করে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ জানিয়ে চিফ রিপোর্টার আলী আশরাফ সাহেব এবং সহকারী সম্পাদক আহমেদ হুমায়ুন যে বার্তা দিয়েছিলেন, তার পটভূমি ছিল এটাই। তাদের সমূহ শঙ্কা ছিল, পাকি দখলদার বাহিনী আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

বাড়িতে আমাদের গোটা পরিবার এবং আমার শ্বশুরবাড়ির সকলেই দেশের অবস্থা, পাকি সেনাদের গণহত্যা নির্বিচারে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া নিয়ে সজাগ ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এ অবস্থার মধ্যে বসবাস একেবারেই নিরাপদ নয়। নির্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার উপায় খুঁজছিলাম আমরা। আমার স্ত্রীর খালাতো ভাই ছিলেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে, মেজর জামান। তাঁর বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। গাড়িতে যাওয়ার পথে চান্দিনার কাছে

গোলাগুলির মধ্যে পড়ে ফিরে আসতে হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকি বাহিনীর তুমুল লড়াই চলছিল। চান্দিনা থেকে ফিরে আসার ফলে সবাই প্রাণে বেঁচে যান। ১৬ ডিসেম্বর দেশ পাকি কবলমুক্ত হওয়ার পর আমরা জানতে পারি মেজর জামানকে পাকিরা ধরে নিয়ে মেরে ফেলে। সেনানিবাস এলাকায় একটি স্থানে অন্যান্য বাঙালি অফিসার ও সৈনিকের সঙ্গে মেজর জামানকে মেরে বালিচাপা দিয়ে পুঁতে রাখা হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে খবর পাওয়া গেল কুমিল্লার সীমান্তবর্তী গ্রাম রাজাপুর দিয়ে আগরতলা যাওয়া সম্ভব। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার পুরো পরিবার অর্থাৎ স্ত্রী, দুই কন্যা, এক ছোটো ভাই, এক শ্যালক ও দুই শ্যালিকা রাজাপুর চলে যায়। সঙ্গে গাইড হিসেবে এক শ্যালক গিয়েছিল। কিন্তু নিরাপদে রাজাপুর পৌঁছানো এবং সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরায় যাওয়া খবরটি নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসে। রাজাপুর একেবারে সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম। ওপাশেই ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বক্সনগর। রাজাপুর গ্রামটি আমাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল এক কারণে যে, ওই গ্রামেই আমার এক ছোটো ভাই ওবায়দুল কবির বাচ্চুর কলেজের এক বন্ধু ফরহাদের বাড়ি। বাচ্চু আমার সঙ্গে ঢাকায় রয়ে যায়। আরেক ভাই ওবায়দুল আরিফ ছোট্টু এবং শ্যালক সাইদুল আনাম টুটুল পুরো পরিবারটিকে নিয়ে যায়। গাড়ি করে না নিয়ে বাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ বাসে চলাচল তুলনামূলকভাবে কিছুটা নিরাপদ। পুরো পরিবার কিছুটা নিরুপদ্রবে রাজাপুর যায় এবং পরের দিন সীমান্ত অতিক্রম করে বক্সনগর পৌঁছায়। রাজাপুরের ফরহাদদের পরিবারের অকৃত্রিম আতিথেয়তা স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো। ফরহাদের এক ভাই ক্যাপ্টেন গিয়াসকে তথাকথিত জিয়া হত্যা মামলায় ফাঁসি দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রয়াত সাইদুল আনাম টুটুল জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার। আমার দুই ভাই বাচ্চু ও ছোট্টু উভয়েই মুক্তিযোদ্ধা।

লাল চিহ্ন দেখে মনে হলো ব্রিগেডিয়ার বা তদূর্ধ্ব কেউ হবে। পাকি সেনারা আমাদের স্কুটার থামিয়ে জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছি, চলাচলের পাস আছে কি না। সঙ্গে ছিল ঢাকার একটি পাস

গোটা পরিবারকে ভারত পাঠিয়ে দিয়ে আমি ও বাচ্চু প্রস্তুতি নিয়ে যথাসময়ে ঢাকা ত্যাগের অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময়েই এলো 'স্বাস্থ্য ভালো নয়' বার্তা। তাই কিছুটা অনন্যোপায় হয়ে পরের দিন ভোরেই ঢাকা ত্যাগ করতে হলো। রাতের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির সকলকে জানিয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলতে হয়। সিদ্ধান্ত নিলাম আমি ও বাচ্চু আমরা দু'জন রাজাপুর যাব স্কুটারে করে। বাসে অনেক ঝামেলা। কখন পরিচিত কার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তখনকার দিনে কুমিল্লা যেতে হলে পথে অন্তত তিনটি স্থানে কাঁচপুর ঘাট, মেঘনা ঘাট ও দাউদকান্দিতে নদী পার হতে ফেরির সাহায্য লাগত। সকালে রিকশায় বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার পথে আরেক বিব্রতকর অবস্থা। উলটোদিক থেকে আরেক রিকশায় আমাদের রিপোর্টার হেদায়েত হোসেন মোরশেদ। ইশারায় জানতে চাচ্ছে, আমরা কি ওদিকে যাচ্ছি। আর ওদিকটা কোন দিক, সেটা বাচ্চাছেলেরাও বুঝতে পারে। বাসস্ট্যান্ডের কিছু আগে আমরা একটি স্কুটার ভাড়া করে কাঁচপুর ঘাটের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। কাঁচপুর ঘাটে ফেরিতে নদী পার হয়ে, মেঘনা পেরিয়ে আবার একটি স্কুটার নিয়ে চললাম দাউদকান্দি অভিমুখে। যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন ছিলনা মোটেও। দাউদকান্দি থেকে ফের স্কুটারে চান্দিনা তথা রাজাপুর যাত্রা। চান্দিনার কাছাকাছি এসে আরেক বিপদ। পাকিসেনাদের একটি দল যাচ্ছিল। লাল চিহ্ন দেখে মনে হলো ব্রিগেডিয়ার বা তদূর্ধ্ব কেউ হবে। পাকি সেনারা আমাদের স্কুটার থামিয়ে জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছি, চলাচলের পাস আছে কি না। সঙ্গে ছিল ঢাকার একটি পাস। সেটাই দিলাম। ওদের ইংরেজি জ্ঞানের বহর জানা ছিল। পাসটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে ফেরত দিল এবং নিষ্ক্রান্ত হলো। তবে চান্দিনা পৌঁছে স্কুটার আর রাজাপুর যেতে চাইল না। বলল তোমরা একটি রিকশা নিয়ে চলে যাও, সামনেই রাজাপুর। ফরহাদদের বাড়িতে সকলেই সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। ওরা আগেই জানত, আমরা যে কোনোদিন আসতে পারি। পরিবারের সদস্যরাও সীমান্ত অতিক্রমকালে ফরহাদকে জানিয়েছিল আমাদের কথা। বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও পরিবারটি যেভাবে একের পর এক শরণার্থী দলকে সীমান্ত পার হতে সাহায্য করেছে, এজন্য কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া কিছুই তো করার ছিল না। বিপদের দিনে মনুষ্যত্বের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরদিন সকালেই আমরা সীমান্ত পার হয়ে বক্সনগর পৌঁছে যাই। লাউডস্পিকারে তখন বেজে চলেছে– 'শোন একটি মুজিবের কণ্ঠে ...।' তারপর এলো– মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি, জয় বাংলা এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বন্দিশিবির থেকে এসে যেন মুক্তাঞ্চলের স্বাদ পাওয়া। স্থানীয় থানায় নামধাম লিখিয়ে আগরতলার উদ্দেশে যাত্রা। বাহন হিন্দুস্তান মোটরের একটি অ্যাম্বাসেডর কার। ভাড়ায় সার্ভিস দিচ্ছে। গাড়িটিতে প্রায় ৫০ জন যাত্রী আমাদের সঙ্গে চলেছেন আগরতলার উদ্দেশে। তবে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় গাড়ির চালককে তার দক্ষতার জন্য। তিনি অজস্র মোড় আর আঁকাবাঁকা সড়কে যেভাবে গাড়িটি নিয়ে নিরাপদে আগরতলা পৌঁছলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আগরতলায় পৌঁছেই আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের সরকারের ক্যাম্প অফিসে নাম নথিভুক্ত করে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সনদ তথা চিরকুট গ্রহণ। এই চিরকুটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ত্রিপুরা-পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই যান, জয় বাংলার ওই ক্ষুদ্র চিরকুটটি প্রায় ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আমাদের গন্তব্য কলকাতা, তাই রাত কাটানোর মতো জায়গা খুঁজছিলাম। পেয়েও গেলাম। ছোটো একটি হোটেল। এখানে একটু বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হোটেলে অবস্থানকারী নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের এক শিক্ষক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। আশ্বস্ত হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। আমরা যত দ্রুত সম্ভব কলকাতায় পৌঁছতে চাচ্ছিলাম। সেখানে আমাদের আত্মীয়স্বজন আছেন। আমাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত কলকাতা পৌঁছার একটিমাত্র পথ– বিমানে আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়া। জানা গেল, আগরতলা থেকে প্রতিদিন টাটার জ্যাম এয়ারের একটি উড়োজাহাজ কলকাতা যায়। উড়োজাহাজটি মেঘালয় হয়ে হিমালয়ের ওপর দিয়ে দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি অতিক্রম করে কলকাতায় পৌঁছায়। বিমানটি সকালে আগরতলা আসে কলকাতা থেকে কার্গো বিমান হিসেবে। অর্থাৎ ত্রিপুরা তথা আগরতলার জন্য পণ্য বহন করে নিয়ে আসে। আর ফেরার পথে যাত্রী নিয়ে যায়। এই কার্গো বিমানের আসনবিন্যাস সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানের মতো নয়। এত সব সূক্ষ্ম বিষয় বিবেচনা করার মতো অবস্থা আমাদের ছিল না। আমরা কিছু পাকিস্তানি টাকা আগরতলা থেকে ভাঙিয়ে ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে তৈরি হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের জানানো হলো জ্যাম এয়ারের টিকিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সরকারি কোটা ইত্যাদি বাদ দিলেও লাইন দিয়ে টিকিট কিনতে হয়। সেখানেও নানা ঝক্কিঝামেলা। যাই হোক, পৌঁছলাম জ্যাম এয়ার অফিসে। প্রায় এতিমের মতো অবস্থা। অকস্মাৎ জ্যাম এয়ারের এক মহিলা কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমরা কী জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা কি কলকাতা যেতে চাই? আমরা কোথা থেকে আসছি, কী আমাদের পরিচয়? মনে হলো বরফ হয়তো গলতে পারে। আমাদের পরিচয় গন্তব্য, উদ্দেশ্য সবিস্তারে জানানোর পর ভদ্র মহিলা বললেন, ও আপনারা জয় বাংলার লোক। দাঁড়ান দেখি, কী করা যায়। বলেই নিষ্ক্রান্ত হলেন। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন, ভাড়ার টাকা দিন। মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের দুটো টিকিট এনে দিলেন। ভারতের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে জয় বাংলার লোকজনদের জন্য অকাতরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, ভাবলে আজও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধে মন ভরে যায়।

বিকেলের দিকে দমদম বিমানবন্দরে। কলকাতায় পৌঁছেই রাজ্যের যত চিন্তা মাথায় চেপে বসল। এতদিন তো শুধু নিজেদের চিন্তায় ছিলাম ব্যতিব্যস্ত। আমার গোটা পরিবার কী অবস্থায় আছে, আদৌ কলকাতায় পৌঁছতে পেরেছে কি না, তা-ও জানি না। আমার ছোটো মেয়ে এষার বয়স দু'বছর হয়নি। ২৫ মার্চের রাতে গোলাবর্ষণ থেকে বাঁচার জন্য বাসাবাড়ির

সিঁড়ির নিচে বাড়িওয়ালার বাড়ির লোকজন এবং আমাদের পরিবারের সবাই আশ্রয় নেয়। ছোটো এতটুকু জায়গায় এত মানুষের দীর্ঘক্ষণ আটকা থাকার ফলে সর্দি-গর্মিতে এষার সর্দি-কাশি হয়ে যায়। কাশিটি পরে হুপিংকাশিতে পরিণত হয়। আগরতলা থেকে জরাজীর্ণ গাড়িতে ধর্মনগর। সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ। এই দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য ট্রেনযাত্রায় মেয়েটির কী অবস্থা হয়েছে, তাও জানি না। মাথায় এসব চিন্তা নিয়ে কলকাতায় নারকেলডাঙ্গায় আমাদের আত্মীয়ের ডেরায় পৌঁছে গেলাম। বাড়িটি বাসস্থান ও অফিস দুটো কাজেই ব্যবহার হতো। ডেরার অভিভাবক জানালেন, তাঁরা আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আমার পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, আমরা যে কোনোদিন এসে পড়ব। দীর্ঘ ও কষ্টকর ট্রেনযাত্রার বিষয়টিও তারা জেনেছেন। তবে আমার পরিবারের সকলেই কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে আমার বাবা-মায়ের কাছে চলে গেছে।

কলকাতার প্রথমদিনেই আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস থেকে তাদের এক রিপোর্টার টেলিফোনে জানতে চাইলেন আমি কবে এসেছি, কীভাবে এসেছি ইত্যাদি। তিনি তাদের অফিসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। শুনলাম আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক বা সম্পাদক এই ধরনের পদে আছেন অমিতাভ চৌধুরী। শুনে ভালো লাগল। কারণ ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে লাহোরে পাকিস্তানের সিনিয়র সাংবাদিকদের এক সেমিনারে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের বিষয়ে ক্লাস পরিচালনা করেন অমিতাভ চৌধুরী। সেই সুবাদে আমার সঙ্গে পরিচয় ও হৃদ্যতা। আমি লাহোর সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলাম শিক্ষার্থী হিসেবে। তবে আনন্দবাজার অফিসে গিয়ে আমার আরেক অভিজ্ঞতা হলো। পত্রিকার এক কর্মী আমাকে অমিতাভ চৌধুরীর রুমে নিয়ে বললেন, আপনি ভেতরে যান। আমার ছোটো ভাই সঙ্গে ছিল; কিন্তু তাকে ভেতরে যেতে দেওয়া হয়নি। রুমে মধ্য বয়স্ক এক ভদ্রলোক আমাকে বসতে বলে নিজের কাজে মন দিলেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই করে যাচ্ছেন। আর আমি নিজের মনে বসে আছি। এভাবেই ১৫-২০ মিনিট চলে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি ওই ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম, অমিতাভ বাবু কি এদিকে নেই? ভদ্রলোক জবাব দিলেন, ছিল তো।

আমি: কই দেখছি না তো। ভদ্রলোক বললেন, তাই তো, কোথায় গেল? আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়। আরও কিছু সময় সেখানে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম, অমিতাভ বাবুর সঙ্গে তো দেখা হলো না। আমি যাই। বলে আমি কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হলাম। অনেক দিন পরে আমার ভুল ভাঙল এবং সেটাও করলেন অমিতাভ চৌধুরীই। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পর ২২ ডিসেম্বর সকালে আমি ঢাকা ফিরে আসি স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীদের সঙ্গে। সন্ধ্যায় মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ঢাকায় আসেন। বেতারের কাজ শেষ, আমি ফিরে যাই আমার পূর্বতন কর্মস্থল দৈনিক বাংলা (পূর্বতন দৈনিক পাকিস্তান) অফিসে। ইতোমধ্যে আমাকে দৈনিক বাংলার সম্পাদক নিয়োগ দেওয়া হয়। দৈনিক বাংলা অফিসে এক সন্ধ্যায় আনন্দবাজারের সম্পাদকমণ্ডলীর পুরো টিম পরিদর্শনে আসেন। দলে ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ, বার্তা সম্পাদক, চিফ রিপোর্টার, তাদের ঢাকা রিপোর্টার তুষার পণ্ডিত প্রমুখ। এই দলে দেখলাম আমার পূর্বপরিচিত অমিতাভ চৌধুরী এপিসোডের সেই ব্যক্তি। এই সুযোগে আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আপনাদের অফিসে গিয়ে তো বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরীর সাক্ষাৎ পাইনি। অথচ তিনি আমার পূর্বপরিচিত। এবার ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, আপনার সঙ্গে কি তার কোনো সময় দেখা হয়েছিল? আমি লাহোর সেমিনারে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হৃদ্যতার কথা জানালাম। এবার ভদ্রলোক খুলে বললেন, তিনি অন্য অমিতাভ চৌধুরী। বর্তমানে হংকংয়ে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের ম্যানেজিং এডিটর। আর আমি অমিতাভ চৌধুরী আনন্দবাজারের বার্তা সম্পাদক। আমার পরিচিত অমিতাভ চৌধুরী গত শতকের নব্বইয়ের দশকে অধুনালুপ্ত যুগান্তর পত্রিকাটি নতুনভাবে ঢেলে সেজে প্রকাশ করেছিলেন। ঢাকায়ও এসেছিলেন। কিন্তু তখন দেখা গেল তার একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে ক্যান্সারের জন্য। পরে তিনি মারা যান।

কলকাতায় পৌঁছেই জীবনধারণের অপরিহার্য কিছু কাজ শেষ করে গেলাম বাংলাদেশ মিশন অফিসে। এটা আগে ছিল পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের অফিস। ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী পঁচিশে মার্চে গণহত্যা শুরু হলে সদলবলে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এরপর পুরো ডেপুটি হাইকমিশন অফিস ভবন বাংলাদেশ মিশনে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ সরকারি কর্মকর্তা/ব্যবসায়ী তথা উল্লেখযোগ্য যারাই আসছেন শরণার্থী হিসেবে, তাদের সবাই একবার বাংলাদেশ মিশন ঘুরে যাচ্ছেন। মিশন তাই সবসময়ই লোকারণ্য। আমি ও আমার ছোটো ভাই বাচ্চু আমরাও গেলাম। উদ্দেশ্য যদি পরিচিত কারও সাক্ষাৎ পাই। প্রথমদিনেই টেলিভিশনের জামিল চৌধুরী, মুস্তাফা মনোয়ার, চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান প্রমুখের সঙ্গে দেখা। জামিল চৌধুরী আমাকে রেডিওতে নিউজ অপারেশনের জন্য একটি বাজেট এস্টিমেট তৈরি করতে বললেন। আমি কিছুটা বিস্মিত। কারণ কোথায় নিউজ প্রচার হবে, সেটা কি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র, নাকি যুদ্ধাবস্থায় কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো একটি ব্যবস্থা। এসব প্রশ্ন আমার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। যাই হোক, তাদের জন্য দ্রুত একটা কিছু করে দেওয়ার কথা জানিয়ে ওখান থেকে কেটে পড়লাম। প্রথমদিকে বাংলাদেশ মিশনের ভেতরে ঢোকাই ছিল এক দুরূহ কাজ। যাই হোক, বাংলাদেশ মিশনে আমার প্রথম দিনটি এভাবে অতিক্রান্ত হলো।

কলকাতায় প্রাথমিক কাজগুলো শেষ করে আমার স্ত্রী-কন্যা ও পরিবারের অন্যদের খোঁজখবর নেওয়াই জরুরি বলে আমি মনে করেছি। আগে আমার লোকজনদের অবস্থাটা জানা দরকার। গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আরেকবার বাংলাদেশ মিশনে গেলাম সবার সঙ্গে কথা বলার জন্য। এবার মিশন গেটেই আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে। তিনি প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন তার অফিস কক্ষে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের কথা জানতে চাইলেন। কথাবার্তায় কেমন যেন একটা বিষাদমাখা হতাশার সুর ধ্বনিত হচ্ছিল প্রতিটি বাক্যে। একপর্যায়ে বলেই ফেললেন, এখন যেন মনে হয়, স্বদেশের কুত্তাটাও এখানকার দেবতার চেয়েও ভালো ছিল। আমি তো একবার বকে ফেললাম, আপনাদের সরাইলের কুকুর তো অনেক ভালো শুনেছি। তাহের ঠাকুর এবার হেসে ফেললেন, তার কথার তাৎপর্য আমি একবারেই বুঝতে পারিনি ভেবে। আমি একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। তার মতো একজন রাজনৈতিক নেতা সংসদ সদস্যের মুখ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শুনে। আর ভাবছিলাম এরা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবে কীভাবে? স্বাধীনতা তো বহুদূরের পথ, সামনের বিশীর্ণ খালটিও এদের পক্ষে পার হওয়া সম্ভব নয়। তাহের ঠাকুর আমাকে বললেন, চলুন ঘুরে আসি। গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন বালিগঞ্জের একটি বাড়িতে। সেখানে কামাল লোহানীসহ বেশকিছু সাংবাদিক কাজ করছেন। জানতে পারলাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান রেকর্ডিং ও অন্যান্য কাজ এখানেই হবে। লোহানী বার্তাকক্ষ কাঠামো, সংগঠন এবং সংবাদ-সূত্র ইত্যাদি নিয়ে আমার অভিমত জানতে চাইলেন। বললেন খুব শীঘ্র স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার শুরু হয়ে যাবে। তাই আমি যেন তখনই ওদের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করি। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী ও সন্তানদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমাকে গ্রামের বাড়িতে যেতেই হচ্ছে। এ কথা শুনে লোহানী জানান, 'ওরা তো আমাদের সঙ্গেই আগরতলা থেকে কলকাতা চলে এসেছেন। পরে কোথায় উঠেছেন, সেটা তার জানা নেই। যাই হোক, আমি যদি গ্রামে যাইও তাহলে সেখান থেকে ফিরে এসেই যেন স্বাধীন

তাহের ঠাকুর এবার হেসে ফেললেন, তার কথার তাৎপর্য আমি একবারেই বুঝতে পারিনি ভেবে। আমি একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। তার মতো একজন রাজনৈতিক নেতা সংসদ সদস্যের মুখ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শুনে। আর ভাবছিলাম এরা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবে কীভাবে?

বাংলা বেতারে যোগ দিই। আমাদের আলোচনা তাহের ঠাকুর মনোযোগ দিয়ে যে শুনছিলেন, তার কথা থেকে সেটা বুঝতে পারলাম। তিনি বলেই ফেললেন, আরে এখানে কী করতে আসবেন। এদের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কবে এই রেডিও চালু হবে তারও স্থিরতা নেই। চলুন আমরা এবার মিশনের দিকে যাই। বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে তিনি একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কিছু কাজ করছিলেন। আমিও মওদুদ সাহেবের সঙ্গে কাজ করব, এটা তাহের ঠাকুর সবাইকে জানিয়ে দিলেন। একটু বিস্মিতই হলাম। আমার নিজের ইচ্ছা রেডিওর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যাই হোক, বাংলাদেশ মিশন আর বেতার কেন্দ্র নিয়ে বিশেষ কোনো গ্রুপের নীলনকশা আছে কি না, আমার কাছে সেটা তখনও পরিষ্কার নয়। মওদুদ আহমদ বিশেষ একটি বইয়ের জন্য কাজ করছিলেন। আমাকে সাহায্য করতে বললেন। বিকেলে আমাকে নিয়ে প্রেসে গেলেন বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি ছাপতে দেওয়ার জন্য। বইটি 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস' নামে ছাপা হয়েছিল। ছাপাখানার নাম মডার্ন প্রেস। এই প্রেস থেকে কবি সমর সেনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার ছাপা হতো। সন্ধ্যার দিকে দিনের কাজ শেষ করে নারকেলডাঙ্গায় আমাদের আশ্রয়স্থলে ফিরে এলাম। রাতে কিছু খবর পাওয়া গেল, যা আমার কাছে বেশ নাটকীয় বলেই মনে হলো। আমার ভগ্নিপতির বড়ো ভাই ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) নেতা আব্দুল হালিম। ছোটো হালিম হিসেবে পরিচিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সিপিআই নেতাদের সঙ্গে ভারত সরকার তথা কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ। অনেক খবরাখবর তারা পেতেন। তিনি রাতে বাসায় ফিরে জানতে চাইলেন আমি বিকেলে কোথায় গিয়েছিলাম। একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। বিকেলে কোনখানে যে গেছিলাম, এটা তিনি কীভাবে জানলেন? আমি সবিস্তারে তাকে অবহিত করলাম আমাদের কর্মতৎপরতার। তার পরামর্শ, এ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত না হওয়াই মঙ্গলজনক। আমি অবশ্য মওদুদ সাহেবদের জানিয়েছিলাম আমাকে গ্রামে যেতে হবে পরিবারের খোঁজখবর নিতে। এরপর আমি ও আমার ছোটো ভাই গ্রামে চলে যাই। শিয়ালদহ থেকে মোছলনদপুর ট্রেনে। তারপর বাসে একেবারে হাকিমপুর। সাতক্ষীরা সীমান্তে ছোটো একটি নদীতীরের গ্রাম। একসময় প্রায় ছবির মতো মনে হতো। গ্রামে যেতে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। মানুষ আর মানুষ। লাখ লাখ ছিন্নমূল আদম সন্তান। যে যেখানে পেরেছে ঠাঁই নিয়েছে। দলে দলে লোক আসছে সীমান্ত পার হয়ে। দু-একটা পোঁটলা ছাড়া কিছুই নেই। জানা গেল, পাকি দখলদার সেনাবাহিনীর হামলায় সর্বস্ব হারিয়ে সবাই সীমান্ত নদীটি পার হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের গ্রামে। ওপারে নদীর ঘাটে পাকিবাহিনীর আক্রমণে মারা পড়ছে অনেকেই। গ্রামের মানুষ শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, দিচ্ছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। গ্রামে এমন কোনো বাড়ি নেই যেখানে শরণার্থীরা আশ্রয় নেননি বা পাননি। আমাদের দোতলা বাড়ির চারটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন নদীর ওপারের মানুষজন। এরা সবাই শুধু পরিচিত নয়, আপনজনেরও অধিক। তাছাড়া প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে পাকিবাহিনীর হাতে নির্যাতিত। নদীর অপর পারের অর্থাৎ সাতক্ষীরা অঞ্চলের লোকজনই নয়, সুদূর বাগেরহাট ও অন্যান্য এলাকার মানুষজনও আছেন। নদীটির নাম সোনাই নদী। আগে গ্রামের তথা এলাকার মানুষজন নদীর পানিই দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য ব্যবহার করতেন। যদিও গ্রামে বড়ো বড়ো গোটাসাতেক পুকুর আছে। পঁচিশে মার্চ পাকি দখলদার বাহিনীর গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে নদীর ব্যবহার দৈনন্দিন কাজের জন্য বস্তুত বন্ধ। গ্রামে আশ্রয় নেওয়া লাখপাঁচেক লোকের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে প্রতিটি পুকুরের পানি দূষিত হয়ে গেছে। চাপকল, টিউবওয়েলগুলোও প্রায় অচল। ইতোমধ্যে নানা সামাজিক সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।

গ্রামে এসে বাবা, মা, বোন, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী-কন্যা এদের সঙ্গে মিলিত হওয়া যতটা আনন্দের, ঠিক সমপরিমাণে বিমূঢ় হতে হয় সমস্যার চাপে আর সর্বস্ব হারানো মানুষের হাহাকারে। গ্রামে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গোছের একটি সংগঠন কাজ করছিল। আমার ছোটো ভগ্নিপতি আসগার খানদের পাকা বৈঠকখানার তিনটি কক্ষের সবই সহায়ক সমিতি বা আশ্রয় গ্রহণকারী খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা অঞ্চলের আওয়ামী, ছাত্রলীগ বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা আশ্রয় নিয়েছেন। আমার সবচেয়ে ছোটো ভাই এবং তিন ভাগনে সহায়ক সমিতির অফিস ও শরণার্থীশিবিরে কাজ করছে। আমি ও আমার ছোটো ভাই বাচ্চু গ্রামে পৌঁছানোর পর সহায়ক সমিতি সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসল। স্থানীয় বিএসএফের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হলো, মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থেই হাকিমপুর গ্রাম থেকে শরণার্থীদের আরও অভ্যন্তরে পাঠাতে হবে। হাকিমপুরেই হবে মুক্তিযুদ্ধের গেরিলাদের প্রশিক্ষণ শিবির। তাই এখান থেকে যতদূর সম্ভব শরণার্থীর চাপ কমানো প্রয়োজন।

> তিনি রাতে বাসায় ফিরে জানতে চাইলেন আমি বিকেলে কোথায় গিয়েছিলাম। একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। বিকেলে কোনখানে যে গেছিলাম, এটা তিনি কীভাবে জানলেন?

আসগর খানদের পুকুরপাড়ের আমবাগানে গড়ে উঠল ইয়ুথ ক্যাম্প। এটাই মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের প্রাথমিক সাংগঠনিক রূপ। সহায়ক সমিতি এবং শরণার্থীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা হলো সমন্বয় কমিটি। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এরাই সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অলিখিত এই কমিটিতে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা অঞ্চলের ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগ নেতারা ছিলেন। লাখ লাখ শরণার্থীর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা, রোগ-মারী ইত্যাদিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা সমন্বয়, তদারকি– সহায়ক সমিতির লোকেরা করেছিলেন। ইয়ুথ ক্যাম্পে মুক্তি বাহিনীর প্রশিক্ষণও প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। আমার দুই ভাই ওবায়দুল কবির (বাচ্চু) ও আরিফ (ছোট্টু) মুক্তিবাহিনীর গেরিলা হিসেবে কাজ করছিল। একেবারে ছোটো ভাই জাহাঙ্গীর (সাচ্চু) হাকিমপুরে বাবা-মায়ের সঙ্গেই ছিল। সে এবং গ্রামে আমার দুই বোনের ছেলেরা ইয়ুথ ক্যাম্পের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করা এবং ত্রাণসামগ্রীর সুষ্ঠু তদারকি কাজে ব্যস্ত। সাইদুল আনাম টুটুল, আমার ছোটো শালা তার বোনদের সঙ্গেই চলে আসে। হাকিমপুর গ্রামে ইয়ুথ ক্যাম্পের ত্রাণসামগ্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। শরণার্থীদের এবং ইয়ুথ ক্যাম্পের ছেলেদের জন্য প্রথমদিকে ত্রাণসামগ্রীর সরবরাহ করত মারওয়ারি রিলিফ সোসাইটি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ছিল বিস্তর অভিযোগ। তাই ভারত সরকার নিজেই ত্রাণসামগ্রী বিলি-বণ্টনের দায়িত্ব নেয়। ফলে ত্রাণসামগ্রীর মান, পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়।

ইয়ুথ ক্যাম্পের ছেলেদের সামরিক প্রশিক্ষণের কাজও শুরু হলো। আমার দুই ভাই কবির (বাচ্চু) ও আরিফ (ছোট্টু) প্রথম ব্যাচেই ট্রেনিংয়ের জন্য বিহারের চাকুলিয়া চলে যায়। ইয়ুথ ক্যাম্পের ছেলেরা একে একে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ফিরে আসে এবং বিভিন্ন ধরনের গেরিলা অপারেশনে অংশ নেয়। হাকিমপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পূর্ণ গতিবেগের প্রাক মুহূর্তে ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়কের পরিবর্তন হলো। মেজর ওসমানের পরিবর্তে নতুন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হলেন মেজর মঞ্জুর। তিনি পাকিস্তান থেকে যে ৫ জন অফিসার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসে মুক্তি বাহিনীতে যোগদান করেন, তাদের অন্যতম। এই পাঁচ অফিসারের অন্যতম ছিলেন কর্নেল (তৎকালীন মেজর) তাহের। মেজর মঞ্জুর সীমান্ত থেকে অনেক দূরে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে অবস্থান না করে সীমান্তের গ্রাম ২নং সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার হাকিমপুরেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অবস্থান করতেন আমার ভগ্নিপতি আসগর খানের বৈঠকখানার একটি কক্ষে। মেজর মঞ্জুরের অকুস্থলে অবস্থানের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনের নতুন উদ্যমে গতিবেগ সৃষ্টি হয়।

হাকিমপুর এলাকার গুরুত্ব আগেই মুজিবনগর সরকার অনুধাবন করেছিল। এজন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএসএম কামরুজ্জামান হাকিমপুরে সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন। তাজউদ্দীন সাহেব

নদীর পাড়ে গিয়ে সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলোর মধ্যে হাকিমপুর ছিল সর্বাধিক জয় বাংলা ফ্রেন্ডলি। যখন ইয়ুথ ক্যাম্প বা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি, তখনও সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনার আওয়ামী লীগ নেতারা হাকিমপুরে এসে নানা শলাপরামর্শ করে যেতেন। পরবর্তীকালে হাকিমপুরকে কেন্দ্র অনেক অপারেশন চালানো হয় পাকিবাহিনীর বিরুদ্ধে। কর্নেল ওসমানীও এসেছিলেন হাকিমপুরে।

হাকিমপুরে ইয়ুথ ক্যাম্প, গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ, মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের হাকিমপুর সফর এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমার কলকাতায় ফেরা মাসদুয়েক পিছিয়ে যায়। ইতোমধ্যে শওকাত ভাই (সাহিত্যিক শওকত ওসমান) জরুরি খবর পাঠালেন, আমি যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। জরুরি ভিত্তিতে কলকাতায় এসে শওকত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ডা. টি হোসেনের কাছে। ডা. হোসেন ছিলেন মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য সচিব। ডা. হোসেন আমাদের নিয়ে গেলেন সাবেক এক বিশিষ্ট কর্মকর্তা শ্রী শৈবাল গুপ্তের বাসায়। শৈবাল গুপ্ত একসময় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব। ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শৈবাল বাবু আমাকে বিস্ময়কর একটি প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং তার পরবর্তীকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে বলা হচ্ছে। তারা হাজার হাজার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হয়েছে। এ সবই অভিযোগ। কিন্তু অভিযোগগুলো প্রমাণের জন্য সলিড এভিডেন্স চাই। পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অসম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থীশিবিরে ঘুরে ঘুরে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করুন। আমি আমতা আমতা করে উল্লেখ করলাম, এটা বিরাট ব্যয়সাধ্য কাজ। তাছাড়া এ কাজের জন্য লোকজনও লাগবে। ত্বরিত জবাব পেলাম, টাকা-পয়সার কথা একদম চিন্তা করবেন না। খুঁজে পেতে একটা ভালো অফিস নিন। প্রয়োজনীয় লোকজন নিয়োগ করুন। দ্রুত পুরোদমে কাজ শুরু করুন, এটাই আমি চাই। ডা. হোসেনও আমাকে আশ্বস্ত করলেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। কাজে লেগে যান।

চিন্তার কারণ তো সবে শুরু। লোকবল নিয়োগ, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, সেটা কী কাজে লাগবে, কাদের কাজে লাগবে? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরম মিত্র দেশ ভারত। তাদের যদি এই তথ্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা নিজেদের জনবল কাজে লাগিয়ে নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে অনায়াসে এ তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। এ কাজে তাদের কোনো এনজিওর সাহায্য দরকার হবে না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রবল প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। তাদের এ ধরনের তথ্য কাজে লাগতে পারে। কিন্তু ভারতের কাউকে দিয়ে এ কাজ করার ঝুঁকি তারা কি নিতে যাবে? বাকি পাকিস্তানের মিত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো এ ধরনের তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী হতে পারে। এসব সাত-পাঁচ চিন্তা করে এই বিশাল উদ্যোগের কর্মভার আমার পক্ষে গ্রহণ সঠিক হবে না বলেই আমার মনে হয়েছিল। শওকত ভাইয়ের সঙ্গে তখন চলে এলাম। তাঁকে এমন ইঙ্গিত দিলাম, তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু এবং আমার ভগ্নিপতির বড়ো ভাই হালিম খানের সঙ্গে কথা না বলে আমি এ কাজে সম্মতি দিতে পারব না। হালিম ভাই আমাকে শুধু নিরুৎসাহিত করেননি– এ জাতীয় গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা বিপজ্জনক বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করার জন্য নানা মহল থেকে হরেক কিসিমের চক্রান্তজাল বিস্তার করা হয়। শওকত ভাই কলকাতায় থাকতেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু বিচারপতি মাসুদের বাসায়। বিচারপতি মাসুদরা কলকাতার একটি বনেদি পরিবার। শওকত ভাই পরিচিত স্নেহাস্পদ ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতেন। আমার জন্য তাঁর উদ্বেগের কোনো খাদ ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধ এ সময়ে নতুন মোড় নিয়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি বাহিনীও পাকি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রবল বেগে তীব্র আঘাত হানতে শুরু করে। বাংলাদেশে গেরিলাযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বর্ষাকালের। বঙ্গবন্ধুও তার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের স্বাধীনতার ভাষণে গেরিলাযুদ্ধের এই তাৎপর্যের উল্লেখ করে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরা ওদের পানিতে মারবো, ভাতে মারবো। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকা নদীনালা, খালবিল বর্ষায় পানিতে থাকে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে পাকি হানাদার বাহিনী তাদের এলাকায় অর্থাৎ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পানির দেখা পায় কালেভদ্রে। জলরাশির আতঙ্ক তাদের মজ্জাগত। মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা আর সৈনিকরা বর্ষা মৌসুমের বাস্তব অবস্থাটা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর। হাকিমপুর সাবসেক্টর এলাকায় গেরিলারা পাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে অভিযান চালায়। পাকিদের অনেক জওয়ান মারা যায়। অন্যদিকে পাকি হানাদাররাও মর্টার ও কামানের গোলাবর্ষণ করে। ইতোমধ্যে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার জন্য শুধু ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফই নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দলও মোতায়েন করা হয়। ডোগরা রেজিমেন্টের এই দলের দায়িত্বে ছিলেন মেজর ভোলা। গেরিলাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎপরতা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, প্রতিদিন পাকি সেনা, রাজাকার ও দালাল ধরা পড়তে থাকে। এ সময়ে পাকিদের শেলিংয়েও দুই মহিলার মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্ত ও গতিশীল করতে দেখা যায়। বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী অফিসাররাও মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য মুজিবনগরে আসতে থাকেন। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা, চট্টগ্রাম ছাড়া রাজশাহী, রংপুর কেন্দ্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। মুজিবনগর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে জানানো হলো অবিলম্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করতে। নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতার বালিগঞ্জের ভবনটিতে গিয়ে হাজির হলাম। শামসুল হুদা চৌধুরী ছিলেন প্রশাসনিক দায়িত্বে। জানালেন, আমাকে প্রতিদিন একটি করে সংবাদভাষ্য লিখতে হবে। যেহেতু রেডিও'র কাজের অর্থাৎ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই স্বকণ্ঠে এটা প্রচারও আমাকে করতে হবে। স্বাধীন বাংলা বেতারের একনিষ্ঠ কর্মী, সাংবাদিক ও শিল্পীদের সঙ্গে একে একে পরিচিত হতে শুরু করলাম। তবে সৌভাগ্যের বিষয়– অনেকেই পূর্বপরিচিত। বার্তা বিভাগের দায়িত্বের কামাল লোহানী তো সংবাদে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পরে আজাদ ও পূর্বদেশে যোগ দেন। ছিলেন সাদেকিন ও অন্যরা। প্রশাসনের আসফাকুর রহমান, বাংলা সংবাদ পাঠক সৈয়দ হাসান ইমাম, ইংরেজি সংবাদের আলী যাকের ও আলমগীর কবির। আমার সংবাদভাষ্যটির নাম দেওয়া হলো পিন্ডির প্রলাপ। শিরোনামেই সুস্পষ্ট কী থাকছে ভাষ্যটিতে। সত্যি কথা বলতে কী, স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান শোনার জন্য শরণার্থীশিবিরে এবং শিবিরের বাইরে আশ্রয় গ্রহণকারী লাখ লাখ মানুষ প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। শুধু যে শরণার্থীরাই অনুষ্ঠান শুনতেন, এমন নয়। মনে রাখা দরকার, একাত্তর সালেই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশই ছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। এরা সকলেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একনিষ্ঠ শ্রোতা। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হওয়া সম্প্রচারটি চলত সন্ধ্যা থেকে ৪-৫ ঘণ্টা। সকালেও অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে সংবাদ, সংবাদভাষ্য, দেশাত্মবোধক গান, নাটক ইত্যাদি ছিল। প্রচার করা হতো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও ভাষণের চুম্বকাংশ– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' অনুষ্ঠানমালার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র। মুকুল সাহেব চরমপত্র নিজে

"হালিম ভাই আমাকে শুধু নিরুৎসাহিত করেননি– এ জাতীয় গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা বিপজ্জনক বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করার জন্য নানা মহল থেকে হরেক কিসিমের চক্রান্তজাল বিস্তার করা হয়

লিখতেন এবং স্বকণ্ঠে ঢাকাইয়া উচ্চারণে বিশেষ বাচনভঙ্গিতে পাঠ করতেন। অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য শরণার্থীশিবিরের লোকজন, বাড়িঘরে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীরা, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত কখন চরমপত্র প্রচারিত হবে, তার প্রতীক্ষায়। এছাড়াও পাকিস্তানের লম্পট স্বৈর সেনাশাসক ইয়াহিয়া খানের কার্যকলাপ নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক ধারাবাহিক নাটক জল্লাদের দরবারও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের অমর রণধ্বনি 'এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' লক্ষবার প্রচারেও তার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। প্রতিবার প্রচারে মানুষকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কোনো দেশের প্রতিষ্ঠিত রেডিও স্টেশন নয়। এটি মুক্তিযুদ্ধের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবেই কাজ করছিল। শত্রুর প্রতিটি পদক্ষেপ মোকাবিলায় মুজিবনগর সরকার, মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে সহায়তা করা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্তব্য। একটি বাড়ির কয়েকটি কক্ষে অফিস রুম, নিউজ রুম, অনুষ্ঠান রেকর্ডিং রুম, প্রশাসনিক কাজকর্মের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠান রেকর্ড ও ধারণ করে সম্প্রচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। গোপনীয়তা রক্ষা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করতে না পারলে মারাত্মক বিপর্যয়ের আশঙ্কা অবধারিত ছিল।

কিন্তু আমাদের অবস্থা তো জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘের মতো। সবখানে একই অবস্থা। তবে এটাও শুনেছি নকশালরা জয়বাংলার লোকদের ঘাঁটাতে চাইত না

স্বাধীন বাংলা বেতারের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছে– এমন সময়ে খবর এলো হাকিমপুর থেকে, পাকি বাহিনীর শেলিংয়ে গ্রামে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে। এ অবস্থায় আমার বাবা-মা আমার স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছেন। তারা মনে করেন, আমার সন্তানদের সীমান্তের গ্রাম থেকে যেন কলকাতায় নিয়ে যাই। দিন-তারিখও ঠিক হয়ে গেল। কলকাতার বেলেঘাটা এলাকায় সস্তায় দুকামরার একটি বাড়িও পাওয়া গেল। বেলেঘাটা একসময়ে ছিল নকশাল প্রভাবিত এলাকা। নকশাল নির্মূল অভিযান শুরু হওয়ার পর সেখানে খুন-গুম ইত্যাদি নিত্যবিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সন্ত্রাস, খুন, গুম আর সিআরপির ভয়ে এই এলাকায় কলকাতার নাগরিকদের বাড়ি ভাড়া নিতে নিদারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘের মতো। সবখানে একই অবস্থা। তবে এটাও শুনেছি নকশালরা জয়বাংলার লোকদের ঘাঁটাতে চাইত না। সিআরপি বা প্রাদেশিক পুলিশ তো শরণার্থীদের সাহায্যই করত। যাই হোক, বেলেঘাটায় বাসা ভাড়া নেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর আমার ছিল না। মধ্যরাতে বিধান রায় শিশুপার্ক থেকে গুলির আওয়াজ শুনলেও কী করা যাবে। পাকিস্তানি সেনা স্বৈরশাসক চক্রের অবস্থা ক্রমান্বয়ে চরম পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছিল তারা বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত বিচার প্রহসনের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানিরা মধ্যস্থতা করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন গোপনে চীন সফরে গেলেন পাকিস্তান হয়ে। তাদের লক্ষ্য ভারতের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিশ্চিত করা। নিক্সনের ভারতবিরোধী মনোভাব সুপরিজ্ঞাত। তিনি তো একসময়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে খুব বাজে ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন। (কিসিঞ্জারের হোয়াইট হাউস ইয়ার্স দ্রষ্টব্য)। অন্যদিকে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকার মতো অবস্থা ভারতের ছিল না। আত্মরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ ভারতের জন্য জরুরি হয়ে দেখা দেয়। মিসেস গান্ধী এই সময়ে দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। প্রথমত, সশস্ত্র সংঘাত পরিহার করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের নিষ্পত্তি, দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন বন্ধ করা। এজন্য তিনি ওয়াশিংটন সফরও করেন। কিন্তু নিক্সন প্রশাসনের একগুঁয়ে নীতি দৃশ্যত মিসেস গান্ধীকে হতাশই করে।

বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বিশ্ব কূটনৈতিক তৎপরতা এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হলো ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে। এই চুক্তির মাধ্যমে কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার গ্যারান্টি প্রদান করে।

পক্ষান্তরে নিক্সন প্রশাসন একনাগাড়ে পাকিস্তানকে সব ধরনের সহায়তা ও সাহায্যের আশ্বাস দিলেও মার্কিন জনমত ছিল বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে। মার্কিন সিনেটে প্রস্তাব গ্রহণ এবং জোরালো বক্তব্য পেশ ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে নানা সাহায্য ও সহায়তা বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য পাঠানো হয়। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাই সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি দমদমে শরণার্থীশিবিরে অবস্থানকারীদের প্রতি সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নিউইয়র্কে রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্ট দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তুমুল জনপ্রিয়তা পায় অ্যালেন গিনসবার্গের সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড। সামগ্রিকভাবে মার্কিন পত্রপত্রিকা, বুদ্ধিজীবী, লেখক, অধ্যাপকসহ সমাজসচেতন মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও অসমে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সংখ্যা এক কোটিতে পৌঁছে যায়। বিপুল এই জনগোষ্ঠীর ত্রাণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করা ভারত সরকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও মিসেস গান্ধীর সরকার কার্ডের মাধ্যমে রেশন বরাদ্দের মতো প্রতি সপ্তাহে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রাখে।

অক্টোবরের শেষদিকে এবং নভেম্বরে সীমান্ত এলাকার অবস্থা উত্তপ্ত হতে থাকে। এদিকে পাকি দখলদার বাহিনীর শেলিং, অন্যদিকে গেরিলা ও মুক্তি বাহিনীর ভারী অস্ত্রপাতি নিয়ে পাকি অধিকৃত এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করে। পাকি বাহিনীর বেপরোয়া গোলাগুলি বর্ষণও চলতে থাকে।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুজিবনগর সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের সব দলের সরকারে পরিণত করার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা লক্ষ করা গেলেও সেটা বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ, মুজিবনগরে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ভিত্তিই ছিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই মুজিবনগরে সমবেত হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করেন। এটাই মুজিবনগর ঘোষণাপত্র হিসেবে পরিচিত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মূলভিত্তি। নির্বাচনে বিজয়ী প্রতিনিধিরাই সরকার ঘোষণার আইনগত ও আনুষ্ঠানিক এখতিয়ারের অধিকারী। তাই সর্বদলীয় সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অন্যান্য দলের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এজন্য গঠন করা হলো উপদেষ্টা পরিষদ। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মুজাফফর), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেস– উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। এভাবে ক্রমান্বয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুজিবনগর সরকারে ভেতরের আপসকামীদের চরিত্রও উন্মোচিত হতে থাকে। কুমিল্লার এক সংসদ সদস্য কলকাতায় মার্কিন উপরাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মধ্যস্থতার তাগিদ দিতে থাকেন। হেনরি কিসিঞ্জার ও লরেন্স লিফশুলজের লেখা বইয়ে এদের বিবরণ দেওয়া আছে। এরা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে স্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে সম্মত আছে বলে জানায়। খন্দকার মোশতাক তো বলেই ফেলেন– স্বাধীনতা না বঙ্গবন্ধুর মুক্তি; কোনটা চাও জানাও। যেন দুটো বিনিময়যোগ্য। বাংলাদেশের মানুষ ৩০ লাখ জীবন দিয়েছে। দুটো দাবিকে অর্জনের জন্য আরও ৩০ লাখ শহিদ হতে দ্বিধাবোধ করবে না। মোশতাক গংয়ের এই বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল। তাই তারা মার্কিন উপদূতাবাস এবং ইরানের শাহেনশাহের মাধ্যমেই চক্রান্তজাল বিস্তারের চেষ্টা করছিল। আর এ কাজে মোশতাকের মূল পাণ্ডা ছিল পররাষ্ট্র সচিব পদে অধিষ্ঠিত মাহবুবুল আলম চাষী। এদের চক্রান্ত ফাঁস হওয়ার পর ভারত সরকার মোশতাকের কর্মতৎপরতার ওপর অলিখিত বিধিনিষেধ আরোপ করে,

এমন খবর মুম্বাইয়ের সাপ্তাহিক ব্লিৎস পত্রিকায় ছাপা হয়। বাংলাদেশ সরকার চাষীকে পররাষ্ট্র সচিবের পদ থেকে অপসারণ করে। প্রধান কূটনীতিক আবুল ফতেহ পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হন।

আমার কাছেও এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কেন তাহের ঠাকুর আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করতে দিতে চাননি। নভেম্বরের শেষদিকে রণাঙ্গনের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকি দখলদার বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

ডিসেম্বরের শুরুতেই পাকিদের বস্তুত দহনকাল আরম্ভ। কোনো কোনো স্থানে মুক্তি বাহিনীর বড়ো ধরনের বিজয়ও করায়ত্ত হয়। ৩ ডিসেম্বর মিসেস গান্ধী এলেন কলকাতায়। গড়ের মাঠের ময়দানে তার ভাষণ দেয়ার কথা। সব মহলেই নানা গুঞ্জন। পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার ঘোষণা তিনি দেবেন। মুজিবনগর সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের ঘোষণাও আসতে পারে। এসবের নানাদিক আলোচনা করতে করতে আমরা কয়েকজন গেলাম ময়দানে শ্রীমতি গান্ধীর বক্তৃতা শুনতে। মিসেস গান্ধী তার ভাষণে বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর কোনোটির ধারেকাছে গেলেন না। পরিবর্তে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনা করে গেলেন।

তিনি বললেন, যুদ্ধ মানেই মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে আমি লন্ডনে ছিলাম। দেখেছি মানুষ একটি রুটির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে শীতে কী কষ্টটাই না স্বীকার করছে। শীতে ঘরে বিদ্যুৎ নেই। জার্মান বোমাবর্ষণে বিদ্যুৎ লাইন উড়ে গেছে। যুদ্ধের দিনগুলোয় ব্রিটিশরা কত ধৈর্য ধরে এসব সহ্য করেছে। আমি চাই না ভারতের মানুষ এমন কষ্ট পাক।

বক্তৃতা শুনে ফিরে এলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। বন্ধুরা সকলেই মোটামুটি হতাশ। মিসেস গান্ধী পাকিস্তানের নিন্দা করা তো দূরস্থান তাদের নাম পর্যন্ত নেননি। বাংলাদেশ বিষয়ে একই ধরনের নীরবতা। কোথায় কূটনৈতিক স্বীকৃতি অথবা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সহায়তার কথা! বাংলাদেশের কথা উল্লেখই করলেন না। আমাদের ভুল ভাঙলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। সন্ধ্যায় ঘোষণা হলো, পাকিস্তান ভারতের কয়েকটি স্থানে একযোগে আক্রমণ করেছে বিমান থেকে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে। অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান থেকে পালটা আক্রমণ করে তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনেও হামলা চালিয়েছে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়াবহর নিয়ে।

এ সময়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং কেউই দিল্লিতে ছিলেন না। মিসেস গান্ধী কলকাতায়, জগজীবন রাম বিহারে, শরণ সিং পাঞ্জাবে। সবাই এখন দিল্লি ফিরছেন। মিসেস গান্ধী বিশেষ বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি চলে গেলেন সন্ধ্যার কিছুক্ষণের মধ্যেই। দেশের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এসব ভিআইপির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সব কয়টি মেশিনই যথাসময়ে সঠিক কাজটি করে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কেন মিসেস গান্ধী জনসভায় যুদ্ধের ভয়াবহতা আর কষ্ট স্বীকারের কথাই শুধু বলে গেলেন। তার অবস্থান ছিল মূলত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের পক্ষে। তিনি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কষ্ট স্বীকারে তৈরি থাকার জন্য জাতিকে সজাগ করে গেলেন। গভীর রাতে মিসেস গান্ধী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন আকাশবাণী থেকে। ৪ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হলো। মিসেস গান্ধী বললেন, বাংলাদেশ এখন স্বাধীন দেশ। প্রথম ভুটান স্বীকৃতি দিল স্বাধীন বাংলাদেশের। ৬ ডিসেম্বর এলো ভারতীয় স্বীকৃতি। এরপর আর আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সামনে শুধু প্রসারিত দিগন্ত। প্রথমদিনেই বাংলাদেশের আকাশ একেবারে মুক্ত। পাকিদের সবক'টি বিমান শেষ। প্রতিদিনই পাকি দখলদাররা লোটা-কম্বল ফেলে পালিয়েছে উর্ধ্বশ্বাসে। তাদের প্রতিটি রক্ষাব্যূহকে বাইপাস করে অর্থাৎ পরিহার করে মিত্রবাহিনী এগিয়ে গেছে ঢাকা অভিমুখে। একে একে মুক্ত হয়েছে যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ। যৌথ বাহিনী একেবারে ঢাকার দোরগোড়ায়। ইতোমধ্যে খবর পাওয়া পাকি হানাদার বাহিনী তাদের পোষ্য দালাল জামায়াতে ইসলামীর ঘাতক চক্র আলবদর-আলশামসের মাধ্যমে দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। আলবদর আলশামসের অনেকেরই ফাঁসি হয়েছে। তবুও জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ঘাটতি তো রয়েই গেছে। জাতি দিনটি স্মরণে প্রতিবছর পালন করছে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজি তার সাঙ্গোপাঙ্গসহ ৯১ হাজার পাকি দখলদার সেনা বিনাশর্তে মিত্রবাহিনীর কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে তাদের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জগজিৎ সিং অরোরা এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

পাকি দখলদারদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ উপলক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান লেখা হলো তাৎক্ষণিকভাবে– 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই বাংলার ঘরে ঘরে।' সুর দিলেন সুজেয় শ্যাম। সুরের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল বাংলার ঘরে ঘরে।

এরপর মুক্ত স্বদেশে ফেরার পালা। ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এমন সময় জানানো হলো কাল অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার দেশে ফিরে যাবে সন্ধ্যায়। সকালে স্বাধীন বাংলা বেতারের একটি বিশেষ দল ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমানে ঢাকা যাবে। এই বিমানে আমাকেও যেতে হবে। এই দলটির একটি বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় ফিরে রেডিও বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সম্প্রচার চালু করতে হবে। নানা ঝুটঝামেলায় বিগত কিছুদিন ধরে ঢাকা কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ আছে। তারা এ সময়ে শুধু স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার করছে। ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

"এরপর মুক্ত স্বদেশে ফেরার পালা। ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এমন সময় জানানো হলো কাল অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার দেশে ফিরে যাবে সন্ধ্যায়"

রাতে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করে আমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে ভোরে ছুটলাম দমদম বিমানবন্দরের উদ্দেশে স্কুটারে করে। শীতে ঠাণ্ডায় হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। তবুও ঘরমুখো বাঙালি কোনো বাধাই মানে না।

বিমানবন্দরে আরেক বিপত্তি। অনুমোদিত তালিকা থেকে একজন প্যাসেঞ্জার বেশি হচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘোরতর আপত্তি জানালো। অনুমোদিত তালিকার বহির্ভূত কাউকে বিমানে উঠতে দিতে তারা রাজি নয়। অনেক দেনদরবার করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরাপত্তা গ্যারান্টির বন্ডে সই-স্বাক্ষর করিয়ে তারা ক্ষুব্ধ সম্মতি জানালো। বিমানটি হেলিকপ্টারের চেয়ে একটু উন্নত ধরনের। তাতে আবার মালপত্তরবোঝাই। তবুও সময়মতো ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছানো গেল।

নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ তথা মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য মে মাসে আমার যে তীর্থ যাত্রা শুরু হয়েছিল, তেজগাঁওয়ের মাটি স্পর্শ করেই তার প্রথম পর্যায় শেষ হলো।

লেখক: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি থাকাকালে) প্রেস সচিব, উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

যুদ্ধকালীন দিনগুলো

আবেদ খান

একাত্তরের ২৫ মার্চের পরে ঢাকা আমার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠল। বিহারি ও পাকিস্তানের চররা আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকল। কারণ পুরান ঢাকার একটা বিশাল অংশের মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম পরিষদ সংগঠনের আহ্বায়ক ছিলাম আমি। আমার যুগ্ম আহ্বায়ক ছিল মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য মায়া বীরবিক্রম খেতাবে ভূষিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সান্ধ্য আইন আমরা ক্রমাগত ভেঙে চলেছিলাম ২ মার্চের পর থেকেই। আমাদের এই ভূমিকার কথা স্থানীয় বিহারি এবং পাকিস্তানি গুপ্তচরদের মাধ্যমে সামরিক মহলে পৌঁছে গিয়েছিল। তদুপরি আমি ছিলাম দৈনিক ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বাম রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী। কাজেই ২৮ মার্চ সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা ছেড়ে জিঞ্জিরায় যাব। আমাদের একটি গ্রুপ তখন যাত্রাবাড়ীতে পজিশন নিয়েছে। আর আমি মুক্তিযুদ্ধের মূল স্রোতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে মায়ের কাছে বিদায় চাইলাম। মা পরিবারের অন্য সদস্যদের সামনে আমাকে রেখে বললেন, 'আমার চার ছেলে চার মেয়ের মধ্যে ছোটো ছেলেকেই মুজিবরের জন্য দিয়ে দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

আসলে শেখ মুজিবুর ছিলেন আমার অগ্রজ মন্টু খানের রাজনৈতিক গুরু। মন্টু খান ভাসানীপন্থি ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। বঙ্গবন্ধু তার মাধ্যমেই মওলানা ভাসানীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখতেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করার পর গোয়েন্দা নথিতে তাঁর এই সংশ্লিষ্টতা জানা যায়। কাজেই আমাদের পরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান ছিল একেবারে অন্যরকম। মায়ের এই দৃঢ় উক্তি আমাদের পুরো পরিবারকে কঠিন বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছিল। মাকে সালাম করে ঢাকা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার সঙ্গে গেলেন পরিবারের অধিকাংশ নারী ও শিশু সদস্য। উদ্দেশ্য তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করা।

দীর্ঘ তিন সপ্তাহ নানাবিধ বিপৎসংকুল পথ ও ঝুঁকি এড়িয়ে অবশেষে সাতক্ষীরার সীমান্ত অতিক্রম করলাম এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। পাকিস্তান

আবেদ খান

বাহিনী এবং তার সহযোগী দোসরদের যে নৃশংস বর্বরতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি সেই মার্চের শুরু থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত– এরই বিবরণ একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের ভাষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে তুলে ধরার ইচ্ছা নিয়ে কলকাতার আকাশবাণী ভবনে উপস্থিত হলাম। কিন্তু সেখানে তো আমাকে কেউ চেনে না। কাজেই কীভাবে আমার পরিচয় ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরব, তা বুঝতে পারছিলাম না। আকাশবাণীর মূল ফটকের সামনে ধরনা দিয়ে বসে আছি– কীভাবে ভেতরে ঢুকব, এই পথ খোঁজার জন্য। হঠাৎ এক সুদর্শন ভদ্রলোক ফটক দিয়ে বেরোনোর সময় আমার দিকে তাকালেন এবং আমি কে এবং কেন ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, তা জানতে চাইলেন। মুহূর্তের মধ্যে আমার সম্ভাবনার দরজাটি খুলে গেল। আমি আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য অতি দ্রুত তাকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে আকাশবাণীর অভ্যন্তরে প্রবেশের ছাড়পত্র জোগাড় করে দিলেন এবং নিয়ে গেলেন আকাশবাণীর বার্তাকক্ষে। সেখানে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে চিরকাল। বার্তাকক্ষে ছিলেন প্রণবেশ সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেশ ভৌমিক, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও কয়েকজন। উপেন তরফদার এরপর আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন, যেখানে ছিলেন তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সরল গুহ। সরলদা আমার পরিচয় শোনার পরই উপেনদাকে বললেন আমাকে স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেখানে তিনি আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন। আমি আমার পুরো অভিজ্ঞতা সেদিন তুলে ধরেছিলাম এবং আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সেটা বারংবার প্রচারিত হতে থাকল। কারণ পাকিস্তানি নৃশংসতার বিবরণ একজন কর্মরত সাংবাদিকের জবানিতে পাওয়ার ঘটনা ছিল সেটাই প্রথম। আমি এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম একেবারেই স্বনামে। আমাকে ছদ্মনাম ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়েছিল এই ভেবে যে, এটি প্রচারিত হলে আমার পরিবারের ওপর হামলা নেমে আসতে পারে। কিন্তু আমি সেটা গ্রহণ না করে বলেছি, সংবাদের সত্যতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংবাদদাতার প্রকৃত পরিচয় আবশ্যক। আমার এ সিদ্ধান্তের কারণে অবশ্য আমাদের পরিবারের ওপর ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে এসেছিল। আমারই বক্তব্যের জন্য আমার মধ্যম ভ্রাতাকে ভয়াবহ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল পুরো সাত মাস।

এরপর আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক বরুণ হালদার কলকাতায় এসে ইংরেজিতে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আমি প্রথম কর্মরত সাংবাদিক যে বিশ্ববাসীর কাছে স্বনামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষ বিবরণ তুলে ধরেছিলাম। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে আমি নিয়মিতভাবে একটি সাপ্তাহিক কথিকা লিখব এবং তা স্বকণ্ঠে পাঠ করব। এই সাপ্তাহিক কথিকাটি মুক্তিযুদ্ধকালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। এ কথিকার নাম ছিল 'জবাব দাও'। পাকিস্তানের বেতার কেন্দ্র থেকে আমার এই কথিকার পালটা হিসেবে যে কথিকা সেসময় নিয়মিত প্রচারিত হতো, এর শিরোনাম ছিল 'জবাব নিন'।

আকাশবাণীতে আমার যে বন্ধুবলয় সেসময় গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন উপেন তরফদার, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, দীপেশ ভৌমিক, সরল গুহ প্রমুখ। আমাদের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা এমন স্তরে উপনীত হয়েছিল যে, সম্বোধন অল্পদিনের 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছিল। এদের মধ্যে জীবিত আছেন কেবল উপেন তরফদার। দেখা হলেই আমরা '৭১-এর স্মৃতিচারণ করি এখনো।

সেসময় মাসে অন্তত দুইবার আমাকে যেতে হতো আমার মুক্তিযুদ্ধের কর্মক্ষেত্র ৮ নম্বর সেক্টরের হাকিমপুরের ইয়ুথ ক্যাম্পে এবং কলকাতার ডিআইটি রোডে অবস্থিত কতিপয় বাম সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় পরিষদের অস্থায়ী কেন্দ্রে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী হক-তোয়াহা গ্রুপ ছাড়া আর সব বামপন্থি দলই এই সমন্বয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুজন কিংবা তিনজন করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। আমি ভাগ্যবান যে, এই সমন্বয় কমিটির ঘোষণাপত্র রচনার দায়িত্ব হায়দার আকবর খান রনো, কাজী জাফর আহমেদ এবং আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। সেখান থেকেও নিয়মিতভাবে দেশের অভ্যন্তরে আমাদের চিন্তাধারার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করতে হতো। তাছাড়া মাঝেমধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরের মুক্তাঞ্চলে অবস্থান ও পরিদর্শন করতে হতো। কর্মীদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও আমার স্কন্ধে আংশিকভাবে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তারপরও আমার আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের নিয়মিত কার্যক্রম ব্যাহত হয়নি।

আমি আকাশবাণীর কাছে কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, এই আকাশবাণী আমাকে বিশ্বনন্দিত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। উপেন দা'র কল্যাণে আমি সেই কালজয়ী 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' গানটির জন্মলগ্নতে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাঁতারু অরুণ নন্দীর সেই বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনের ঘটনা অবলোকনের সুযোগটি আমাকে উপহার দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি এবং সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছি। সর্বশেষ বেঁচে যাই একাত্তরের ডিসেম্বরে সাতক্ষীরা শত্রুমুক্ত হওয়ার সময় পাকিস্তান বাহিনীর পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের হাত থেকে।

একাত্তর আমার গৌরবের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে। অনেক স্মৃতি, অনেক না পাওয়ার বেদনা, অনেক স্বর্ণালি মুহূর্ত পেরিয়ে এসে আজ মনে হয়– আহা যদি একাত্তরের সেই বয়সে আবার চলে যেতে পারতাম, তা হলে বোধহয় স্বপ্নের সোনার বাংলাকে আরও অনেক কিছু দেওয়ার সুযোগ পেতাম। জয় বাংলা।

লেখক: সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক জাগরণ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

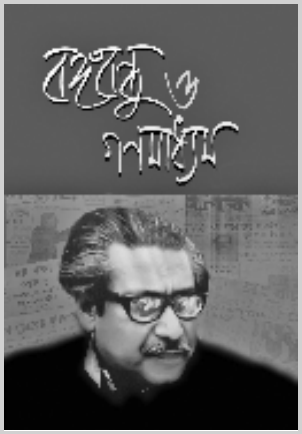

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মনি ভাই আমাকে গেরিলা ট্রেনিং নিতে দেরাদুনে পাঠান

সৈয়দ আহমাদ ফারুখ

সৈয়দ আহমাদ ফারুখ; ছাত্ররাজনীতির মাঠ থেকে রণাঙ্গনের সৈনিক। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের ভিপি ছিলেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কোষাধ্যক্ষ, ইংরেজি সাহিত্যের এই ছাত্র ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি'র খুব কাছের মানুষ। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা।

১৯৭১ সালে কাজ করতেন দৈনিক দ্য পিপল-এ। ২৫ মার্চ রাত ১১টায় শেষ রিপোর্টটি জমা দিয়ে বের হয়ে যান হলের উদ্দেশে। তারপর রণাঙ্গন। আগরতলা থেকে 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ' প্রকাশ করতেন কয়েকজন বন্ধু মিলে। রণাঙ্গনের খবর, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথন উঠে আসত এতে। বিশেষ করে বৃহত্তর কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ ও নরসিংদীর যোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস ছিল পত্রিকাটি। দেরাদুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন কিছুদিন। গেরিলা ট্রেনিং নিয়েও মাঠে যুদ্ধ না করতে পারার বেদনা এখনো তাকে পীড়া দেয়। আহমাদ ফারুখের সঙ্গে রণাঙ্গনের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন নিরীক্ষা'র সহকারী সম্পাদক– **দুলাল আচার্য**

এক উত্তাল রাজনৈতিক যুগে আপনাদের তারুণ্য– রাজনীতির শুরুটা বলবেন?

আহমাদ ফারুখ: ছাত্রলীগেই আমার রাজনীতির হাতেখড়ি। আমাদের ছাত্ররাজনীতির সময়টাই ছিল আন্দোলন-সংগ্রামের যুগ। '৬৯-এর গণআন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০-এর নির্বাচন এবং ৭১-এর উত্তাল দিনগুলোতে রাজপথেই ছিলাম। আসলে স্বাধিকার আদায়ের কর্মসূচিগুলোতে আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্তই আমাকে নাড়া দিত। বলতে পারেন রাজপথে বঙ্গবন্ধুর সৈনিক ছিলাম আমরা।

আপনার সাংবাদিকতা এবং মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট...

আহমাদ ফারুখ: বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর বাঙালি যখন সশস্ত্র সংগ্রামের মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে স্বাধীনতার জন্য। মানুষ যখন ভাবছে, আর নয় এই পরাধীন জীবন– তখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমরাও একাত্ম

হয়েছিলাম। আমি তখন এসএম হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ। পড়াশোনা করি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে। পাশাপাশি সাংবাদিকতা ইংরেজি দৈনিক দ্য পিপলে। পত্রিকাটি ছিল এই অঞ্চলের গণমানুষের ইংরেজি মুখপত্র। অবশ্য দ্য পিপলে আমি কাজ শুরু করি পত্রিকাটি যখন সাপ্তাহিক ছিল, তখন থেকেই। যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ছিলেন সাপ্তাহিক দ্য পিপলের বার্তা সম্পাদক। মনি ভাইয়ের সঙ্গে আমি ও জগলুল চৌধুরী (পরে বাসস) সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেই। ২৫ মার্চ রাতে দ্য পিপলে আমার শেষ রিপোর্টটি জমা দিয়ে যখন বের হই, রাত তখন ১১টা। শাহবাগে অবস্থিত দ্য পিপল অফিস থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে (ইকবাল হল) আসি। চারদিকে রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড আর মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত সার্জেন্ট জহুরুল হক হল তখনও সরগরম। আমাদের হলে না থাকার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। ওই রাতেই পাকিস্তানি হানাদাররা নির্মম আঘাত হানল নিরীহ জনসাধারণের ওপর। এর পরের ইতিহাস সবারই জানা।

সৈয়দ আহমাদ ফারুখ

আমরা তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নিরাপদ অবস্থানে। এক পর্যায়ে আমরা ছাত্রলীগের কর্মীরা মিলিত হই। তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে অল্পবিস্তর প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। ঠিক তখনই কুমিল্লার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা মাইনুল হুদা বলল, এভাবে চলতে পারে না। চল কিছু একটা করি। তার কাছে একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন আছে। ভাবলাম আমরা তো ইচ্ছে করলে আমাদের সাথীরা কোথায় কীভাবে প্রতিরোধ করছে, তা নিয়ে একটি ইশতেহার বের করতে পারি। তখন আমাদের নেতা সৈয়দ রেজাউর রহমান (বর্তমানে গ্রেনেড হামলা মামলার আইনজীবী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য) বলেন, ইশতেহার কেন? আমরা তো একটি পত্রিকাই প্রকাশ করতে পারি। সবাই একমত হই যে– আমরা দুই পাতার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করব। রেজা ভাইয়ের নেতৃত্বে মাইনুল হুদা, আকবর কবীর (বর্তমানে কানাডায় বসবাসরত), ছাত্রনেতা নাজমুল হাসান পাখী, ছাত্রনেতা রুস্তম আলী, ফজলুর রহমান ঝিনু (কবি), দীপক রায়সহ সবাই সিদ্ধান্ত নেই যে, নিজেদের খাবার পয়সা বাঁচিয়ে পত্রিকার প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করব। প্রথম দুই সংখ্যা সাইক্লোস্টাইল করেই বের করা হয়। নাম দেওয়া হয় 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'। সম্পাদক হিসেবে প্রথমে একটি কাল্পনিক নাম দেওয়া হয়। পরে আগরতলার একটি প্রেস থেকে তা নিয়মিত প্রকাশ করা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর আবদুল মান্নান চৌধুরী সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। তিনি অবশ্য ছদ্মনামই ব্যবহার করেছিলেন।

তাহলে সশস্ত্র যুদ্ধ...

আহমাদ ফারুখ: হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, ইতোমধ্যে আমার সশস্ত্র যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। শত্রুসেনাদের মোকাবিলা করার জন্য অদম্য ইচ্ছার কারণে আমি ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আগরতলা ফিরে যাই। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব অনেকে শহরের কলেজ টিলার কোনো এক কলেজের ভবনে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে গিয়ে শেখ ফজলুল হক মনি ভাইকে পাই। আমার যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা শুনে তিনি প্রথমে প্রবল আপত্তি করেন। বললেন ওনার সঙ্গে থাকতে হবে। পরে আমার জোরাজুরিতে মনি ভাই আমাকে মুজিব বাহিনীর গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণের জন্য দেরাদুনে পাঠান। তখন মুজিব বাহিনী কেবল রাজনৈতিক কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হতো। প্রথম ব্যাচে আমরা আগরতলা থেকে ২৫ জন ট্রেনিংয়ে যাই। আমাদের ২৫ জনের মধ্যে তৎকালীন ছাত্রনেতা ও বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা নাজমুল হাসান পাখী, কামরুল ইসলাম (সাবেক খাদ্যমন্ত্রী), মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনসহ (বিএমএ নেতা) বৃহত্তর কুমিল্লা, সিলেট ও ঢাকার ছাত্রনেতারা ছিলেন। দেরাদুন গিয়ে দেখি ওখানে সারাদেশ থেকেই ছাত্রলীগ কর্মীরা জড়ো হয়েছে। যথারীতি ট্রেনিং শুরু হলো। এক মাসের ট্রেনিং। বিভিন্ন ধরনের বন্দুক চালনা, বন্দুকগুলো খোলা আবার জোড়া লাগানো, বিস্ফোরকের ব্যবহার, রাতের আকাশ দেখে কীভাবে চলাফেরা করতে হবে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলাফেরার অনেক কায়দাকানুন শিখলাম। ট্রেনিং শেষ। আগরতলা ফিরব। দেশের অভ্যন্তরে যাব, যুদ্ধ করব। উত্তেজনার শেষ নেই। কিন্তু হায়! ভারতীয় প্রশিক্ষকরা ইতোমধ্যেই আমাদের মধ্য থেকে আটজনকে স্থানীয় প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করলেন আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতাদের সম্মতিতে: হাসানুল হক ইনু (সাবেক তথ্যমন্ত্রী), শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক (বাসদ নেতা), যশোরের নোয়াপাড়ার খাইরুজ্জামান, সিলেটের মোহনলাল সোম ও আমি। ফলে যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা আর হলো না আমার। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে আমি মনি ভাইয়ের নির্দেশে আগরতলা ফিরে আসি। তখন মনি ভাই ও রেজা ভাই প্লাস ফ্যাক্টরি নামক একটি জায়গায় থাকতেন। মনি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'ভালোই হলো। এবার তুমি যুদ্ধে যারা আহত হয়ে দেশ থেকে এখানে আসছে, তাদের দেখাশোনা করো। হাসপাতালগুলোয় যাও আর তাদের চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থার দায়িত্ব নাও।' মনি ভাইয়ের কথার অবাধ্য হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। অগত্যা এবারও সশস্ত্র যুদ্ধে যাওয়া হলো না আমার। দুঃখ কেবল, আমার সঙ্গে যারা ট্রেনিং করেছে, তারা সবাই যুদ্ধ করছে। বন্ধুবর মনির চৌধুরীও (সাবেক সংসদ সদস্য ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি) প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে আর আমি পারছি না। তবে যুদ্ধে অনেক প্রিয় কর্মীকে আমি হারিয়েছি। বন্ধু কামালের ছোটো ভাই, আমার প্রতিবেশী নিজামকে হারিয়েছি। সম্প্রতি নিজামের নামে কুমিল্লা পুলিশ লাইন থেকে কান্দিরপাড় পর্যন্ত সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

আহমাদ ফারুখ: দেখুন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম– সবই পরিচালনা করেছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর অসীম সাহসিকতা, দক্ষতা ও যোগ্যতায়। তাঁর ছিল মানুষকে কাছে টানার, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অসাধারণ মোহনীয় শক্তি। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর ছিল বিপুল খ্যাতি। তার অকৃত্রিম দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসা, অমায়িক ব্যক্তিত্ব তাঁকে স্থান করে দিয়েছে অবিসংবাদিত নেতার সম্মানে। পাকিস্তানিদের ২৩ বছরের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে ৩০ লাখ মানুষের রক্তস্নান আর পাঁচ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙালি তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা অর্জন করে। পাকিস্তানিদের সঙ্গে বাঙালির ২৩ বছরের এক অসম যুদ্ধের সমাপ্তি হয় সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই অসম যুদ্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সংগ্রাম আর অবদানে নিজ নিজ জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর নাম বিশ্বখ্যাত। তাদের নামের পাশে যুক্ত আছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ সংগ্রাম আর একনিষ্ঠ সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি আজ ইতিহাসের বরপুত্র। তাঁর জীবনাদর্শে আমরা সংগ্রামী চেতনা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাই– যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালির বিজয়, বাংলাদেশ কোনটাই বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া নয়। আমি মনে করি প্রতিটি শব্দই সমার্থক এবং একে অপরের পরিপূরক।

আপনি যখন দেরাদুনে, 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ' তখন কোন অবস্থায়?

আহমাদ ফারুখ: 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ' তখনও নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে। আবদুল মান্নান চৌধুরী সম্পাদনা করছেন। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় বেশকিছু কপি নিয়ে যেত। সাপ্তাহিক বাংলাদেশে যুদ্ধের সব সেক্টরের খবর থাকলেও বিশেষ করে বৃহত্তর কুমিল্লা, ফেনীর একাংশ,

হবিগঞ্জের একাংশ ও ঢাকার নরসিংদীর খবর বেশি গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশন করা হতো। কেননা এই এলাকাগুলোয় আমাদের যোদ্ধারা ছাড়াও মুক্তিকামী কিছু স্বেচ্ছাসেবকও ছিল, যারা জীবনের পরোয়া না করে পত্রিকাটি বিলি করতেন। পত্রিকাটি এতদঞ্চলের মুক্তিকামী সাধারণ জনতার মনোবল বাড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছে। ৮ ডিসেম্বর কুমিল্লা পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যোদ্ধারা কুমিল্লার দিকে ছুটে যায়। সবকিছু গোছগাছ করে আমাদের যেতে কিছুটা দেরি হয়। স্থানান্তর, আনন্দ-উল্লাস, স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ– সবকিছু মিলিয়ে পত্রিকাটির প্রকাশনা তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকে।

দেশ স্বাধীনের পর সাপ্তাহিক বাংলাদেশ...

আহমাদ ফারুখ: মুক্তিযুদ্ধের পর ঢাকায় এসে কোর্ট বিল্ডিংয়ের উলটো দিকে ১৩নং কারকুনবাড়ি লেনের একটি প্রেস থেকে পুনরায় প্রকাশনা শুরু হয়। ঢাকায় আসার পর সম্পাদক আবদুল মান্নান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। আমি তখন পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। এই ক্ষেত্রে কুমিল্লা প্যানোরমার আবু ভাই সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ঢাকায় আসার পর তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানও একদিন দৈনিক বাংলাদেশ নাম দিয়ে পুনঃপ্রকাশের চেষ্টা করে। আমরা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করার পর সম্ভবত পরের দিনই তারা 'দৈনিক বাংলা' নাম নিয়ে পত্রিকা ছাপা শুরু করে।

অবশ্য ঢাকায় আসার পর আমরা 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'-এর মাস্ট হেডে একটা সংযোজন করি। 'মুক্তাঞ্চলে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক' শব্দমালাটি বাংলাদেশ শিরোনামের উপরে সংযোজন করি। তবে অসুবিধা একটা দেখা দিল। অন্যের প্রেসে বসে তো আর একটা পত্রিকার যাবতীয় কাজ করা যায় না। একটা অফিস দরকার। আলাপচারিতায় তখন এগিয়ে এলেন তৎকালীন আদমজী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চিফ ম্যানেজার সৈয়দ হাবিবুল হক। তিনি আদমজী বিল্ডিংয়ের নিচতলায় আমাদের অফিসের জন্য একটা স্পেস ব্যবস্থা করে দিলেন। অফিস তো পেলাম। ছাপাব কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে পেলাম টয়েনবি সার্কুলার রোডে বুক প্রমোশন প্রেস। ম্যানেজার লোকটি অনেক সহযোগিতা করল। জানলাম, প্রেসটির মালিক পলাতক। পরে অবশ্য সরকার ফরিদপুরের একজন ভদ্রলোককে প্রেসের প্রশাসক নিয়োগ দেন। আমরা প্রশাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করি। সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনায় যা হয়– মাঝেমধ্যেই টাকাপয়সার টানাটানিতে হয়তো সময়মতো ছাপাখানা থেকে বের করতে পারিনি।

এভাবেই চলছিল। মনি ভাই তখন যুবলীগ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমরাও সম্পৃক্ত হলাম। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠা হলো। সৈয়দ রেজাউর রহমান প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং আমি সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পাই। সম্পাদনার সঙ্গে সাংগঠনিক কাজও চালিয়ে যাচ্ছি। অর্থের অনটন তো আছেই। পত্রিকা সম্পাদনা করার সময় দুটো হেডলাইন এখনো আমার মনে পড়ে– 'বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারী ঢাকা ফিরছেন।' এই শিরোনামটি একমাত্র আমাদের পত্রিকাতেই এসেছিল। অপর শিরোনামটি ছিল: 'মুক্তিযুদ্ধ কি কেবল সশস্ত্র বাহিনী করেছে?' শেষ শিরোনামটি যুদ্ধপরবর্তী স্বাধীনতাযুদ্ধের শৌর্যবীর্য প্রদর্শনকারীদের পদক প্রদান উপলক্ষ্যে সাধারণ নাগরিকদের উপেক্ষার কারণে। অবশেষে পঁচাত্তরের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। যতদিন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে, আমরা সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে, সাহস নিয়েই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছি।

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

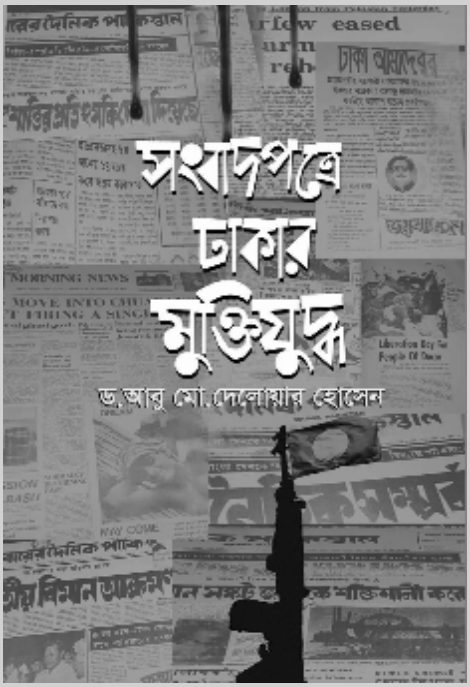

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

যুদ্ধদিনের কথা

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে অন্যরকম এক আমেজে পালিত হচ্ছে এবারের বিজয় দিবস। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক (ডিজি) মহোদয়ের (কবি ও সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ) অনুরোধ– যুদ্ধদিনের স্মৃতির ওপর একটি লেখা লিখতে হবে। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সংস্থার নিয়মিত প্রকাশনা 'নিরীক্ষা'র বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হবে। বিষয়টি যেমন কঠিন, তেমনই আগ্রহ সৃষ্টিকারী। এতদিন পর অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। সহযোদ্ধাদের কে কোথায় আছেন, সব মনে পড়ছে না। কোনো কোনো মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভাসে ঠিক, তবে নাম-ঠিকানা মনে নেই। অত্যন্ত নিবিড় বন্ধু সহযোদ্ধা মনির তালুকদার, শাহাদত অনন্তজীবনে চলে গেছেন।

তখন অগ্নিঝরা গণঅভ্যুত্থানের দিন। সকাল-দুপুর-বিকেল মিছিলে মিছিলে ক্যাম্পাস-জীবন (ঢাবি) উত্তাল তরঙ্গের মতো ওঠানামা করছে। উপকূলীয় এলাকায় সত্তরের ১২ নভেম্বর ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসে এক মিলিয়নেরও (১০ লাখ) বেশি মানুষের জীবনাবসান। সত্তরের নির্বাচন হয়ে গেল এবং নির্বাচনে সেদিনের বাঙালি জাতির অবিসংবাদী নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তথা বাঙালি জাতির প্রথমবার নিরঙ্কুশ বিজয়, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কি করবে না, এ নিয়ে গোটা বাংলা টালমাটাল। এর মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। দুনিয়া কাঁপানো অসহযোগ আন্দোলনের মাঝে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে সব দিকনির্দেশনা দিলেন। এ পর্যায়ে প্রায় শেষে এসে পরীক্ষা ছেড়ে দিলাম এবং দিনভর ক্যাম্পাসে, কখনো ৩২ নম্বরে, কখনো আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে, কখনো হোটেল শেরাটনে (তখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার আলোচনা চলছে), আবার ক্যাম্পাস– এ এক নিরন্তর চলমান মিছিল-মিটিংয়ের জীবন। খবর এলো বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফায় অনড়, আলোচনা ভেঙে গেছে। ক্যাম্পাসে ছয় দফা এক দফায় পরিণত হলো। স্লোগান উঠল–

:- ছয় দফা না এক দফা– এক দফা, এক দফা
:- বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো
:- জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান-আজিমপুরের গোরস্তান
:- জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

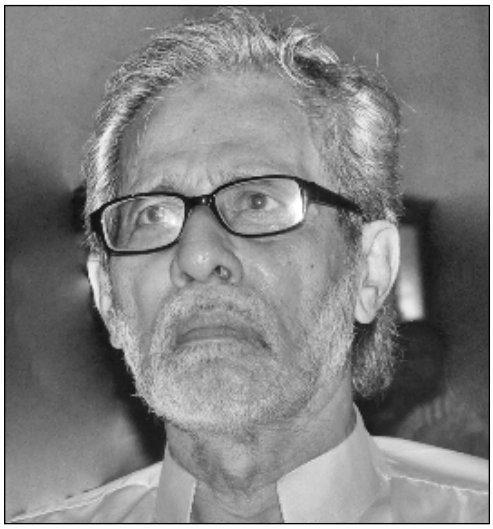
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

এর আগে ফেব্রুয়ারির কোনো একসময় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে এলেন তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা শেখ শহীদুল ইসলাম। সম্ভবত হলের দক্ষিণ ব্লকের দোতলায় বরিশালের ফারুক ভাইয়ের কক্ষে আমাদের সিনিয়র ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ডাকলেন। জানালেন, শেখ ফজলুল হক মনি তথা মনি ভাইয়ের কাছ থেকে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি জানিয়েছেন, 'পাকিস্তান কোনোভাবেই বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। আমাদের ভিয়েতনামের মতো গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে। যেখানেই থাকি না কেন, সময়মতো সব নির্দেশনা পেয়ে যাব।' কারা সেই বৈঠকে ছিলেন, এখন সবার নাম মনে না থাকলেও মনিরুল ইসলাম তালুকদার (মরহুম), শাহাদাত হোসেন (মরহুম), খায়রুল আলম ফেরদৌসের নাম মনে আছে।

ভিয়েতনামের মতো গেরিলাযুদ্ধ করতে হবে– কথাটা শুনে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলাম। খবরের কাগজ এবং হলের টেলিভিশনে ভিয়েতনামের গেরিলাযুদ্ধের যেসব সচিত্র প্রতিবেদন দেখেছি, তাতে ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। গহিন জঙ্গলের মধ্যে রক্তচোষা জোঁক পায়ে কামড়ে ধরছে, পাশ দিয়ে একটা সাপ চলে গেল, কাদামাটিতে পা আটকে যাচ্ছে, পদে পদে বিপদ, এমনই ঝুঁকির মধ্যে গেরিলারা এদিক-ওদিক ছুটছে এবং মওকা পেলে মার্কিন সেনাদের ওপর আঘাত হানছে। বর্ষায় কাদামাটির মাঝে সাপ-জোঁকের আনাগোনা বেড়ে যায়। গেরিলারা বিপদে পড়ে। আমাদের স্বাধীনতার দাবি অর্থাৎ ছিনিয়ে আনার প্রস্তুতি তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং এ থেকে মুখ ফিরিয়ে আনার কোনো পথ নেই। এভাবে যুদ্ধের ভীতিও কমে যেতে থাকে, কারণ আমি একা নই। কাছের মানুষরাই সহযোদ্ধা এবং পাকিস্তানি মিলিটারি হায়েনার দল ১২০০ মাইল দূর থেকে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে। তাছাড়া আমার ভয় কী? আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত UOTC ক্যাডেট, পাকিস্তানি আর্মির কাছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ তথা যুদ্ধবিদ্যা শিখেছি।

এই যখন ভাবছিলাম, অর্থাৎ নিজেই নিজের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ, ঠিক তখনই ছেলেবেলার বন্ধু সাত্তার পাটোয়ারী একই গাঁয়ে বাড়ি, আমার হলে এলো। ২৩ মার্চ বিকেলে। ওয়াপদায় চাকরি করত। বলল, বঙ্গবন্ধু বলেছেন ২৩ তারিখের মধ্যে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। আমরা বেতন পেয়েছি। তাই চলো আজ চাইনিজ খাব, সিনেমা দেখব। রাজি হয়ে গেলাম। হলও প্রায় খালি হয়ে গেছে। ১০-১৫ জন তখনও অবস্থান করছে। কয়েকদিন আগে তৎকালীন ইকবাল হল থেকে (বর্তমান জহুরুল হক হল) বন্ধু চিশতি শাহ হেলালুর রহমান (যুদ্ধ-শহিদ) এলো। বলল, খাওয়াতে হবে। তখন সকাল ১০টার মতো হবে, আমি ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য বেরোচ্ছিলাম। বলল, সকালের নাশতা পড়েনি পেটে। নাশতা খেয়ে ক্যাম্পাসে যাবে। তাঁকে নিয়ে নিচের পাটোয়ারীর ক্যান্টিনে গিয়ে বসলাম। চিশতি নাশতা খেল, আমি চা। তারপর ক্যাম্পাসে দিনভর। সেই শেষ দেখা। পরদিন ২৪ মার্চ বিকালে আবদুস সাত্তার পাটোয়ারীসহ আমি গ্রামের বাড়ি চলে আসি। পরে যুদ্ধের মাঝে জানতে পেরেছি, পাকিস্তান আর্মি ২৫ মার্চ রাতে ইকবাল হল রেইড করে এবং অনেকের সঙ্গে ওয়ালে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে চিশতিকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করেছে। চিশতির সঙ্গে আমার মনে রাখার মতো একটি স্মৃতি হলো– ডেমরায় ভয়াবহ টর্নেডো হয়েছিল। ১৯৬৯ বা '৭০ হবে। সন-তারিখ ঠিক মনে নেই। ভয়াবহ টর্নেডো। টিউবওয়েল, এমনকি নির্মাণাধীন দালানের পিলার পর্যন্ত মাঝখান থেকে ছিঁড়ে অদূরে ফেলেছিল। দালানের কংক্রিটের ছাদ টুকরো টুকরো করেছিল। কত লোক মারা গেছে মনে নেই। তবে অনেক।

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে গ্রুপ করে উদ্ধার কাজে অংশ নেওয়ার জন্য ডেমরায় যাই হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল থেকে এবং চিশতিরা ইকবাল হল থেকে। তিনদিন সেখানে উদ্ধার কাজ চালিয়েছি।

আমাদের পাশাপাশি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকেও একটি টিম আসে এবং আহতদের চিকিৎসা করে। ওই মেডিকেল টিমে একজন ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকন্যা (নাম মনে আছে তবু বললাম না), চিশতির সঙ্গে তার পরিচয়, পরিচয় থেকে ভাব এবং অবশেষে প্রেম। মেয়েটি এরপর নিয়মিত ইকবাল হলে আসত। যুদ্ধ শেষে আমরা হলে ফিরে এসেছি, চিশতির তো আসার কোনো সুযোগ নেই, তবুও ব্রাহ্মণকন্যা কয়েকবার হলে এসেছে শুনেছি। হয়তো চিশতি নেই, মেনে নিতে পারেনি।

ততদিনে জাতি মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। গ্রামে এসে পরদিন ২৫ মার্চ সকালে বালিথুবা বাজারে গিয়ে তরিক মিয়ার চায়ের দোকানে বসার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে অনেকে এসে জড়ো হতে থাকে। একটাই প্রশ্ন–

* কী হতে যাচ্ছে?
* বললাম, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ভেঙে গেছে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফার এক কণাও ছাড় দেননি।
* এখন কী হবে?
* বললাম, শিগগির নির্দেশনা আসবে। তাছাড়া ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সব বলে দিয়েছেন। কী করতে হবে-না-হবে, সব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বলেছেন–
** আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বুঝেসুঝে কাজ করবে।
** যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।
** তোমরা (পাকিস্তানি আর্মি) ব্যারাকে থাকো কেউ কিছু বলবে না।
** আর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।
** ভালো হবে না।
** সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।
** রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।
** এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
** জয় বাংলা।

তখন বালিথুবা হাইস্কুল বানাচ্ছিলাম। সেবারই ক্লাস নাইন খুলি। আমি স্কুলের উদ্যোক্তা, অন্যতম ফাউন্ডার এবং ফাউন্ডিং অনারারি হেডমাস্টার। কিছু সময় ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে আবার চায়ের দোকানে এলাম। এবার আরও বেশি মানুষ জড়ো হলেন। গভীর রাত পর্যন্ত বাজারে ছিলাম। বাড়ি ফিরে রেডিও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। ২৫ মার্চ এভাবে কাটল। ২৬ মার্চ ভোরে আমার এক কাজিন (বোন) ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল: ওঠ ওঠ, যুদ্ধ লেগেছে। সে রেডিও শুনছিল। তখন আকাশবাণী থেকে পাকিস্তানি মিলিটারির ক্র্যাকডাউনের খণ্ডচিত্র পরিবেশন করা হচ্ছিল। বুঝতে বাকি থাকল না। বেরিয়ে পড়লাম মিয়াভাইসহ (আমার জেঠতুতো বড়ো ভাই)। বাজারে এসে দেখি কিছু মানুষ এরই মধ্যে বাজারে চলে এসেছেন– জয়নাল চেয়ারম্যান, আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী, আবদুল লতিফ, জয়নাল মাস্টার, আনোয়ার মাস্টার, আবুল ভূঞা, কালু রাঢ়ি, ফজলু এবং আরও অনেকে।

২৬ মার্চ বেলা ৩টার দিকে চাঁদপুর শহর থেকে আবদুল মমিন খান (ছাত্রলীগ নেতা) একটি সাইক্লোস্টাইল কপি লোক মারফত আমার কাছে পাঠালেন। এতে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তান মিলিটারি জান্তা কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি দেন, তা-ই লিপিবদ্ধ ছিল: 'সম্ভবত জাতির উদ্দেশে এটাই আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ...।'

আমরা নির্দেশনা পেয়ে গেলাম। এবার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পালা। যুবকদের সংগঠিত করতে হবে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, অস্ত্র জোগাড় করতে হবে ...।

ওইদিনই বিকেলে এলাকার মুরুব্বি ও অভিভাবকদের ডেকে ঘোষণা দিলাম– আজ থেকে স্কুলের সব কার্যক্রম বন্ধ। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জন করে স্বাধীন বাংলাদেশে আবার ক্লাস শুরু করব। আল্লাহর রহমতে তা-ই করতে পেরেছিলাম।

পরদিন ২৭ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কালুরঘাট বেতার থেকে মেজর জিয়া নামক এক ব্যক্তির কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ঘোষণাটি পাঠ করতে শোনা গেছে বলে ভারতের রেডিও জানালো। এটি আমাদের কাছে তত ইম্পর্টেন্ট না, যতটা না বঙ্গবন্ধু সাইক্লোস্টাইল করা শেষ বার্তা। এবং অবশ্যই ৭ মার্চের ভাষণ, যার সর্বশেষ মূল্যায়ন আড়াই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ।

পরে চাঁদপুর এলাকার দুই প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এমপিএ) অ্যাডভোকেট আবু জাফর মইনুদ্দিন ও অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম বালিথুবায় এলেন। তাদের সঙ্গে কথা হলো। তারা ফরিদগঞ্জে ফিরে গেলেন। তখনও আর্মি ফরিদগঞ্জে ঢোকেনি।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন শুরু হলো। আমাকে সংগ্রাম পরিষদের সদস্য এবং থানা আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল হক মাস্টারের (মরহুম) নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে থানা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ঘোষণা করা হলো। আমিনুল হক মাস্টারকে সভাপতি এবং আমাকে কার্যকরী সদস্য করা হয়। আমরা যুবকদের আগরতলা যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলাম। একপর্যায়ে নিজেও আগরতলা চলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। এমন সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা এলো– যারা UOCT ক্যাডেট, তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। নিকটবর্তী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। আমি ফিরে এলাম। মনে মনে হাসলাম। পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তা আমাদের UOCT-র মাধ্যমে প্যারা মিলিটারি বানিয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। অথচ আমরা সেই যুদ্ধবিদ্যা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে যাচ্ছি। বলে রাখা ভালো, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই ১৯৬৭ সালে। ওই বছরই UOCT-তে ভর্তি হই এবং প্রথম ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে। প্রতিটি ট্রেনিং ক্যাম্প দেড় মাসের, ওই দেড় মাস আমাদের সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তান আর্মির কমান্ডে থাকতে হতো। প্যারেড, অস্ত্র চালনা অর্থাৎ রাইফেলসহ বিভিন্ন অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। যুদ্ধকৌশলের ওপরও ক্লাস করতে হয়েছে প্রতিদিন প্যারেডের পর। দেড় মাস ট্রেনিং শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে জুনিয়র মিলিটারি সায়েন্স পরীক্ষা দেই এবং ভালোভাবে পাস করি। পরের বছরে ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় ট্রেনিং ক্যাম্পে যাই। এবার সাভারের শফিপুর। লক্ষ্য– ফিরে এসে সিনিয়র মিলিটারি সায়েন্স পাস করা। কিন্তু এখানে এক মাস কয়েক দিন ট্রেনিং করার পর আসে ২১ ফেব্রুয়ারি। আমি খায়রুল আলম ফেরদৌসসহ কয়েকজন ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে অর্গানাইজ করি ২১ ফেব্রুয়ারিতে সকাল-বিকাল পিটিতে বুট পরব না। নীরবে শহিদদের স্মরণ। যথারীতি তা-ই করা হলো। আমরা বুট না পরে খালি পায়ে সকালে প্যারেড ও বিকেলে পিটি করলাম। সন্ধ্যার পর টেন্টে ফিরে দেখি, প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের যত অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, সব তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা ক্যাম্পে ক্যাম্পে পরামর্শ করি– অলরেডি গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বাধীনতার দাবিতে। এ অবস্থায় আমরা ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতে পারি না। রাতেই আমরা প্রস্তুতি নিই। এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আমাকে এবং খায়রুল আলম ফেরদৌসকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু কে কাকে বহিষ্কার করে? ভোরে আমরা পাঁচ শতাধিক UOCT ক্যাডেট একযোগে বেরিয়ে রাস্তায় নামি এবং যে যেভাবে পেরেছি ঢাকায় ফিরে এসেছি। ক্যাম্প ভেঙে গেল। ঢাকায় ফিরে জানলাম বঙ্গবন্ধুকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদের সে কী আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করার নয়। ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হলো এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১০ লাখ লোকের উত্তাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ জাতির পক্ষ থেকে প্রিয় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব করলে ২০ লাখ হাত উঁচিয়ে তা সমর্থন করা হয়।

১৯৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের হিরো সুবেদার মেজর জহুরুল হক পাঠান (সিতারা এ জুরাত) ও সুবেদার আবদুর রবের নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্য অস্ত্রসহ পালিয়ে এলাকায় এলেন। তারা অনেক জায়গায় গেছেন এবং দিনে দিনে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমি আমার জ্যাঠাজি আবদুল জলিল মিয়াজি, যিনি এলাকায় বড়োমিয়া নামে পরিচিত। বললাম, আমাদের তো দুটো কাচারি আছে। একটা কাচারিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প করতে চাই। জ্যাঠাজি সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং কাচারি ঘরে তাদের থাকার সব বন্দোবস্ত করলেন। ২৭ জুন তারা আমাদের কাচারিতে আসনে এবং ক্যাম্প করেন। প্রতিদিনই তাদের সংখ্যা বাড়ছিল। ততদিনে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ি বসে প্রস্তুতি গ্রহণ করি মধ্যরাতে মধুরোড স্টেশনের পাশের রেলব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন আর্মি ভারী মাইন এক্সপ্লোসিভসহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে আসেন। জহুরুল হক পাঠানের ব্রিফ অনুযায়ী চাঁদপুর হাজিমারা ইরিগেশন প্রজেক্টের বেড়িবাঁধ পার হয়ে রাত ১১টার দিকে (তারিখ মনে নেই) নৌকাযোগে সুন্দরদিয়া বাজারের পূর্বপাশের ব্রিজের নিচে খাল দিয়ে মধুবাবুর বাড়ির পাশে গিয়ে নৌকা ভেড়ানো হলো। দুইজন এক্সপার্ট কোমরে বিস্ফোরক বেঁধে খাল সাঁতরে ব্রিজের নিচে চলে গেলেন এবং মাইন এক্সপ্লোসিভ ব্রিজের নিচে পিলারে সেঁটে ডেটোনেটর টেনে ফিরে এলেন। পাঠান আমাকে কাছে যেতে দিলেন না, ভয় পাব বলে। পাড়ে উঠে মেশিন চেপে দিলে গগনবিদারী বিকট শব্দে ব্রিজটি উড়ে গেল। আমরা আনন্দে ফেটে পড়লাম। প্রথমদিকে বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় অভিযান চালানো হয় এবং মের দিকে ডাকাতি বন্ধ হয়ে যায়।

আমি বালিথুবা মাঠে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করি এবং এখানে সম্ভবত ১টি ব্যাচ ট্রেনিং গ্রহণ করে। ক্যাম্পে ট্রেনিং গ্রহণ করেন শান্তিবাবু (শিক্ষক), মনসুর আহমেদ, সৈয়দ আহমেদ (কাজিন), শফিকুল আলম (খলিফাবাড়ি),

আমিনুল হক মাস্টারকে সভাপতি এবং আমাকে কার্যকরী সদস্য করা হয়। আমরা যুবকদের আগরতলা যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলাম। একপর্যায়ে নিজেও আগরতলা চলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম

জাফর ও রফিক (বরকন্দাজ বাড়ি), আবদুল বারী (চাচা), মুজাম্মেল (আলমান্দারবাড়ি), মন্টু (মজগুনবাড়ি), নূরু (চৌধুরীবাড়ি) এবং সিক্রেট স্কোয়াডের আবু তাহের, আবুল বাশার ও আবদুল কুদ্দুস। প্রশিক্ষক ছিলেন গোফরান খান (তৎকালীন ইপিআর) ও খালেক তালুকদার। আমি নিজেও গেরিলাযুদ্ধ এবং ভূ-রাজনৈতিক স্ট্রাটেজির ওপর ক্লাস নিয়েছি। চৌধুরীবাড়ির হাশেমের কেরায়া নৌকায় করে আমরা কয়েকজন যেমন– জয়নাল চেয়ারম্যান, জয়নাল ডাক্তার প্রমুখ একসঙ্গে চলাচল করতাম। একপর্যায়ে আমি আগরতলা রওয়ানা দেওয়ার আগে তাদের প্রত্যেককে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাই। তাছাড়া জয়নাল চেয়ারম্যান (মরহুম), যিনি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সমর্থনে তথা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে বাগড়াবাজার আয়োজিত এক সমাবেশে ইউপি চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ওই সমাবেশে উপস্থিত তৎকালীন এমএমএ ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর কাছে তার পদত্যাগের ঘোষণা দেন। আমি চলে যাওয়ার পর জয়নাল চেয়ারম্যান, লতিফ, মুহম্মদুল্লাহ, আনু মাস্টার তারা দেখাশোনা করতেন। পরিতাপের বিষয়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একজন-দুজন ছাড়া কেউ সার্টিফিকেটও পায়নি, ভাতাও না। ডিসেম্বরের বিজয়ের পর আমি তাদের কয়েকজনকে হাতে লিখে সার্টিফিকেট দেই যাতে করে তারা পাকা সার্টিফিকেট পায়। তাতে এক-দুজন ছাড়া আর কেউ পায়নি। শুরুতে একটি সিক্রেট স্কোয়াড গঠন করি। তিন সদস্যের সেই সিক্রেট স্কোয়াডের দায়িত্ব ছিল বাইরে থেকে কোনো অচেনা লোক যাতে গ্রামের ভেতর ঢুকতে না পারে। কোনো কিছু শহরে যাবে না। গ্রামবাসী অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করে। গ্রামের বাজারে দাম কমে যায়।

মধুরোড রেলব্রিজ ধ্বংস করার পর পাঠানরা আমাদের বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যান– কখনো বাশারা, কখনো পানিআলায় ক্যাম্প করে যুদ্ধ করেন। প্রথমবার যখন বাড়ি থেকে আগরতলার উদ্দেশে বেরোচ্ছিলাম, আমার এক ফুপা-ফুপু তাদের মেয়েদের নিয়ে আমাদের বাড়ি আসেন নিরাপদ মনে করে। কিন্তু সময়টা এমন ছিল যে, কোনো বাড়িই নিরাপদ ছিল না। তাই আমি বাড়ির এক কোণে বাঁশঝাড়ের আড়ালে মাচান বানিয়ে দেই। পানি ডিঙ্গিয়ে সেখানে যেতে হয়। সবাইকে বলি আর্মি এলে সেখানে মাচানে গিয়ে বসে থাকতে। আমার দাদি ইন্তেকাল করেন ৯ জুলাই '৭১। সেদিনও আমি চেঙ্গাতলি বাজারে ছিলাম। কেন জানি বাড়ি যেতে মন টানছিল। বাড়ি এসে দেখি দাদি শেষ পর্যায়ে। ভোরে বাকিলা দিয়ে কুমিল্লা সড়ক ও রেলসড়ক পার হয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। আমি ও অন্যরা কলেমা পড়ছিলাম, দাদি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। জানাজা ও দাফন শেষে আবার চেঙ্গাতলি বাজারে ফিরে এলাম।

আমি তাদের সঙ্গে না গিয়ে দ্বিতীয়বার আগরতলা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিই এবং জুলাইয়ের প্রথমদিকে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ি। কেবল মা জেনেছিলেন। কাকতালীয়ভাবে ওইদিন মমিন খান ও শহীদ জাভেদ আমাদের বাড়িতে আসেন। মমিনভাই মাকে বলে দিয়েছিলেন, মা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, চোখে হয়তো জল গড়িয়ে পড়েছিল। লক্ষ্য– কসবা বা

এরপর আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করি এবং গ্রামে গ্রামে একটি জেনারেল নির্দেশ জারি করি যে, গ্রামাঞ্চল থেকে মাছ, মাংস, শাকসবজি, দুধ কোনো কিছু শহরে যাবে না। গ্রামবাসী অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করে। গ্রামের বাজারে দাম কমে যায়

দেখা গেছে, শহরে কিছু লোক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার নাম করে গ্রামে ঢুকেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের খোঁজখবর নিয়ে ফিরে গেছে। এরপরই আর্মি ওই গ্রামে প্রবেশ করেছে। হত্যা এবং ধর্ষণ করেছে। আমার সেই সিক্রেট স্কোয়াডের কারণে আমাদের কয়েক গ্রামে কোনো অচেনা-অজানা লোক ঢুকতে পারেনি। বর্ষার শুরুতে পাকিস্তানি হানাদার আর্মিও মাত্র একবার ঢুকেছিল। বলা যায়, এই একবার ছাড়া নয় মাস এলাকা মুক্ত ছিল। শাশিয়ালিতে ঢুকতে এসে মার খেয়ে ফিরে গেছে। তিন সদস্যের সেই সিক্রেট স্কোয়াডের কেউ আজ আর বেঁচে নেই। সর্বশেষ ইন্তেকাল করেছেন রাঢ়িবাড়ির আবু তাহের। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চেষ্টা করে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট সে পায়নি। ভাতাও না। নিজেকে অপরাধী মনে হয় এজন্য যে, আমি দায় এড়াতে পারি না। তবে অপর দুই সদস্য আবুল বাশার ও আবদুস কুদ্দুস আগেই ইন্তেকাল করেছেন। তারা সার্টিফিকেট পেয়েছে এবং শুনেছি ভাতাও পাচ্ছে তাদের পরিবার। এই সিক্রেট স্কোয়াডে একজন সিক্রেট ইনফরমারও নিয়োগ দিয়েছিলাম, তিনি খলিফাবাড়ির দুদু। আজও বেঁচে আছেন। তবে সার্টিফিকেট বা ভাতা পাচ্ছেন কি না জানি না। (জনশ্রুতি হলো, সংশ্লিষ্ট এলাকার কমান্ডার নামক ব্যক্তিদের যারা টাকা দিতে পেরেছে, তারা সবই পেয়েছে, এভাবে ফরিদগঞ্জে শুনেছি মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে, সর্বশেষ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য আরও ৩ শতাধিক নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।) এরপর আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করি এবং গ্রামে গ্রামে একটি জেনারেল নির্দেশ জারি করি যে, গ্রামাঞ্চল থেকে মাছ, মাংস, শাকসবজি, দুধ আখাউড়া দিয়ে ঢুকব। ততদিনে কোন পথে কীভাবে যেতে হবে, সব জেনে নিয়েছি। ট্রেনিংয়ের জন্য নয়, আমার তা রয়েছে। দুই আর্মি ক্যান্টনমেন্টে দুইবারে দেড় মাস করে তিন মাসের অস্ত্রসহ আর্মি ট্রেনিং আমার রয়েছে। আগরতলা যাওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের নেতাদের সঙ্গে দেখা করা। শুনেছি সেখানে শেখ ফজলুল হক মনি, আ স ম আবদুর রব, মনিরুল হক চৌধুরী, সৈয়দ রেজাউল রহমান, জহিরুদ্দিন বাবর, হানিফ প্রমুখ রয়েছেন। গ্রামের সিক্রেট স্কোয়াড নিয়ে গেরিলা তৎপরতা চালাচ্ছিলাম। ততদিন মমিন খানরাও ট্রেনিং শেষ করে চলে আসেন। এরই মধ্যে শাশিয়ালিতে এক বিরাট যুদ্ধ হয়। পাকিস্তান আর্মি নৌকা করে ভেতরে ঢুকলে শাশিয়ালির পানিতে ডুবে থাকা মাঠ দিয়ে যাওয়ার পথে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, এফএফ ও মুজিব বাহিনীর সদস্যরা একযোগে তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। তারা পালটা গুলি চালালে গ্রামবাসী চারদিক থেকে টেঁটা, বর্ষা, এমনকি বাঁশের লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে আমাদের কাছে পাকিস্তানের বড়ো ধরনের ক্যাজুয়ালটি হয়। যে কারণে পাকিস্তান আর্মি ফরিদগঞ্জকে ভারত ঘোষণা করে তামা বানানোর ঘোষণা দেয়। কিন্তু ততদিনে আমাদের লিবারেশন আর্মি বা বিএলএ, বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী এবং এফএফ বা ফ্রিডম ফাইটার্স বাহিনী যৌথভাবে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান আর্মি গানবোট নিয়ে গাজীপুর, হাজীগঞ্জ এবং স্থলপথে রায়পুর-রামগঞ্জ থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ করলেও প্রতিরোধের মুখে পেছনে হটতে বাধ্য হয়। আমরা মমিন ভাইসহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে চেঙ্গাতলি বাজারের শামসু

ডাক্তারের বাড়িতে ফিরে আসি। শামসু ডাক্তার এবং তাঁর গোটা পরিবার আমাদের শুধু আশ্রয়ই দেননি, যুদ্ধের খবরাখবরও এনে দিতেন। শুনেছি শামসু ডাক্তারও ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু আমরা এতই উদাসীন যে, একাত্তরের পর একবারও তাঁর বাড়িতে যাইনি। আমার বিশ্বাস, তারা ক্ষমা করবেন। চেঙ্গাতলি বাজারে আমাদের সঙ্গে দেখা হয় সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী ও সেলিমের (শুনেছি পরে সে শহিদ হয়েছে)। তাদের কাছে একটি চাইনিজ এলএমজি (ফুল-লোডেড চেইনসহ) ও অন্যান্য অস্ত্র দেখে আমাদের ইনফরমারদের সন্দেহ হয়। তারা তাদের আটকে রেখে আমাদের খবর দেয়। আমরা দৌড়ে বাজারে যাই এবং শাহাদত চৌধুরীকে চিনে ফেলি। পরে তাদের খেতে দেই এবং রাতে আমাদের কয়েকজন গেরিলাকে সঙ্গে দিয়ে তাদের দাউদকান্দি পর্যন্ত এগিয়ে দেই। তারা ঢাকা প্রবেশ করে। শাহাদত চৌধুরীকে চিনেছি এজন্য যে, তাকে আমার চাচা শিল্পী হাশেম খানের বাসায় দেখেছি।

একপর্যায়ে আমাদের বন্ধু শহীদ জাভেদকে চাঁদপুরের দক্ষিণে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মমিন ভাইসহ আমাদের বাড়ি যাই। বাড়িতে রাতের খাবার খেয়ে জাভেদকে নৌকো করে চাঁদপুরের দক্ষিণে পাঠিয়ে আমরা ফিরে আবার চেঙ্গাতলি শামসু ডাক্তারের বাড়ি ফিরে আসি। একদিন পর খবর পাই, জাভেদ শহিদ হয়েছে। সহযোদ্ধারা তাঁর মরদেহ আমাদের গ্রামে নিয়ে আসে। আমরা খবর পেয়ে ছুটে আসি। তাকে দাফন করা হয় দক্ষিণ বালিথুবা সরদার বাড়িতে। জানাজা পড়ান আমার শিক্ষক মাওলানা আইয়ুব আলী। তার মোনাজাতটি আজও মনে আছে- বলেছেন, 'অত্যাচারী পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এখন মুসলমানদের যুদ্ধ করা কর্তব্য।' শামসু ডাক্তারের বাড়িতে আমরা বেশ কিছুদিন কাটাই অর্থাৎ শেষের দিকে নভেম্বর পর্যন্ত। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা মনিরুল হক চৌধুরী আগরতলা থেকে আমাকে লেখেন, 'শফিক ঘাবড়িও না। মনিভাই বলেছেন ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের বিজয়ের পতাকা উড়বে।' আমরা ধীরে ধীরে চাঁদপুর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় মরনেরগাঁর প্রফেসর আবদুর রহিম, আমাদের বাড়ির বিল্লাল, বাবলু ও চাঁদপুরের সবুরসহ ১২-১৩ জন। তারা ভারত থেকে বিএলএফ ট্রেনিং শেষে জাস্ট ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ততদিনে ভারতের পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স বাংলাদেশে পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর এয়ার স্ট্রাইক শুরু করে। কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়ক দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার আর্মি কনভয় চাঁদপুরের দিকে যাচ্ছে। মহামায়ার পূর্বপাশে ব্রিজের উত্তরপাশে একটি বাগানের আড়ালে আমরা মাথা নিচু করে বসে আছি। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। সুযোগ পেলে আক্রমণ করব। কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক, তাই অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ আমাদের একজন একটা গুলি ছুড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে কনভয় থেকে নেমে পাকিস্তানি আর্মি বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে লাগল। এবার মমিন ভাইয়ের নির্দেশে আমরাও গুলি চালালাম যেন তারা মনে করে আমরাও সংখ্যায় কম নই। নইলে গুলি চালাতে চালাতে এগিয়ে এলে আমরা কেউ বাঁচতাম না। পরে দেখা গেছে, পাকিস্তানি আর্মির একটি ট্রাক ব্রিজের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে আছে।

৮ ডিসেম্বর বিকেলে চাঁদপুর মুক্ত হয়। আমরা ৯ ডিসেম্বর সকালে শহরে প্রবেশ করি। সেই থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সবাই মিলে প্রশাসন দাঁড় করিয়ে আমি ১৭ তারিখ বালিথুবায় ফিরে আসি এবং পুনরায় স্কুলঘরের নির্মাণকাজ শুরু করি। পাশাপাশি যথারীতি ক্লাস শুরু করি। ৯ মে স্কুলের মানবিক, বাণিজ্য, বিজ্ঞান– তিন বিভাগের মঞ্জুরি এনে দিয়ে আমার নিয়োগ দেওয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মাহমুদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে ১৩ মে ঢাকায় ফিরে আসি। ২৬ মার্চ ক্লাস বন্ধ করার সময় বলেছিলাম বিজয় ছিনিয়ে এনে স্বাধীন বাংলায় আবার ক্লাস শুরু করব। আল্লাহপাক আমাদের কথা শুনেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও পেলাম স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড থেকে। শুকরিয়া।

যুদ্ধ থেকে ১৩ মে ঢাকায় ফিরে জানলাম, আমরা কয়েকজন ছাড়া সবাই যুদ্ধের ভেতর আমাদের ছেড়ে দেওয়া অবশিষ্ট অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি নিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিলাম, ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না। বাদল, লেলিন, রাকা (পরবর্তী সময়ে লেলিনের স্ত্রী), আখতারুন্নবী, মান্নান, আওয়ালসহ আমরা কয়েকজন পরীক্ষা ছেড়ে যুদ্ধে গেছি। বাকিরা সব পরীক্ষা দিয়েছে, যেমন– মফিজ, বেবী মওদুদরা। অর্থাৎ আমরা মাইনরিটি। পরে অবশ্য কর্তৃপক্ষ সবাইকে অনার্স ডিগ্রি দিয়েছে। যথারীতি এমএ ডিগ্রিও অর্জন করেছি।

লেখক: সংসদ সদস্য, সিনিয়র সাংবাদিক
সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

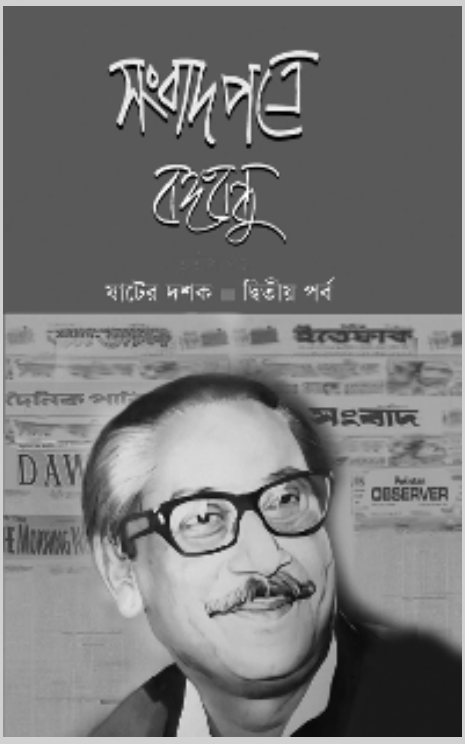

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধে বিলেতপ্রবাসী ছাত্রসমাজ

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

১৯৭১-এর মার্চে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলেও এর প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় তারও আগে। একাত্তরের শুরুতেই বাঙালি জাতি প্রণিধান করতে পারে যে স্বাধীন বাংলাদেশ অপরিহার্য এবং এই স্বাধীনতা সময়ের ব্যাপার মাত্র। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর সবার মন থেকে দ্বিধা বা সংশয়ের ঘোর কেটে গিয়েছিল। কেননা বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের জন্য সবাইকে প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বাংলাদেশে অবস্থানরতরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হাতের কাছে যা কিছু ছিল, তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেই দিনগুলোয় যারা প্রবাসে ছিলেন, তাদের পক্ষে হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব না হলেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসে থাকা বাঙালিদের, বিশেষ করে বিলেতে প্রবাসী বাঙালিদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার ছিল– যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং গণহত্যার নিন্দায় আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়। এটা ছিল অপরিহার্য, কেননা আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ পূর্ণতা পেত না। আর এটি আদায়ের দায়িত্ব ছিল প্রবাসী বাঙালিদের। যে কথাটি অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বলা হয় তা হলো, বাংলাদেশের বাইরে যে দেশে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, তারা হলেন– বিলেতপ্রবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠী। এর অবশ্য একটি কারণও ছিল, কেননা দেশের বাইরে বিলেতেই তখন সর্বোচ্চ সংখ্যক বাঙালির বসবাস। অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বেশ জোরালো আন্দোলন হয়েছিল।

যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত সব বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে বাঙালিদের মধ্যে সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্ররাই প্রথম এগিয়ে আসেন। ১৯৭১-এর জানুয়ারিতেই বাঙালি ছাত্রসমাজ আঁচ করতে পারে যে, দেশ মুক্তিযুদ্ধের দিকেই এগোচ্ছে এবং সেভাবেই আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড শুরু করি। প্রাথমিকভাবে জানুয়ারিতে আমরা পাকিস্তান দূতাবাসের বাইরে এবং পাকিস্তান ছাত্র হোস্টেলে জমায়েত হয়ে বাঙালিদের দাবি নিয়ে স্লোগান দিয়ে শুরু করি। লন্ডনে তখন বরফ পড়ছিল। আমরা বরফ উপেক্ষা করেই জমায়েত হতাম পাকিস্তান দূতাবাসের বাইরে। দূতাবাস ভবনের বেসমেন্টে

তখন বসতেন সেসময়ের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন সাহেব, যিনি আপাদমস্তক একজন নিবেদিত বাঙালি, ডরভয়ের পরোয়া না করে তিনি আমাদের জন্য চা-কফি পাঠিয়ে দিতেন।

ফেব্রুয়ারিতে দেশের রাজনৈতিক আকাশ আরও বেশি মেঘাচ্ছন্ন হলে তৎকালীন জ্যেষ্ঠ ছাত্রনেতা সুলতান মাহমুদ শরিফ (বর্তমানে যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি) ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বাঙালি ছাত্রদের আরও বেগবান করার জন্য একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের এবং আমাদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের। তার কথামতো আমরা ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান ছাত্রাবাসে মিলিত হয়ে গঠন করলাম 'বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি'। এটি গঠনে অগ্রণী ভূমিকায় সুলতান শরিফ ছাড়াও ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, নজরুল ইসলাম আলো, আহমেদ হোসেন জোয়ারদার, ওয়ালি আশরাফ, মঞ্জুর মোর্শেদ, জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, লুৎফর রহমান শাহজাহান, আখতার ইমাম, শফিউদ্দিন বুলবুল মাহমুদ, আনিস রহমান, খন্দকার মোশাররফ, সৈয়দ মোজাম্মেল আলী এবং আমি নিজে।

বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

শরিফ ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ীই ১১ জন ছাত্রকে নিয়ে পরিষদ গঠন করা হলো। আহ্বায়ক করা হলো মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুকে। আর দ্বিতীয় আহ্বায়ক করা হলো– সেই সময়ের তুখোড় ছাত্রলীগ নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে (বর্তমানে বিএনপি নেতা)। আমাকে রাখা হলো ৫নং আহ্বায়কের জায়গায়। আরও ছিলেন ওয়ালি আশরাফ, নজরুল ইসলাম আলো, বুলবুল মাহমুদ (পরবর্তী সময়ে ব্যারিস্টার), জিয়াউদ্দিন মাহমুদ (পরবর্তী সময়ে ব্যারিস্টার) লুৎফর রহমান শাহজাহান (পরবর্তী সময়ে ব্যারিস্টার), আখতার ইমাম (পরবর্তী সময়ে ব্যারিস্টার)। সবার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের কর্মক্ষেত্র পাকিস্তান দূতাবাস থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এবং যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলোয়।

এরই মধ্যে আরও অনেক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে সম্পৃক্ত হলেন– তাদের মধ্যে বিশেষভাবে যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তারা হলেন– এবিএম খায়রুল হক (পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি), আবদুল মজিদ মঞ্জু, মাহমুদ এ রউফ (বর্তমানে লন্ডনে অ্যাকাউন্টেনন্সি পেশায় নিয়োজিত এবং লন্ডন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক), হাবিব ভুঞা, হাবিবুর রহমান (পরে জয়েন্ট কাউন্সিলর ফর ইমিগ্রান্টসের প্রধান), নিখিলেশ চক্রবর্তী (পরে প্রধান শিক্ষক), শ্যামা প্রসাদ ঘোষ (বর্তমানে কলকাতায় আইন পেশায়রত, ব্যারিস্টার), শামসুল মোরশেদ লাবলু (পরবর্তী সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন কর্মকর্তা ব্যারিস্টার ও রাষ্ট্রদূত), আনিস রহমান (বর্তমানে লন্ডনে আইন পেশায়রত ব্যারিস্টার এবং রানি থেকে অর্ডার অব ব্রিটিশ এমপায়ার খেতাবপ্রাপ্ত), মুজিবুল হক, সুরাইয়া খানমসহ (পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) আরও অনেকে।

আমাদের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মসূচি নিয়ে বিলেতে গড়ে ওঠা প্রথম সংস্থা। ৭ মার্চ পর্যন্ত আমাদের কাজ ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের এবং ব্রিটেনে কার্যরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের লবিং করা। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর (যা আমরা বিবিসির সেরাজুর সাহেবের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম), আমাদের সংস্থার নাম পরিবর্তন করি। বেঙ্গলের জায়গায় বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি রাখলাম। আমরা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরপরই পাকিস্তান দূতাবাস দখল করব, কারণ আমরা ধারণা করতে পেরেছিলাম বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কথাই বলবেন, যা তিনি আসলেই বলেছিলেন। এরই মধ্যে বিলেতে মহিলা পরিষদসহ বেশ কয়েকটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়ে যায়, বহু বাঙালি এগিয়ে আসে। তাই ৭ মার্চের দূতাবাস দখল প্রচেষ্টার জন্য হাজারের বেশি লোক জমায়েত করা সম্ভব হয়েছিল, তবে ব্রিটিশ পুলিশ আমাদের দূতাবাস পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি। প্রথমে আমরা সহস্রাধিক লোকসহ হাইড পার্কে জমায়েত হয়েছিলাম।

৭ মার্চের পর আমাদের কর্মকাণ্ডের এবং স্লোগানের ধারাও পরিবর্তিত হলো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বাইরেও ব্রিটিশ রাজনীতিকদের লবিং করার প্রয়োজন দেখা দিল। এ ব্যাপারে দুজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সহায়তা লাভ করেছি, যারা ছিলেন বিবিসির সেরাজুর রহমান (তিনি তখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষেই ছিলেন, যদিও পরে ভোল পালটিয়েছিলেন) এবং লেখক আবদুল মতিন সাহেব, যিনি একটি ব্রিটিশ সংস্থায় উচ্চপদে চাকরিরত ছিলেন। তারা আমাদের Fact Sheets তৈরি করে দিতেন ব্রিটিশ রাজনীতিক এবং দূতাবাসগুলোয় পৌঁছানোর জন্য। প্রয়াত মতিন সাহেব বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং একজন মুজিব গবেষক ছিলেন।

২৬ মার্চ আমরা অন্যদিনের মতো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লবিং করছিলাম। বিকালের দিকে সুলতান শরিফ সাহেব বললেন, দেশে গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির দরজার গোড়ে আমাদের অনশন অবস্থান শুরু করতে হবে। শরিফ ভাইয়ের কথায় সাড়া দিয়ে আমি এবং আরেক ছাত্র আফরোজ আফগান চৌধুরী অনশন শুরু করলাম প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনের ফুটপাতে। তখন সেখানে কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল না। আর ফুটপাতটিও বেশ বিশালকায়। সেদিন বিকেলেই বহু ব্রিটিশ সাংবাদিক, রেডিও ও টেলিভিশন রিপোর্টাররা এসে আমাদের বক্তব্য নেন। ছবি তোলেন। সেই সন্ধ্যায়ই রেডিও-টিভি মারফত আমাদের অনশনের কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় বাংলাদেশের ব্যাপক গণহত্যার সংবাদের পাশাপাশি। পরের দিন গার্ডিয়ান এবং ইকোনমিস্টসহ বহু পত্রিকায় আমাদের অনশনের ছবিসহ সংবাদ প্রচার হওয়ায় অনশনস্থলে গণহত্যার খবরে উত্তেজিত বাঙালিদের আগমনের ঢল নেমে যায়– শত শত বাঙালি এলেন শুধু লন্ডন নয়, বিলেতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। কারণ সেসময় সংগ্রামী বাঙালিদের জমায়েতের কোনো জায়গা ছিল না। জায়গাটি পার্লামেন্টের কাছে হওয়ায় পার্লামেন্টের উভয় সভার সদস্যরা এসে আমাদের কথা শুনতেন, আসতেন বহু ব্রিটিশ এবং বাইরের সাংবাদিক। জায়গাটি পর্যটন এলাকায় হওয়ায় বহু বিদেশি এসে জানতে চাইতেন বাংলাদেশে কী হচ্ছে। কী আমাদের দাবি। আমরা বহু বৃহদাকার পোস্টার নিয়ে বসেছিলাম, যার মধ্যে লেখা ছিল– গণহত্যা বন্ধ করো, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও, পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করো, আমাদের নেতা শেখ মুজিব ইত্যাদি। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ যথা– সুলতান শরিফ, মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, খন্দকার মোশাররফ, বুলবুল এবং এবিএম খায়রুল হক সার্বক্ষণিক সেখান থেকে সাংবাদিক ও রাজনীতিকদের প্রশ্নের জবাব দিতেন।

যেসব বাঙালি আমাদের সাহস জোগাতে আসতেন, তাদের মধ্যে পাঠক চিনবেন এমন কজন হলেন– এবিএম খায়রুল হক (পরে প্রধান বিচারপতি), সৈয়দ আমিরুল ইসলাম (পরে বিচারপতি), রোকনউদ্দিন মাহমুদ (পরে ব্যারিস্টার), আখতার ইমাম (পরে ব্যারিস্টার), আমিনুল হক (ব্যারিস্টার, বিএনপির সাবেক মন্ত্রী), এনামুল হক (পরে জাদুঘর প্রধান), জাকিউদ্দিন, আলো চৌধুরী, সুরাইয়া খানম (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক), কবি গোলাম মোস্তফার নাতনি মঞ্জু মজিদ, বিবিসির সেরাজুর রহমান, কমল বোস, শ্যামল লোধ, রাজিউল হাসান রঞ্জু, ফজলে রাব্বি মাহমুদ (পরে ডক্টর), বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ছেলে আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার (পরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী), লুলু বিলকিস বানু (পরে অধ্যক্ষ ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ), মার্ক টালি, এমপি জন স্টোন হাউস, ব্রুস ডগলাস মেন, মাইকেল বার্নস, আর্থার বটমলি, পিটার শোর, লর্ড ব্রুকওয়ে এবং আরও অনেকে। আমাদের অনশনের গুরুত্বের ওপর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তার স্মরণিকা 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো'তে লিখেছেন, 'আন্দোলনের একেবারের শুরুর দিকেই ডাউনিং স্ট্রিটের নিকটে ছাত্রনেতা মানিক চৌধুরী ও আফরোজ আফগান অনশন ধর্মঘট করেন। পরে সকলের অনুরোধে তারা অনশন প্রত্যাহার করেন। যেদিন অনশন করেছিলেন, সেদিন সাংবাদিক ও

বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নির্মমতার কথা আরও ব্যাপকভাবে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশে সহায়তা করেন।' (পৃ. ৫৪)। মার্চেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে পদার্পণ করার পরই বিশেষ করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা তাকে সংগ্রামের নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সম্মত হলে তার নেতৃত্বে গঠিত হয় স্টিয়ারিং কমিটি। বিচারপতি চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তার স্মরণিকা 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো'তে লিখেছেন, 'ছাত্রনেতা মোশাররফ হোসেন, মানিক চৌধুরী, রাজিউল হাসান রঞ্জু এবং অন্যান্য ছাত্রনেতা আমি লন্ডনে পৌঁছানোর পরেই দেখা করেন।' (পৃ. ১১)। তিনি ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ড. মোশাররফ তার স্মৃতিগ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধে বিলেতে প্রবাসীদের অবদান'-এ লিখেছেন, "এ সপ্তাহের প্রধান কর্মসূচি ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সমর্থনদানের দাবিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে বাঙালি ছাত্রদের অনশন ধর্মঘট। ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী মানিক (ব্যারিস্টার) এবং আফরোজ আফগান চৌধুরী (বর্তমানে হবিগঞ্জে আইনজীবী ও বিএনপি নেতা) ২৯ মার্চ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছিল। ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট পার্লামেন্ট ভবনের কাছে অবস্থিত থাকায় পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে অনশন ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। 'পাকিস্তান ধ্বংস হউক', 'ইয়াহিয়া খানের পতন হউক', 'এগিয়ে যাও মুক্তিসেনা' ইত্যাদি ইংরেজিতে লিখিত স্লোগান সংবলিত ব্যানার ও পোস্টারসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শত শত কর্মী অনশনকারীদের সাথে অবস্থান গ্রহণ করেন। ২৮ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে তার সমন্বয় করার জন্য তখনও কোনো অফিস স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাই ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটের অনশন ধর্মঘট স্থানটি ২৮ থেকে ৩১ মার্চ– এই চারদিন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সারাদিন শত শত বাঙালি ভিড় জমাত অনশন ধর্মঘট স্থানে। সন্ধ্যায় অফিস ও কলকারখানা ছুটির পর এ ভিড় বাড়ত। শত শত বাঙালি জনতা ছুটে আসত অনশনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে। ২৮ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রনেতারা ধরনা (লবিং) দেন এবং স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই প্রাথমিক প্রচেষ্টায় প্রথমে গুটিকয়েক ব্রিটিশ এমপি ধর্মঘটকারী ছাত্রদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে ধর্মঘট স্থানে আসেন। তাদের মধ্যে পিটার শোর ও ডগলাস ম্যানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সপ্তাহে ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের খবরাখবরের সঙ্গে লন্ডনের বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া ও অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জেনেভা থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন। তিনি কয়েকজন ছাত্রনেতাকে সঙ্গে নিয়ে অনশন ধর্মঘট স্থানে এসে বাঙালিদের সংগ্রামে একাত্মতা প্রকাশ করেন। অনশন ধর্মঘট চলার সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ প্রত্যহ অনশনকারীদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করলেও কূটনৈতিক কারণে নিজে অনশনকারীদের দেখতে আসেননি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কর্মকর্তারা অনশনকারীদের খোঁজখবর রাখতেন এবং সমবেদনা প্রকাশ করতেন। ৩১ মার্চ অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের যখন চরম অবনতি হয়, তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় প্রভাবশালী নেতা এমপি এবং উইলসন কেবিনেটের সাবেক অর্থমন্ত্রী পিটার শোরের অনুরোধ ও আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনশন ভঙ্গ করা হয়।" (পৃ. ৩২-৩৩)। (অনুষ্ঠান শুরুর প্রকৃত তারিখ ২৬ মার্চ ১৯৭১– লেখক)

ওই সময়ই দেখা হয় ভারতীয় দূতাবাসের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাটাচি শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তবে তিনি তখন পরিচয় গোপন করে তার নাম ডাক্তার হোসেন বলে জানিয়েছিলেন। তিনিই আমাদের এবং ভারতীয় দূতাবাসের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন। একই সময় মি. লেঙ্গলিও আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জানালেন তিনি একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা, যার দায়িত্ব সংগ্রামরত বাঙালিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রতিদিনই প্রধানমন্ত্রী হিথ তাঁর বাড়ি থেকে পার্লামেন্টে যাওয়ার পথে আমাদের 'সুপ্রভাত' বলে যেতেন। অনশনের দ্বিতীয় দিন প্রধানমন্ত্রী তলব করেছিলেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত সালমান আলীকে। ঠিক তখনই সেখানে অবস্থানরত শামসুল মোর্শেদ, যিনি পরে ব্যারিস্টার শামসুল মোর্শেদ হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন উপদেষ্টা পদে এবং শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রদূত পদে কর্মরত ছিলেন। রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে একটি পত্রিকা ছুড়ে মারলে পুলিশ তক্ষুনি তাকে ধরে নিয়ে যায়। তবে বেশিক্ষণ রাখেনি। তৃতীয়দিন ডাক্তার এসে বলেন, তোমাদের রক্তচাপ নেমে গেছে, তোমরা অনশন ভঙ্গ না করলে তোমাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন শরিফ ভাই টাওয়ার হ্যামলেট এলাকার সংসদ সদস্য (পরে মন্ত্রী) পিটার শোরকে নিয়ে এলেন। শোর আমাদের নিশ্চয়তা দিলেন তিনি পরের দিনই পার্লামেন্টে বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং আমাদের দাবির সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। এ কথায় আমরা তার দেওয়া দুই বোতল দুধ পান করে অনশন ভঙ্গ করলাম। পিটার শোর তার ওয়াদা পূরণ করে গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে কমন্স সভায় প্রথম প্রস্তাবটি পাস করান। এরপর তিনি গোটা নয় মাস আমাদের পক্ষে ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন, ব্যারিস্টার থমাস উইলিয়ামস এমপির পরে।

> পিটার শোর তার ওয়াদা পূরণ করে গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে কমন্স সভায় প্রথম প্রস্তাবটি পাস করান। এরপর তিনি গোটা নয় মাস আমাদের পক্ষে ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন, ব্যারিস্টার থমাস উইলিয়ামস এমপির পরে

এরপর থেকে আমরা রাস্তায় নামলাম। জয় বাংলা, বাংলাদেশের স্বীকৃতি চাই, মুজিব আমাদের নেতা, গণহত্যা বন্ধ করো ইত্যাদি ধ্বনিসহ রাস্তা প্রকম্পিত করে ব্রিটিশ জনগণের মন জয় করা, যাতে সফলতা ছিল শত ভাগ। ব্রিটিশ জনগণও তাদের সংসদ সদস্যদের ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করল আমাদের দাবির পক্ষে।

এপ্রিলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সহায়তায় 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' নামক একটি ব্রিটিশদের সংস্থার সৃষ্টি। ওই মাসের মাঝামাঝি সময়ে একদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে ফোন করে 'পিস নিউজ' পত্রিকার সম্পাদক রজার মুডি জানালেন তারা কজন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশের সমর্থনে একটি ব্রিটিশ সংস্থা গঠনের। আমাদের সহায়তা চাইলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন সন্ধ্যায় আমি, খন্দকার মোশাররফ এবং মাহমুদ এ রউফ পিস নিউজ অফিসে গিয়ে পেলাম সংসদ সদস্য মাইকেল বার্নস, পিএইচডি ছাত্র, ইয়ং লিবারেল নেতা পল কনেট এবং এক পিএইচডি ছাত্রী মেরিয়েটা প্রকোপকে। তারা সবাই বাংলাদেশে চলমান গণহত্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, আন্দোলনকে অধিক বেগবান করার জন্য এখন প্রয়োজন একটি ব্রিটিশ সংস্থা সৃষ্টি করা। মেরিয়েটা জানালেন, তিনি তার প্রতিবেশী ফজলে হাসান আবেদের (ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা) কাছ থেকে গণহত্যার বিস্তারিত শুনে শঙ্কিত এবং ক্ষুব্ধ। সেই বৈঠকেই সৃষ্টি হলো 'অ্যাকশন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা পল কনেটকে সভাপতি এবং মেরিয়েটাকে সাধারণ সম্পাদক করে। মেরিয়েটা উত্তর লন্ডনে তার বিশালকায় বাড়ির একটি তলা দিলেন 'অ্যাকশন বাংলাদেশের' অফিসের জন্য। তার গাড়ি দিলেন এবং ব্যক্তিগত পরিচর্যাকারী মিসেস ডিকে দিলেন অ্যাকশন বাংলাদেশের সাধারণ কাজের জন্য। ধীরে ধীরে বহু বাঙালি

অ্যাকশন বাংলাদেশের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে থাকেন। অ্যাকশন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশে এক নতুন মাত্রা যোগ হয় আন্দোলনে। ফজলে হাসান আবেদ সাহেবও অ্যাকশন বাংলাদেশের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন। অ্যাকশন বাংলাদেশের কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১ জুলাই এবং ১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কয়ার র‍্যালি। ওই মাসেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিলেতের শীর্ষ পত্রিকাগুলোয় দেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা যে তাণ্ডব চালাচ্ছে, এর বর্ণনা দিয়ে পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে, যা পরবর্তী সময়ে বহুবার করা হয়।

মে মাসে পাকিস্তান ক্রিকেট দল বিলেতে গেলে আমরা সার্বক্ষণিক তাদের ধাওয়া করি এবং ব্রিটিশ ক্রিকেটপ্রেমীদের এই মর্মে বোঝাতে সক্ষম হই যে, গণহত্যাকারী দেশের ক্রিকেট দলকে যেন তারা বর্জন করেন। ফলে সেই ক্রিকেট খেলার দর্শকদের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় অতি নগণ্য। মে মাসের একদিন। কেন্দ্রীয় লন্ডনে ইংলিশ স্পিকিং ইউনিয়ন পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নেমন্তন্ন করলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ, অ্যাকশন বাংলাদেশের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সংস্থার এক হাজারের বেশি প্রতিবাদী জনতা পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের গমন পথরোধ করে রাখায় তাদের সেই অনুষ্ঠান বহুলাংশে ব্যর্থতায় সমাপ্ত হয়। এরপর পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা যেখানেই খেলতে যেত, সেখানেই আমরা অবরোধ সৃষ্টি করেছি।

১ জুলাই অ্যাকশন বাংলাদেশ 'অপারেশন ওমেগা' নামে একটি টিমকে খাদ্য ও ওষুধসামগ্রীসহ সরাসরি বাংলাদেশে পাঠায় লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ার থেকে। টিমে পল কনেট ও তার স্ত্রী এলেন কনেটও ছিলেন। যশোর সীমান্তে দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়। পলকে ছেড়ে দিলেও এলেনকে আটকিয়ে রেখেছিল। এলেন তখন অন্তঃসত্ত্বা। তার পেটের ওই সন্তান জন্ম নেওয়ার পর নাম রাখা হয় পিটার উইলিয়াম মুজিব কনেট। পল এবং এলেন উভয়কে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

ট্রাফালগার স্কয়ারের ১ জুলাইয়ের ওই অনুষ্ঠানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদসহ অন্যান্য সংগঠনের কয়েক শ সংগ্রামী উপস্থিত ছিলেন। ওইদিনের অনুষ্ঠানে পাকিস্তান দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিব পদে কর্মরত মহিউদ্দিন আহমেদ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে চলে আসেন। অবশ্য গোপনে তিনি শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এবং গোপন তথ্য পাচার করতেন। অনুষ্ঠানে শ্রী বিমান মল্লিক বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। এর আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি' নিয়ে আলোচনার পর একটি চার সদস্যের পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়, যার ধারাবাহিকতায় রেজিনাল্ড প্রেন্টিস, ব্রুস ডগলাস ম্যান, স্যার আর্থার বটমলি এবং টবি জোসেল পশ্চিমবঙ্গ রিফিউজি ক্যাম্প এবং ঢাকায় যান। ৪ জুলাই দেশে ফিরে তারা সংবাদ সম্মেলনে বললেন, পাকিস্তান গায়ের জোরে পূর্ববঙ্গকে ধরে রাখতে পারবে না বিধায় ইয়াহিয়ার উচিত শেখ মুজিবকে (বঙ্গবন্ধু) মুক্তি দিয়ে আলোচনা করা। তারা আরও বললেন, পাকিস্তানের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি অপরিহার্য। তাদের বক্তব্য ব্রিটিশ এবং বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলোয় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ওই সংবাদ সম্মেলন আয়োজনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, অ্যাকশন বাংলাদেশসহ অন্যান্য সংগ্রাম পরিষদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১ আগস্ট ট্রাফালগার স্কয়ারের র‍্যালি ছিল অতি তাৎপর্যপূর্ণ। এতে প্রায় ২০ হাজার জনতা, যাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ, তারা গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে স্লোগান দেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, মহিলা সমিতি এবং স্টিয়ারিং কমিটির সম্মিলিত সহযোগিতায় ওই র‍্যালির আয়োজন করেন পল কনেট এবং মেরিয়েটা প্রকোপের নেতৃত্বে 'অ্যাকশন বাংলাদেশ'। এতে ভাষণ দেন এমপি রেজিনাল্ড প্রেন্টিস, জন স্টোন হাউস, লর্ড ব্রুকওয়ে, ব্যারিস্টার থমাস উইলিয়ামস এমপি, লেডি গিফের্ড, বব অ্যাডওয়ার্ড এমপি, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং পল কনেট। র‍্যালিতে এনামুল হকের (পরবর্তী সময়ে জাদুঘর প্রধান) নেতৃত্বে সংগীত দল বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংস্থা একটি দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে। র‍্যালি শেষে বিশাল জনতার ঢল প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। এ মাসেই পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত কয়েকজন কূটনীতিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে যোগ দেন, যাদের মধ্যে লন্ডন দূতাবাসের লুৎফল মতিনের নাম উল্লেখযোগ্য।

সেপ্টেম্বরে প্যারিসে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের ৭০০ সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়, যার সদস্যরা অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশে গণহত্যার কথা ব্যক্ত করেন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানান।

অক্টোবরে ব্রাইটনে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা শ্রমিক দলীয় সংসদ সদস্য এবং অন্যদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালান। স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক আজিজুল হক ভূঞার নেতৃত্বেও একটি প্রতিনিধিদল গিয়েছিল সেখানে। সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা গণহত্যা এবং বাংলার মাটিতে পাকিস্তান সৃষ্ট গণদুর্দশার কথা উল্লেখ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলেন। শরণার্থী সমস্যাও আলোচনায় আসে, দাবি উঠে পাকিস্তানকে সাহায্যে বন্ধ করার।

অক্টোবরে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর লন্ডন আগমন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের কয়েকটি দেশে যান বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় এবং গণহত্যা বন্ধের দাবি উত্থাপনের জন্য। বিভিন্ন দেশ সফরের অংশ হিসেবে তিনি লন্ডন এসে পৌঁছেন, যা ছিল প্রবাসী বাঙালিদের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ৩১ অক্টোবর শ্রীমতি গান্ধী পিকাডেলি সার্কাসের কাছে কলিসিয়াম থিয়েটারে প্রবাসী বাঙালি এবং ভারতীয়দের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে এ কথা পরিষ্কার করেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারত নিরলসভাবে কাজ করে যাবে। তার ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ভারত শীঘ্রই কিছু একটা করবে। তিনি বলেন, তিনি এক আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছেন। তিনি এ কথাও বলেন, বাংলাদেশে চালানো হত্যাযজ্ঞ সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। আরও বলেন, ভারত এভাবে আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকতে পারে না। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, মহিলা পরিষদসহ অন্যান্য সংগ্রাম পরিষদ ওই সভার আয়োজনে ইন্ডিয়া লীগ এবং ভারতীয় দূতাবাসকে সাহায্য করে।

একই মাসে ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ব্ল্যাকপুলে। সেখানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আমি (লেখক), আবদুল হাই (পরবর্তী সময়ে সিলেট বারের সভাপতি), সুরাইয়া খানম (পরে অধ্যাপিকা ড. সুরাইয়া) গিয়েছিলাম। আরও গিয়েছিলেন স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে জাকারিয়া চৌধুরী (পরে মন্ত্রী), লুলু বিলকিস বানু, আনোয়ারা চৌধুরী, জেবুন্নেসা খায়ের, জগলুল পাশা, ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী, রুনি খান প্রমুখ। অতীতে রক্ষণশীল দলের সদস্যরা আমাদের বিরুদ্ধে থাকলেও ওই সম্মেলনে আমাদের ব্যাপক প্রচারের পর তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসে। ওই মাসে জেনেভায় পাকিস্তান দূতাবাস থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে চলে আসেন দ্বিতীয় সচিব ওয়ালিউর রহমান। নভেম্বরে বাংলাদেশের স্বীকৃতি, গণহত্যা বন্ধের দাবির পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিও চলে আসে আমাদের স্লোগানে।

২৩ নভেম্বর পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ কেবিনেট সভা এবং সামরিক প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে সতর্ক থাকার নির্দেশ থেকে দেশ শীঘ্রই স্বাধীন হবে– এই আন্দাজ পেয়ে আমরা যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই এবং সেই উদ্দেশ্যে খন্দকার মোশাররফের নেতৃত্বে এক সভায় সৈয়দ মোজাম্মেল আলীসহ (বর্তমানে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহসভাপতি) ৫ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। ওই মাসেই যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টসের সভাপতি জেফ হেবিসের নেতৃত্বে সংস্থার সভায় বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধ এবং স্বীকৃতির দাবি তোলা হয়।

ডিসেম্বরে বিভিন্ন দূতাবাসে আমাদের লবিং করার মাত্রা বেড়ে যায়। ওই মাসের ৬ তারিখে ভারত এবং ভুটান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ঘটনা ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় বিশেষ শিরোনাম করে ছাপানো হয়, আনন্দের জোয়ার শুরু হয় বাঙালিদের মধ্যে। আমরা ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই ভারতের রাষ্ট্রদূত আপা ভাই পান্তকে।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করলে বাঙালি মহলে আনন্দের জোয়ার নামে। সব বাঙালি রাস্তায় নেমে যায়। আতশবাজি হয়, আনন্দ মিছিল হয়। আমরা চলে যাই আমাদের অস্থায়ী মিশন এবং ভারতীয় দূতাবাসে।

এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন যেমন অপরিহার্য ছিল, তেমনি অপরিহার্য ছিল ওই আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে প্রবাসী বাঙালিদের নিরলস ভূমিকা, যে ভূমিকা তারা পূর্ণাঙ্গরূপেই পালন করতে পেরেছিলেন।

লেখক: প্রবাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আপিল বিভাগ

রাঙ্গামাটি মুক্ত হলো যেদিন

শামসুদ্দিন পেয়ারা

হাফলংয়ে প্রথম ব্যাচে ট্রেনিং শেষ করার পর আমাকে পরশুরাম, ছাগলনাইয়া ও সোনাগাজী– এই তিন থানার (বর্তমানে ফুলগাজীসহ চারটি) বিএলএফ কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নোয়াখালী জেলাকে এ, বি এবং সি– এই তিন কোম্পানিতে বিভক্ত করা হয়। 'এ' কোম্পানির কমান্ডার কে ছিলেন, মনে করতে পারছি না। 'বি' কোম্পানির (ফেনী শহর) কমান্ডার ছিলেন ভিপি জয়নাল আবেদিন এবং 'সি' কোম্পানির কমান্ডার আমি। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র।

'বালজ অব বেলোনিয়া' খ্যাত আমাদের এলাকাটি পাকিস্তানিদের জন্য ছিল এক মৃত্যু উপত্যকা। এটি হচ্ছে ভারতের ভেতরে ঢুকে যাওয়া একটি সরু দীর্ঘ ভূখণ্ড। এর সব অংশই ছিল ভারতীয় কামানের আওতাধীন। ফলে পাকিস্তানিরা এখানে সাহস করে ঢুকত না। ঢুকলেও দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করত না।

আমি কিছুদিন আমার কোম্পানি নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িঘরে অবস্থান করতে থাকি। কিন্তু শত্রুর দেখা মিলছিল না। একসময় মনে হলো, এভাবে সময় অপচয় অনর্থক। মনি (শেখ ফজলুল হক) ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি একমত হলেন। কোম্পানির ৩৬ জনকে মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য গ্রুপ (সেনাবাহিনী, ইপিআর, এফএফ) যেভাবে যুদ্ধ করছিল অর্থাৎ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে থেকে 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে শত্রুকে তটস্থ করে রাখা, সেভাবে যুদ্ধ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হলো। শত্রু নেই, তাই যুদ্ধও নেই। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর আমি বিএলএফ সেন্ট্রাল কমান্ডের কাছে আমাকে কোনো একটি সংঘাতপূর্ণ স্থানে নিয়োগের আবেদন করি। মাসখানেক আগরতলায় কাটানোর পর মনি ভাই বললেন, আমার সঙ্গে দেমাগিরি চল। ওখান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকবি। সেখানে সরাসরি ফ্রন্টাল ফাইট হচ্ছে।

শুরু হয় আমার মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়। শিলচর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তিমান ট্রাকে করে একরাত লুংলেহ, একরাত লেহলিংয়ে থেকে তৃতীয়দিন পৌঁছলাম বাংলাদেশ সীমান্তে মিজোরামের শহর দেমাগিরি। কয়েকদিন পর এলেন মনি ভাই এবং স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের (এসএফএফ) অধিনায়ক মেজর জেনারেল সুজন সিং

উবান। পার্বত্য চট্টগ্রাম হানাদারমুক্ত করার মিশনের নায়ক। এখানে এসে পরিচয় হলো রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মনীষ দেওয়ানের (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল) সঙ্গে। দেমাগিরি হচ্ছে এসএফএফ'র যুদ্ধকালীন হেডকোয়ার্টার।

অরণ্য আলো

এখান থেকেই পরিচালিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের ছোটো হরিণা, বড়ো হরিণা, বরকলসহ আরও নানা স্থানের অভিযান। ভারতীয় বাহিনীর একটা অসুবিধা তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছুই চেনে না। এক্ষেত্রে আমি ও মনীষ হলাম তাদের প্রধান পথপ্রদর্শক। আমাদের কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক ছিলেন মেজর সুরী। সুরী, মনীষ ও আমি মিলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে একটা অত্যন্ত কার্যকর টিম তৈরি করি।

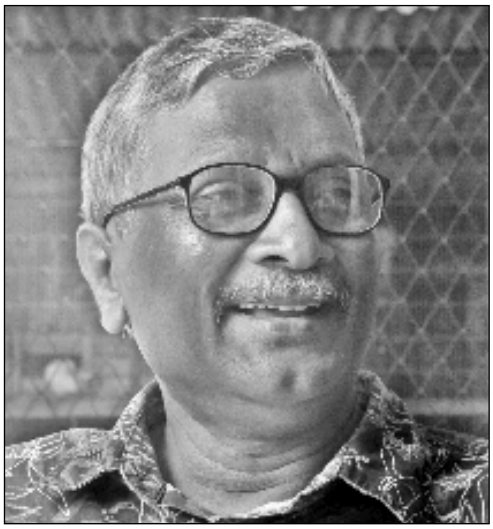

শামসুদ্দিন পেয়ারা

পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর রেগুলার সৈন্যদের সঙ্গে ভারত থেকে পালিয়ে আসা মিজো সশস্ত্র বিদ্রোহীরাও আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে যুদ্ধ করেছে। ফলে আমাদের একদিকে যেমন খান সেনাদের সঙ্গে সরাসরি লড়তে হয়েছে, একই সঙ্গে পেছন দিক থেকে এসে হামলা করা মিজো গেরিলাদেরও মোকাবিলা করতে হয়েছে। যে কারণে এ যুদ্ধ অনেক বেশি রক্তক্ষয়ী ও সার্বক্ষণিক ছিল। সারাদিন কামান-গোলার বিরুদ্ধে কামান-গোলা চালিয়ে সন্ধ্যায় হয়তো একটু চোখ লেগে এসেছে, দেখা গেল তখনই বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মিজোরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করেছে। ওদের আক্রমণ যেমন ধারালো, তেমনই আকস্মিক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নানা কারণে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল ইতিহাসের নিচে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এখানকার যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ। এখানে প্রতি ইঞ্চি ভূমি দখল করতে হয়েছে আমাদের রক্তের ফোঁটা গুনে গুনে। বুকের চামড়া আর কনুই-হাঁটুর ছাল বলতে কিছু আর বাকি ছিল না। এমন একটি পাহাড়ও নেই যেটা দখল করতে গিয়ে এসএফএফ'র সদস্যদের রক্তক্ষরণ হয়নি।

হঠাৎ একদিন খবর এলো মনি ভাই ডেকে পাঠিয়েছেন দেমাগিরি। এলাম। দুজনকেই দেখলাম। মনি ভাই ও জেনারেল উবান। দুইটি নতুন হেলিকপ্টার এসেছে হেলি প্যাডে। জেনারেল জানালেন, 'মিশন রাঙ্গামাটি' শুরু হবে কাল ভোর থেকে। আমাদের অ্যাডভান্স টিম তখনও রাঙ্গামাটি থেকে অনেক দূরে। এ দূরত্ব পার হতে হবে তিন থেকে চারদিনের মধ্যে। ভরসা হচ্ছে দুটি হেলিকপ্টার আর দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার দুঃসাহস।

> পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর রেগুলার সৈন্যদের সঙ্গে ভারত থেকে পালিয়ে আসা মিজো সশস্ত্র বিদ্রোহীরাও আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে যুদ্ধ করেছে

জেনারেল উবান ও মনি ভাই আমাকে নিয়ে ব্রিফিংয়ে বসলেন। মনীষও আছে। টেবিলে ছড়ানো পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্যাপ। তখনকার ম্যাপ এখনকার মতো এত ডিটেইল ছিল না। সারা ম্যাপে ১০-১২টা জায়গার নাম। তখন রাস্তা বলতে একটাই– রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম রোড।

জেনারেল আঙুল দিয়ে ম্যাপে একটা নামহীন জায়গা নির্দেশ করে বললেন, এটা হচ্ছে চিটাগাং রোডের সবচেয়ে নিকটবর্তী সৈন্য অবতরণের জায়গা। জায়গার নাম আমরা জানি না। এখানে তোমাদের নামতে হবে। প্রথম ব্যাচে যাবে তুমি, মনীষ, মেজর সুরী ও দুই হেলিকপ্টার সৈন্য। এখানে শত্রুর অবস্থান কী, তা-ও আমাদের জানা নেই। যদি নিরাপদে নামতে পার, তারপর হেলিকপ্টারে অন্যদের পাঠানো হবে।

জেনারেল বললেন, আমাদের হাতে আর সময় নেই। পাকিস্তানিরা যাতে পিছু হটতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য তোমাদের চিটাগাং রোড দখল করে নিতে হবে। তারপর চারদিক থেকে আক্রমণ করে আমরা ওদের ধ্বংস করে দেব।

এসএম ইউসুফ ও স্বপন চৌধুরীর ব্যাপারে মনি ভাই খুব উদ্বিগ্ন। বললেন, 'ঢোকার পর যেমন করে হোক ইউসুফ আর স্বপনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবি। বেশ কদিন ধরে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।' স্বপন চৌধুরী ছিলেন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। কাউখালী যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

তারিখটা সম্ভবত ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১। হেলিকপ্টারে যখন চড়ছি, শেষবাক্য বললেন জেনারেল উবান, 'এতদিন আমি বলে এসেছি তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার এবং আমি তা পালন করেছি। আজ প্রথমবারের মতো বলছি, তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ঈশ্বরের হাতে। কারণ কোথায় তোমাদের পাঠাচ্ছি, সেটা আমি নিজেও জানি না। শুধু জানি, বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হলে এর বিকল্প নেই। যদি বেঁচে থাক, তাহলে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, যদি মারা যাও, তাহলে মনে করো মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগকারীদের একজন হতে পেরেছ। ইতিহাস তোমাকে স্মরণ করবে।'

ইতোমধ্যে হেলিকপ্টারের পাখা ঘুরতে শুরু করেছে। আমরা ঢুকে পড়লাম বায়ুযানের ঢাউস পাকস্থলীতে। প্রায় নব্বই মিনিট উড়ে এসে হেলিকপ্টার নিচের দিকে নামতে শুরু করল। পথিমধ্যে আকাশ থেকে মাটিতে এক ঘোর লড়াই হয়ে গেছে। হেলিকপ্টারের গায়ে ঠুসঠাস করে বুলেট এসে লাগছিল।

জায়গাটা কতুবছড়ি এলাকার ফুরামোন পাহাড়ের নিকটবর্তী। হেলিকপ্টার পাহাড়গুলোর চূড়া থেকে দু-একশ ফুট উপরে থাকতেই নিচে থেকে বৃষ্টির মতো শুরু হলো গুলি। পাকিস্তানিরাও তো যুদ্ধে এক্সপার্ট। তারাও ধরে রেখেছিল মুক্তিবাহিনী যদি আকাশপথে আসে, তাহলে এখানেই নামবে।

এই গোলাগুলির বৃষ্টির মধ্যে হেলিকপ্টার একটু ঘুরে একটা পাহাড়ের আড়াল নিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। নামার পরে আবার শিলাবৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ আমাদের ওপর। আমি মনীষ আর সুরী লাফিয়ে নেমে দ্রুত পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। এসএফএফের তিব্বতী সৈন্যদের দক্ষতা দেখে বোকা বনে গেলাম। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই তারা পাহাড় চূড়ায় ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ফেলেছে তাদের ও আমাদের জন্য। চারদিকে কানফাটা গোলার আওয়াজ। যেখানে তিন ইঞ্চি মর্টারের গোলা পড়ছে, সেখানের ঝোপঝাড় চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে আমাদের ফিল্ডগানগুলোও স্থাপন করা হয়ে গেছে। আমরা প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলাম। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় আমাদের হেলিকপ্টার দুটো আরও কয়েক ব্যাচ সৈন্য ও গোলাবারুদ নিয়ে আসে। ফলে আমাদের জনবল ও অস্ত্রবল বৃদ্ধি পায়। এখন থেকে আমাদের আক্রমণ শত্রুর চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সারারাত ও পরদিন দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। কিন্তু পাকিস্তানিদের আক্রমণ দুর্বল হয়ে আসতে থাকে। মেজর সুরী বললেন, ওরা পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মনে হয়। আসলে হলোও তাই। বিকাল

থেকে ওদের বড়ো ও ভারী অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। শুধু এলএমজি আর চাইনিজ রাইফেলের গুলি চলতে থাকল।

আমরা বুঝলাম পাকিস্তানিরা পালিয়েছে। পেছনে রেখে গেছে মিজোদের। ভারতীয় সৈন্যরা তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত রইল। এর মধ্যে শুনলাম ওইদিন বিকালে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। আমি ও মনীষ দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। মেজর সুরীকে বললাম, ভারতীয় বাহিনী মিজোদের সঙ্গে লড়াইরত অবস্থায় আমরা দুজন রাঙ্গামাটি গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে চাই। সেখানে শত্রুরা আছে কি না, কোনো বুবিট্র্যাপ রয়ে গেছে কি না– এসব দেখে তারপর খবর দেব ভারতীয় বাহিনী রাঙ্গামাটি ঢুকতে পারবে কি পারবে না। আমরা ভারতীয় বাহিনী থেকে কার্যত আলাদা হয়ে গেলাম। হেঁটেই চললাম রাঙ্গামাটির দিকে। রাতে এক চাকমা বাড়িতে কাটিয়ে ১৭ ডিসেম্বর অতি প্রত্যুষে মনীষ ও আমি কাউখালী এসে পৌঁছাই। এখানকার পাহাড়িরা জানালো চারদিকে এখনো মিজোরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা পরোয়া না করে কাউখালীছড়া পার হয়ে এসে চিটাগাং রোডে উঠলাম। গাড়িঘোড়া নেই। শুনলাম পাকিস্তানিরা যাওয়ার সময় মানিকছড়ি ব্রিজের কিছু অংশ উড়িয়ে দিয়ে গেছে।

আমরা দুজন রাঙ্গামাটির দিকে হেঁটে রওয়ানা দিলাম। যে করে হোক রাঙ্গামাটি পৌঁছাতে হবে। পেছনে মিজোদের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর গোলাগুলির শব্দ তখনও খুব স্পষ্ট। বেশ কতটুকু পথ হাঁটার পর একটা পিকআপভ্যান পেলাম। পেছনের দিক থেকে আমাদের ক্রস করে যাচ্ছিল। আমরা তাতে চেপে বসলাম। আমাদের হাতে এসএলআর পায়ে সবুজ রঙের জঙ্গল বুট।

আমরা রাঙ্গামাটি শহরে যখন পৌঁছাই, তখন সকাল সাড়ে ৮টার মতো। বাতাসে হালকা কুয়াশা, সূর্য তেমন স্পষ্টভাবে কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে আসেনি। রাঙ্গামাটি শহর যেন এক মৃত প্রেতপুরী। ভয়ে কেউ বেরুচ্ছে না। রাইফেল হাতে দুই তরুণ। এরা কারা? মনীষের চেহারায় চায়নিজ ছাঁট খুব স্পষ্ট। আবারও কি মিজোরা এলো? দু-একজন হালকা করে জানালার কপাট খুলে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে।

এখন যেটা দোয়েল চত্বর, আমরা পিকআপ থেকে নেমেছিলাম ওখানে। দুজনে এগিয়ে চললাম ডিসি হিল বেয়ে ডিসি অফিসের দিকে, অর্থাৎ এখন যেখানে উন্নয়ন বোর্ডের অফিস।

উঠেই দেখলাম সামনে ডিসি অফিসের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড। দুজনে ঠিক করলাম সবার আগে জাতীয় পতাকা তুলে সবাইকে জানাতে হবে আমরা মুক্তিবাহিনী। রাঙ্গামাটি এ মুহূর্ত থেকে মুক্ত।

ডিসি অফিসের একজন কর্মচারী জানালেন তাঁর বাসায় জাতীয় পতাকা আছে। তিনি দ্রুত সেটা নিয়ে এলেন। পাকিস্তানিদের ভয়ে ওটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, আলমারির তলায় এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। আকারে বেশ ছোটো। ছোটো হলে ছোটো, তাতে কী? আমি আর মনীষ দুজনে মিলে পতাকাটি পতাকা স্ট্যান্ডের রশির সঙ্গে বাঁধলাম। তারপর দুজনে একসঙ্গে উত্তোলন করলাম স্বাধীন বাংলার পতাকা। পতাকা উপরে উঠছে, আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তখন সকাল সাড়ে ৯টা, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।

লেখক: চেয়ারম্যান, মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক কমান্ড

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

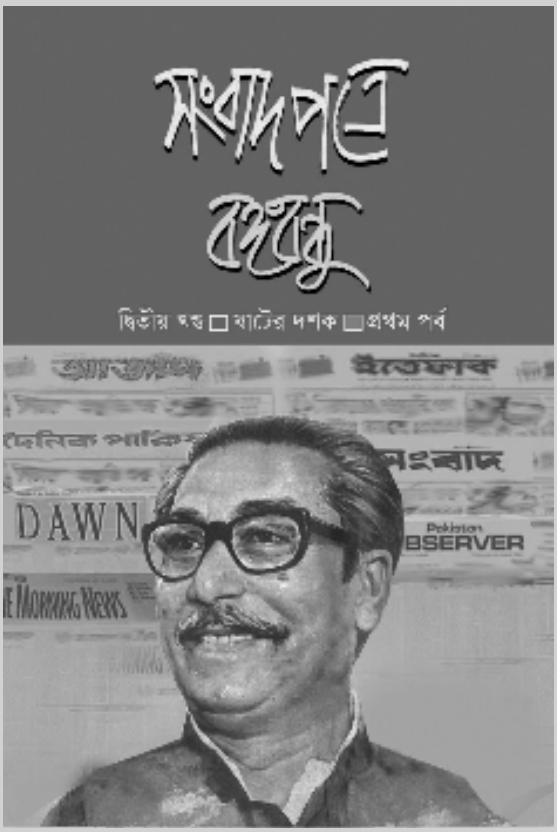

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মা ও মাটির জন্য যুদ্ধ

ড. আরএম দেবনাথ

ভোরে নদী পেরিয়ে যখন মাটিতে পা রাখি, তখন তা 'পূর্ব পাকিস্তান' নয়– আগরতলা বা ত্রিপুরা। সঙ্গে মা ও ছোটো ভাই সুবোধ। ব্যাগ পাব কোথায়, কাপড়ের বোঁচকা হাতে। চোখে-মুখে অন্ধকার। জীবনের প্রথম ত্রিপুরায়– ভারতে। কাউকে চিনি না, কোথায় যাব, তা-ও জানি না। 'জয় বাংলা' থেকে তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য গিয়েছি ত্রিপুরা– আগরতলায়। একটু আশ্রয়ের দরকার। পকেটে কিছু 'পাকিস্তানি' রুপি আছে। তা চলবে কি না জানি না। যেখানে ভারতের মাটিতে পা রেখেছি, সেখান থেকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা শহর খুব বেশি দূরে নয়। জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমাদের অবস্থান কোথায়। আমরা একা নই। একটু পরপরই 'পূর্ব পাকিস্তানের' শরণার্থী ত্রিপুরার মাটিতে পা রাখছে। নৌকাভর্তি মানুষ আশ্রয়ের জন্য আসছে স্রোতের মতো। ১৯৭১ সালের মে মাস– তারিখটি ঠিক মনে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিচিত 'দেশি' একজনকে পেলাম। পরিচিত হলাম। তার সামান্য ভারতীয় মুদ্রার সহায়তায় বাসে উঠে গেলাম আগরতলায়। বাসস্টপেই আশ্রয়। ক্ষিধায় পেট জ্বালা করছে। মা ক্লান্ত। আমাদের চোখে-মুখে ঘুম। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী 'থানা'র (বর্তমানে উপজেলা) পশ্চিমের গ্রাম রামদি থেকে রওয়ানা দিয়েছি দুইদিন দুইরাত আগে।

হঠাৎ খবর, দেশ ছাড়তে হবে। থানা-বাজারে 'মিলিটারি' এসেছে। এসে প্রথমদিনেই ব্রাশফায়ার করে বেশকিছু লোককে মেরে ফেলেছে। চারদিকে আতঙ্ক। নানা গুজব। হিন্দুদের মেরে ফেলবে। হিন্দুরাই পাকিস্তানের শত্রু। এ কী কথা, সবাই মিলে ১১ দফা, ৬ দফা আন্দোলন করেছি, স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছি, পরে স্বাধীনতায়– এর মধ্যে ভাগাভাগি করা হচ্ছে কেন? এটাই ছিল পাকিস্তানিদের বিভেদনীতি। মনোহরদীর রশিদ ভাইয়ের (তারা মাস্টার) নেতৃত্বে আমরা বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা মিলে ২৪ এপ্রিল কটিয়াদী থানা হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করি। থানার অস্ত্র লুট করি। থানা সার্কেল অফিসারের অফিসে আগুন লাগাই। ওই সময়ের স্মৃতি হিসেবে আজও আমার কাছে সরকারি একটি 'ইংলিশ টু ইংলিশ' ডিকশনারি আছে। এটা বাঁধাই করে রেখে দিয়েছি। এই ডিকশনারি বাড়ি থেকে নদীপথে রায়পুরা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'সিএন্ডবি' রোড হয়ে আগরতলা আসার পথে রাতে 'বালিশ' হিসেবে কাজ করেছে। মনে পড়ে, নরসিংদীর রায়পুরা থেকে

আমাদেরকে দালালরা নিয়ে গিয়েছিল আরেক জায়গায় নৌকা করে। তারা তুলেছিল এক জেলে পরিবারের বাড়িতে। রাতে সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করে দালাল। ওরা জনপ্রতি ১০০ টাকা নিয়েছিল। ওই জেলে পরিবারের জালের ওপর কিছুক্ষণ ঘুমানোর কথা মনে পড়ে। যতটুকু মনে পড়ে, সাবেক সচিব ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সানাউল হক সাহেবের বাড়ির কাছ দিয়ে কোনো এক পথে আমরা নদী পার হয়ে ত্রিপুরায় যাই। সঙ্গী-যাত্রী সবাই সনাতন ধর্মাবলম্বী। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই অল্পবয়সি মেয়ে। দারুণ ভয় মনে। কোথাও কোনো অঘটন ঘটে যায় কি না। তাদের অনেকেরই বিশ্বাস আছে। 'গার্ডিয়ানরা' পশ্চিমবঙ্গের আত্মীয়স্বজনের নাম দিয়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তারাও আছে আমার সঙ্গে। ভাবছি আর ভাবছি কোথায় যাব, কোথায় থাকব। হঠাৎ মা মনে করলেন আমাদের এক মামার কথা। সুধীর অধিকারী। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর তিনি আগরতলা চলে আসেন। মা'র কাছে শুনলাম তিনি নাকি পুলিশে চাকরি করেন।

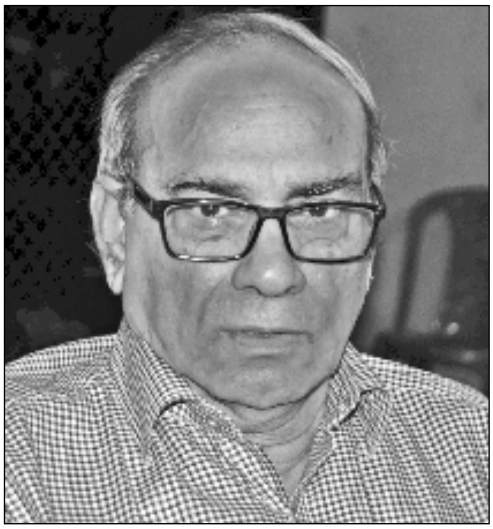

ড. আরএম দেবনাথ

ভাবলাম, তাহলে একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করি। সত্যি সত্যি মামার খোঁজ পেয়ে গেলাম। তিনি পুলিশেই। তার একটা জমি ছিল আগরতলা বিমানবন্দরের কাছে। সেখানে একটি ঘরে 'কেয়ারটেকার' থাকে। তার সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। 'পাকিস্তানি রুপি' ভাঙাতে দিলেন। খুব অল্প টাকা– তিনশ'র মতো। এর সঙ্গে যোগ হয় আগরতলায় তখনকার মুক্তিযুদ্ধ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া এক মাসের বেতন। তখন আর টাকা কোথায় পাব।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরপর সময়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। কয়েকদিন পরে ঢাকা ফিরব। তখন আমি সরকারি জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক। ৫০০-৫৫০ টাকা মাসিক বেতন। ঢুকেছি ১৯৬৯ সালে। থাকি জগন্নাথ হলের 'নর্থ হাউসের' ১০নং কামরায়। আরেক ছাত্রের সঙ্গে। আমি এমকমের পর অর্থনীতিতে আবার ভর্তি হয়েছি। কিন্তু হলে সিট নেই। ছাত্ররাজনীতির সূত্র ধরে হলেই থাকি। কখনো ১০ নম্বর কামরায়, কখনো সিনিয়র বন্ধু সহকারী হাউস টিউটর মুক্তিযুদ্ধে শহিদ অনুপদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের বিশাল কামরায়। ১০ নম্বর কামরায় আমার ট্রাঙ্কভর্তি বই, বাড়ির কাগজপত্র, সার্টিফিকেট, একটা গোল্ড মেডেল, বাবার দুর্লভ ছবি ও পুরোনো ডকুমেন্ট সব। পরিকল্পনা ছিল কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকায় বাসা নেব। মা ও ভাইকে ঢাকায় নিয়ে আসব। এরই প্রস্তুতি এসব। তা আর হয়নি। সারাদেশে তখন তুমুল উত্তেজনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা সবসময় বর্তমান আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে থাকে। তখন থেকে স্বাধীনতার পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়। এমন উত্তেজনাকর মুহূর্তে আসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। পরিষ্কার ইঙ্গিত– স্বাধীনতার, মুক্তিযুদ্ধের। আমি এর পরপরই গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। সেখানে অনেক কাজ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আছে, স্থানীয় নেতাদের সংগ্রাম পরিষদ আছে। ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা খুবই সরব। ইউনিয়নে ইউনিয়নে যাই। সভায় সভায় বক্তৃতা করি। বেতনের কথা মনে নেই। যখন মনে হয়, তখন ১৯৭১ সালের এপ্রিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে 'ক্র্যাকডাউন' করে বসে আছে। ঢাকায় ওইদিন কী হয়েছে, কত লোক শহিদ হয়েছেন, এর কিছুই জানা সম্ভব ছিল না। আজকের দিনের মতো 'মোবাইল ফোন' ছিল না। থানা হেডকোয়ার্টারে কারও 'ল্যান্ড ফোন'ও ছিল না। তখন চালু ছিল 'টেলিগ্রাম', যা আজ অচল। এমতাবস্থায় কটিয়াদীতে যখন প্রথম মিলিটারি যায় মে মাসের দিকে, তখন আতঙ্কে মানুষ ঘরছাড়া। আমরা গ্রামবাসী ভোরে দুটো ভাত খেয়ে চলে যেতাম নদীর ওই পারে। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল আড়িয়াল খাঁ নদী, যা ছিল খুবই বেগবতী নদী (এখন তা একটি খালমাত্র)। চৈত্রেও গভীর জল থাকত। আমরা ছেলেরা ভয়ে একা ওই নদীতে স্নান করতে নামতাম না। ওই নদীর চরে অস্থায়ীভাবে ছিল আমাদের বসবাস। সারাদিন শত শত মানুষ চরে কাটাত মিলিটারির ভয়ে। আমি মাকে রেখে চলে যেতাম 'জয়বাংলা বাজারে'। সেটা ছিল বেশ কিছুটা দূরে। তা ছিল আসলে 'মাস্টারবাড়ি'। নদীর ত্রিমোহনায় ছিল মাস্টারবাড়ি। বেশকিছুটা দুর্গম জায়গা। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানে বাজার জমে থাকত। খবরাখবর আদানপ্রদান করা হতো সেখান থেকে। কোথায় কোথায় 'মিলিটারি' যাচ্ছে, তারা কী করছে, তাদের গতিবিধি কী, তা জানার একমাত্র মাধ্যম ছিল মাস্টারবাড়ি। দুর্ভাবনার কথা– ইতোমধ্যেই মানুষের মন বদলাতে শুরু করে। মিলিটারিকে সহায়তা করার জন্য একটা শ্রেণি তৈরি হয়ে যায়। এরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোক। তাদের কাজই হলো 'মিলিটারির' কাছে খবরাখবর দেওয়া। জয় বাংলার সমর্থক আর যুবকশ্রেণি ছিল তাদের টার্গেট। অতএব সাধারণ ভীতি যেমন একদিকে, অন্যদিকে 'ইনফরমার' এবং মিলিটারির সহযোগীদের ভয়। আমার ভয় বেশি। যে অঞ্চলে থাকি, সেখানে আমার অধ্যাপক হিসেবে পরিচিতি বেশি। থানা 'হেডকোয়ার্টার' আমরা লুট করেছি, এই খবর মুখে মুখে। ছোটো ভাইয়ের নামও সেখানে। সেও 'আসামি'। রশিদ ভাই কোথায় তখন আর জানার উপায় ছিল না। তার সঙ্গে ছিল বেশ কয়েকজন ইপিআর সদস্য (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল), যা এখন বিজিবি। তাদের খবরও জানি না তখন। ওই সময়ই খবর আসে দেশত্যাগ করতে হবে। ইতোমধ্যে কটিয়াদীর দেবেন সাহার বাড়ি হয়ে দেশত্যাগ করেছেন বেগম মতিয়া চৌধুরী ও তাঁর স্বামী সংবাদ সম্পাদক প্রয়াত বজলুর রহমান। এতে সবার মনে ধারণা হয়, মুক্তিযুদ্ধ সমর্থকদের সামনে বিপদ আছে। দেশত্যাগ করাই একমাত্র বাঁচার পথ। আমরা যখন গ্রাম ত্যাগ করি, হাতে কোনো টাকাপয়সা সেভাবে ছিল না। যাওয়ার সময় যাবতীয় তৈজসপত্র, বিছানাপত্র, গৃহস্থালি বস্তু ও আসবাবপত্র মা বিলিয়ে দিয়ে যান। শেষ মুহূর্তে দেখলাম মা একটা কাজ করছেন। ভিটামাটিকে উনি প্রণাম করছেন। আমাদেরকে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করতে বললেন। তা করলাম। ধরে নেওয়া হচ্ছে চিরবিদায়– বিদায় স্বদেশ। মা ভিটামাটি থেকে একখণ্ড মাটি সংগ্রহ করলেন। একটা গামছায় তিনি তা গিঁট দিয়ে বাঁধলেন। গ্রাম থেকে নদীপথে নরসিংদীর রায়পুরা, সিএন্ডবি রোড হয়ে ত্রিপুরা– সবসময় মায়ের একান্ত সম্পদ এই একখণ্ড মাটি। মা ও ভাইকে নিয়ে আমি যখন পিসতুতো ভাইয়ের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাট শহরে এক রুমের একটা ঘরে আশ্রয় নিই। তখন মা ঘরের এক কোণে পূজার ব্যবস্থা করলেন। আমাদের ভিটেমাটিকেই তিনি পূজা করলেন ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে দেশে ফিরে যে পুরোনো ভিটেতে ঘর তুলি, সেই ভিটার সঙ্গে ওই মাটি মা মিলিয়ে দিয়ে আবার পূজা করলেন। আমার কাছে এ জীবনের এক নতুন শিক্ষা। মাটি হচ্ছে মা ও স্বদেশ। এই শিক্ষা নিয়েই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ।

কলকাতায় গিয়ে প্রথম প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করি মুক্তিযুদ্ধের সরকারের সঙ্গে। অফিসটি ছিল থিয়েটার রোডে। সেখানে গেলেই বহু পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হতো। অধিকাংশের মধ্যেই হতাশা। পারস্পরিক দোষারোপ, নিন্দাবাদ ও অপপ্রচার। দেশ কবে স্বাধীন হবে, আদৌ হবে কি না– এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব বলা যায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এর মধ্যে যে কাজ করি তা হচ্ছে, কলকাতার 'সিপিআই' দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সদ্যপ্রয়াত প্রফেসর শান্তিময় রায়। তিনি ছিলেন 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির' প্রেসিডেন্ট। অফিস ছিল কলেজ স্ট্রিটের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে। সেখানে ছিল 'ভারত-বাংলাদেশ শিক্ষক সহায়ক সমিতির' কার্যালয়ও। আমাদের নেতা জুবিলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান সাহেব। আর পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রফেসর দিলীপ চক্রবর্তী। সেখানে কিছুদিন দায়িত্ব পালনের সময় শান্তিময় দা বললেন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। তার মত হচ্ছে, হিন্দু ছেলেরা যাতে পারতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধে না যায়। কারণ কোনো হিন্দু ছেলে পাকিস্তান বাহিনীর হাতে 'পূর্ব পাকিস্তানে' ধরা পড়লে পাক-টিভিতে বলা হবে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র। টিভিতে ছবি দেখাবে। উল্লেখ্য, ঢাকায় তখন বর্তমান 'রাজউক' (সাবেক ডিআইটি) ভবন থেকে একমাত্র এ টিভি চালু ছিল। এমনিতেই পাকিস্তানিরা বলছে, মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে ভারতীয় হিন্দুদের ষড়যন্ত্র। হিন্দু ছেলেরা ধরা পড়লে তাদের দাবি পাকাপোক্ত হবে। এর চেয়ে বরং জনমত তৈরির জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে কাজ করা

ভীষণ দরকার। এরা শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট-নবদ্বীপ-শান্তিপুর-পূর্বনগর ইত্যাদি স্টেশনভিত্তিক শহরে বসবাস করে। ওইদিকে আছে উত্তরবঙ্গের আলিপুর দুয়ার ও জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চল। এসব জায়গা পূর্ব পাকিস্তানের একাত্তর-পূর্ববর্তী শরণার্থীতে ভরপুর। সংখ্যায় তারা লাখ লাখ। তারা আছে শিয়ালদহ-বনগাঁও লাইনের স্টেশনগুলোয়ও। তারা মনে মনে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী। অনেকে ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সাল– এই সময়ে প্রচুর হিন্দু ওখানে বসতি স্থাপন করে। তাজা তাদের মধ্যে বিস্ময় স্মৃতি। তারা বিশ্বাস করে না মুক্তিযুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। সিপিআই (এম) আমাদের সংগ্রাম সমর্থন করে না। তখন গলাকাটা পার্টি 'নকশালবাড়ি'র উৎপাত প্রচণ্ড। তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম চীনা দৃষ্টিভঙ্গিতে ফেলে যে– চীন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। বয়স্করাও সমর্থন করে না। সবারই কথা– ১৯৪৭ সালে যা হওয়ার কথা ছিল, এবার তা-ই হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের প্রায় সবাই চলে এসেছে। তারা পশ্চিমবঙ্গে আগের শরণার্থীদের মতো থেকে যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মুখে মুখে।

কংগ্রেসের যুবনেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ছিলেন আমাদের জোরদার সমর্থক। তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার স্নেহভাজন ব্যক্তি। এদিকে কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা বিভক্ত। সবাই আমাদের মন দিয়ে সমর্থন করে না। অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে বিরাট এক মনোজাগতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এরই মধ্যে গুঞ্জন– মুক্তিযুদ্ধ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নন। তিনি বিরুদ্ধে কাজ করছেন। অনেক এমপিএ (মেম্বার অব প্রোভিনশিয়াল অ্যাসেম্বলি) গোপনে মোশতাকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। বিশ্বের কোনো দেশই প্রকাশ্যে জোরালো সমর্থন দিচ্ছে না। আরববিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে। সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) সমর্থন দিচ্ছে ঠিকই; কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা তারা চায় কি না, বোঝা যাচ্ছে না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, শোনা যাচ্ছিল, চেষ্টা করছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বোঝাতে। তবে পরিস্থিতি একদম বদলে যায় 'ভারত-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি' হওয়ার পর। আমরা সবাই আশাবাদী হই। সেপ্টেম্বরের পর থেকে বোঝা যাচ্ছিল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং তা ইতিবাচক। এদিকে শরণার্থী হিসেবে আমাদের ধৈর্যচ্যুতিও ঘটছে। হতাশাও আছে। টাকাপয়সার অভাব। পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা। মোটা চালের ভাত। কঙ্করসহ চাল। মোটা মোটা গোল আলু। একবেলা আটার রুটি। আমরা এসবে অভ্যস্ত ছিলাম না। এদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শক্ত বিরোধী পক্ষ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অবাঙালি মুসলিম ও কতিপয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তারা মুখে কিছু বলে না। কিন্তু চায় না পাকিস্তান 'ভাঙুক'। মনে আছে, 'পাক সার্কাস' ময়দানের কাছে আমাদের পক্ষে 'সিপিআই' এক পথসভা করছিল। অবাঙালি অধ্যুষিত এই অঞ্চল। হঠাৎ করে আক্রমণ। তড়িঘড়ি করে মিটিং শেষ করেন উদ্যোক্তারা। আমি হতাশ দর্শক। এমন ঘোরতর দুর্দিনে চারদিকে যখন অনিশ্চয়তা, তখন মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু হিসেবে ভারতের নেতৃত্ব দেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি প্রচলিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে একদল আমলা ঠিক করলেন, যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করবেন। এদের মধ্যে ডিপি ধর, পিএন হাকসার প্রমুখ প্রধান। মাঝেমধ্যে শুনি আশার বাণী। কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার ও যুগান্তরের পাতাভর্তি তখন মুক্তিযুদ্ধের খবরে। জনপ্রিয় জয়বাংলা রেডিওর (স্বাধীন বাংলা বেতার) অনুষ্ঠান ছিল 'চরমপত্র'। পাঠ করতেন প্রয়াত এমআর আখতার মুকুল। আরেক জনপ্রিয় কণ্ঠ ছিল ভারতীয় রেডিও আকাশবাণীর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দুইজনের কণ্ঠ ছিল আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুপ্রেরণা, অন্য অ্যাকটিভিস্টদের জন্য অনুপ্রেরণা। সাংবাদিক-সাহিত্যিক, শিক্ষক-অধ্যাপক থেকে শুরু করে নানা পেশার লোকজন তখন কলকাতায় হাজারে হাজারে। ট্রামে-বাসে চড়লেই তাদের অনেকের সঙ্গে দেখা হতো। 'কন্ডাক্টররা' জোর গলায় বলত 'জয় বাংলা'। এতে আমরা উৎসাহ পেতাম। বাস-ট্রাম আমাদের কাছে ছিল কষ্টকর যানবাহন। বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। ঢাকা ছিল রিকশার শহর। গাড়ি কোথায়? এই অভিজ্ঞতা থেকে কলকাতায় গিয়ে হলো মহাবিপদ। মাত্র ১০ পয়সা ট্রাম ভাড়া, বাস ভাড়া– এটাই দেই। যেতে গেলে কয় পয়সা লাগে; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে– এই পয়সার দাম অনেক বেশি। ১৯৬০-১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা একাত্তর-পূর্ববর্তী শরণার্থীদের কারণে ভীষণভাবে বেড়ে যায়। এর মধ্যে এক কোটিরও বেশি নতুন শরণার্থী হঠাৎ করে ১৯৭১ সালে আশ্রয় নেওয়ায় বাজারে এর প্রভাব পড়ে। অনেকের ধারণা হয়, তাদের কষ্ট বাড়ছে আমাদের জন্য। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও প্রকাশ্যে আমরা জনসমর্থনই পেয়েছি। সাধারণ একটা সহানুভূতি ছিল। সিপিআই বাদে রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্য প্রকাশ্যে আমাদের বিরোধিতা করেনি। এমন উদাহরণও আছে– ১৯৬৪ সালে দাঙ্গায় উৎপীড়িত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী হয়েছে; কিন্তু ১৯৭১ সালে ভিন্নধর্মী শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্কও হয়েছে। এই সম্পর্ক পরবর্তীকালেও অটুট ছিল অনেকদিন। আশা-নিরাশা, দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই কেটে যায় ৭-৮ মাস। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি। আত্মীয়স্বজন সাহায্য করেছেন। সবকিছুর পরও বলতে হয়, ১৯৭১ সালে দুই দেশের বাঙালিদের মধ্যে অভূতপূর্ব এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেন আত্মার আত্মীয়। এই জোরেই শুধু আমিই নই, শরণার্থীরাও সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে বেরিয়েছে বিনা টিকিটে। বনগাঁও থেকে শিয়ালদহ– এই ট্রেন লাইনের দুপাশে বসবাস করে যশোর-খুলনা তথা উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের লোক। শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট, কৃষ্ণনগর– এই ট্রেন লাইনের দুপাশে ময়মনসিংহ-ঢাকার লোক। জলপাইগুড়ি তো ময়মনসিংহের লোকে ভর্তি। সর্বত্র পরিচিত লোকজন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, দেশওয়ালি সর্বত্র। সবার খোঁজ আত্মীয়স্বজনের– তারা কোথায় আছে, কীভাবে আছে। বেঁচে আছে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন সবার। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এসব জায়গা নতুন, সম্পূর্ণ অপরিচিত। বেশির ভাগ লোক অভাব-অনটনে। তাদের কেউ পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের (পার্টিশন) পর। প্রচুর লোক গিয়েছে ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর। বুঝতে চায় না 'পূর্ব পাকিস্তানের' মানুষের মনের পরিবর্তনের কথা। অথচ তাদের সমর্থন দরকার। তাদের বেশির ভাগই 'কমিউনিস্ট পার্টির' সমর্থক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে কংগ্রেস সরকার। এ আরেক টানাপোড়েন। সাম্প্রদায়িক বিভাজনগত জটিল প্রশ্ন তো আছেই। খবর চারদিকে লাখ লাখ শরণার্থী এসেছে ভারতে। তাদের অধিকাংশই হিন্দু এবং পরিবারসমেত। মুসলমান শরণার্থীরা যুবক-যুবতী। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একা দেশত্যাগ করেছে। হিন্দু শরণার্থীদের বেশির ভাগের আশ্রয় শরণার্থীশিবিরে, কারও কারও আত্মীয়র বাড়িতে, যাদের নিজেদেরই চালচুলো নেই। খবর– শরণার্থীশিবিরে শতশত মানুষ মরছে– অনাহারে, রোগে-শোকে। শিশুদের মৃত্যুহার বেশি। অন্তঃসত্ত্বা মা-বোনরা আছেন। চিতা জ্বলছে সারাদিন। এসব দেখা যায় না। এরই মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পরিচিতির কাজ। কঠিন এক দায়িত্ব– সংগ্রামকর্মীদের কাছে। এরই মধ্যে মাঝেমধ্যে আশার আলোও দেখি। ১৯৭১ সালের দুর্গাপূজার সময়ের ঘটনা। কলকাতার অনেক পূজামণ্ডপে একদিকে ছিল বঙ্গবন্ধুর ছবি, আরেকদিকে ইন্দিরা গান্ধীর। বোঝা যাচ্ছিল জনমত ধীরে ধীরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্ত হচ্ছে। আর এটাই ছিল ভরসা। এই ভরসার স্থলটিই আমাদের শক্তি। দেখতে দেখতে এসে গেল ডিসেম্বর। এ মাসের প্রথমদিকে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল জনসভা। মাঠভর্তি লোক। প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। অনেক বন্ধুসহ সেই সভায় আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। সবারই ঔৎসুক্য ইন্দিরা গান্ধী আমাদের বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবেন কি না। বক্তৃতা চলাকালে হঠাৎ ছন্দপতন। ইন্দিরা গান্ধী সভাস্থল ত্যাগ করেছেন বলে গুঞ্জন। কী হলো, কী হলো? এটা বুঝতে দেরি হলো না। রাতের মধ্যেই খবর পাওয়া গেল যুদ্ধের কথা। পাকিস্তান আক্রমণ করেছে ভারত– পশ্চিম সীমান্তে। তারপর তো ইতিহাস।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। আমি সড়কপথে কলকাতা থেকে খুলনা আসি একটি সংগঠনের রিলিফের জিপে। পথে পথে যেমন উল্লাস, তেমনি বীভৎস দৃশ্য। খুলনা থেকে স্টিমারে ঢাকা ফিরে আসি ১১ জানুয়ারি সকালে। এর আগের দিন বঙ্গবন্ধু স্বদেশে বীরের বেশে ফিরে আসেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বক্তৃতা কাছ থেকে শুনেছি। দুঃখ রয়ে গেল ১০ জানুয়ারির বঙ্গবন্ধুর সেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সভাটি দেখতে পারলাম না। ফিরে এসেই খোঁজ শুরু করি– কে কোথায় আছে? সবারই একই প্রশ্ন। কে কে শহিদ হয়েছেন, কে কে আহত অবস্থায় আছেন, কে কে দেশে ছিল, কে কে শরণার্থী হয়েছিল– এসব প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে করুণ কাহিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কাহিনি, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনি। এরই মধ্যে খবর পেলাম, জগন্নাথ কলেজের চাকরি থেকে আমি বরখাস্ত। একটা হাসি দিয়ে পরের দিন কলেজে গিয়ে হাজির। প্রশান্ত ভট্টাচার্য (প্রয়াত) তখন হেডক্লার্ক। তাড়াতাড়ি সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ, কোনো কাগজপত্র ছাড়াই। শুরু হলো নতুন জীবন।

লেখক: কলাম লেখক, স্থায়ী সদস্য, জাতীয় প্রেস ক্লাব

ছবি: সালিমউল্লাহ সেলিম

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ

আকরাম হোসেন খান

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ খুবই কঠিন। এ স্মৃতি যেমন মর্মান্তিক, লোমহর্ষক, তেমনই বেদনায় জর্জরিত। স্বাধীনতা-সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই যার অবদান, ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা মনে পড়ে, তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একজন অনন্য কিংবদন্তি। ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের সমীকরণে তৎকালীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ, মানবাধিকার কেড়ে নেওয়া, বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানার পাকিস্তানি হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তিনি। ইতিহাসের আপসহীন এই লৌহমানব ২৩ বছরের নিরলস-নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে তিলে তিলে জাতিকে সংগঠিত করেছেন। বাঙালির মনে জাগরিত করেছেন স্বাধীনতার অনির্বাণ শিখা।

২৩ বছরের রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের পথ ধরে বাঙালি তথা সারা পাকিস্তানে গণরায়ে বিজয়ী অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত হয়ে গোটা বাঙালি জাতি স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত হন। বঙ্গবন্ধুর এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনবাজি রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন ৩০ লাখ বাঙালি, সম্ভ্রম হারান প্রায় ৫ লাখ মা-বোন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারী লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। নয় মাস যুদ্ধের পর একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করে। বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

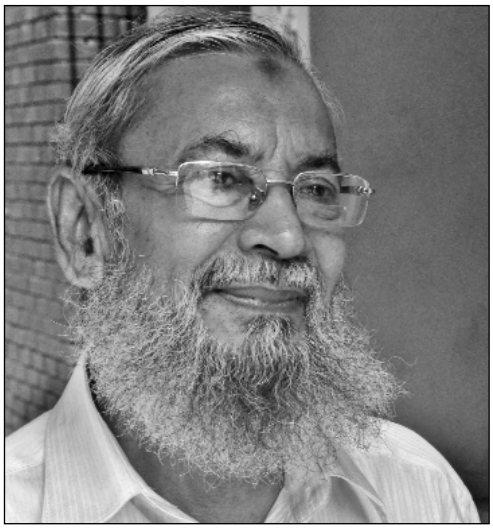
আকরাম হোসেন খান

এবার আমার নিজের এলাকা বগুড়া জেলা এবং শেরপুর থানার মুক্তিযুদ্ধের করুণ স্মৃতির কথায় আসা যাক। আমাদের শেরপুর থানার মধ্যে হিন্দুপ্রধান গ্রাম কল্যাণীতে পাকিস্তানি সেনারা প্রথম হানা দিয়ে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। এর কিছুদিন পরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা আমাদের জয়নাজুয়ান গ্রামের বাড়িতে আগুন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করে চলে যায়। যেহেতু আমি ও আমার ছোটো ভাই মেজর জাফর উল্লাহ খান এবং বড়ো ভাই সাবেক সংসদ সদস্য আমান উল্লাহ খান স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন খ্যাতনামা সংগঠক, সেই কারণে আমাদের গ্রামের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আমরা কেউ তখন বাড়িতে থাকি না। ছোটো ভাই জাফর জুনে ফেরদৌস জামান মুকুলসহ ওর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ভারত চলে যায়। ভারতে যাওয়ার পর প্রথমে জাফরের দল প্রতিরামপুরে প্রাথমিক সামরিক ট্রেনিং নেয়। তারপর দেরাদুনে ৪২ দিন লিডারশিপ ট্রেনিং শেষ করে সেপ্টেম্বরে জয়পুরহাট সীমান্ত দিয়ে বগুড়া প্রবেশ করে। জাফর ধুনট থানার কমান্ডার হিসেবে সেই এলাকায় তার দল নিয়ে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করে। উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালে আমার মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য হিসেবে ছয় মাসের সামরিক ট্রেনিং ছিল। ভারত যাওয়ার আগে আমার এলাকায় আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করছিলাম। এরপর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভারত যাওয়ার আগে একদিন রাতে ধুনট থানার গোবিন্দপুরে যাই। গোবিন্দপুর যে রাতে যাই, সেই রাতেই এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে রাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর ১২টার দিকে কিছু সশস্ত্র রাজাকার ও আলবদর মিলে সেই বাড়িতে হানা দেয়। টের পেয়ে শাহজাহান, রাজ্জাক, মোবারক, আমিসহ বেশ কয়েকজন তড়িঘড়ি বাড়ির পেছন দিয়ে ধানক্ষেত ও আখক্ষেতের মধ্য দিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম উজানশিংয়ের দিকে যেতে থাকি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে। আমরাও পজিশন নিই বেশ কিছুক্ষণ পর, কিছুদূর চলে যাওয়ার পর শাহজাহান উঠে দেখার চেষ্টা করে যে, রাজাকাররা চলে গেছে কি না। সে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে কয়েক রাউন্ড গুলি হলো। শুধু একবার একজনের চিৎকার কানে এলো। নিঝুম রাত আর কিছু বুঝতে পারলাম না। আমরা ক্রলিং করেই চলছি। অবশেষে উজানশিং গ্রামে পৌঁছে মাওলানা শামসুল কারির বাড়িতে উঠলাম। তারা আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু শাহজাহানকে আর রাতে পেলাম না। পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের পর ধানক্ষেতের মধ্যে শাহজাহানের লাশ পাওয়া গেল। সে এক হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য। ওর বাড়ির এবং গ্রামের লোক শোকাভিভূত। এরপর সন্ধ্যার আগে লাশ দাফন করা হলো। কিছুক্ষণ পর আমরা রাতের অন্ধকারে গোবিন্দপুর থেকে রঘুনাথপুরে রওয়ানা হলাম।

রঘুনাথপুর থেকে পরের দিন রাতে বগুড়া-৫ আসনের (শেরপুর-ধুনট) এমসিএ ডা. গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে আমরা ১৫-২০ জনের একটি দল নৌকায় ভারতের মাইনকারচরের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। তখন নৌপথে পাকিস্তান বাহিনীর বোমারু বিমান টহল দিত। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে ভারত যেতে না পারে, সেজন্য তারা নৌকার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে বাধা দিত। আমাদের নৌকা লক্ষ্য করেও বোমারু বিমান তিন দফা হানা দেয়। আমরা তখন জীবন বাঁচানোর জন্য কেউ নদীর পানিতে নেমে যাই আবার কেউ বা নৌকার পাটাতনের (ডেক) নিচে লুকিয়ে থাকি। পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা মাইনকারচরের ট্রানজিট ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর আমাদের ট্রেনিংয়ের জন্য বালুরঘাটে (প. দিনাজপুর) পাঠানো হলো। এখানে খাদেমুলসহ (বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক) বেশ কয়েকজন (আমার জুনিয়র) ছাত্রনেতা মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ করে বিএলএফ'র রিক্রুটের কাজ করছে। আমাকে ও আমার দলকে পেয়ে ওরা খুব খুশি হলো। বালুরঘাট ক্যাম্পে সাবেক এমসিএ আবদুর রহমান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। রহমান ভাই আমাদের দলকে দ্রুত ট্রেনিং দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। আমরা দার্জিলিংয়ের সন্নিকটে পাঙ্গক্যাম্পে চার সপ্তাহের ট্রেনিং শেষ করে আবার নৌপথে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ বগুড়া জেলার ধুনট থানা এলাকায় প্রবেশ করলাম। কিছুদিনের মধ্যে ধুনট থানার বেশির ভাগ এলাকা পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হয়। জাফর উল্লাহ খানের বিএলএফ টিম তখন ধুনটে গেরিলা অপারেশন শুরু করেছে। জাফরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শেরপুর থানার দিকে রওয়ানা হলাম। যুদ্ধকালীন থানা কমান্ডার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল শেরপুর থানা মুক্ত করা। কয়েকদিন পর ১২ ডিসেম্বর সম্পূর্ণভাবে শেরপুর হানাদার বাহিনীমুক্ত হলো। শেরপুরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণকালে দুই পাকিস্তানি সেনা ও একজন রাজাকার যুদ্ধবন্দি হিসেবে আমাদের হাতে বন্দি হয়। বাকি সৈন্যরা বগুড়া হয়ে সৈয়দপুরের দিকে পালিয়ে যায়। এরপর আমি আমার কোম্পানি (মুজিব বাহিনী) নিয়ে শেরপুর থানায় গেলাম। থানা অফিসে (পুলিশ স্টেশন) আমার অফিস করলাম এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য থানা প্রাঙ্গণে ক্যাম্প স্থাপন করলাম। সকাল-সন্ধ্যায় এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত প্যারেড করানোর পর যার যার কাজ (দিন ও রাতের) বণ্টন করে দিতাম। এ সময় আবদুর রাজ্জাক খান, মাহবুব, আবদুল খালেক, নরোত্তম, মুকুল আর আমার বাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

কয়েকদিন পর ইউসুফ ভাই (মির্জাপুর) মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ছোটো দল নিয়ে শেরপুর এলেন। আমি তাকে থানায় থেকে আমার সঙ্গে কাজ করতে বললাম। এদিকে থানায় তখন কোনো পুলিশ ছিল না। থানা ম্যাজিস্ট্রেট, সার্কেল অফিসার কেউ ছিল না। ফলে সিভিল প্রশাসন, থানা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম সবই আমাকে একাই দেখতে হতো। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ বগুড়া-৫ আসনের এমসিএ ডা. গোলাম সারওয়ার এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও পলিটিক্যাল লিডার সিরাজুল ইসলাম সুরুজ শেরপুর থানা পরিদর্শনে এলেন। তারা থানার প্রশাসন, রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবগত হলেন। তারপর ওইদিনই সিরাজুল ইসলাম সুরুজ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে থানা কমান্ডার এবং শেরপুর থানার থানা পলিটিক্যাল লিডার হিসেবে নিয়োগপত্র দিলেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ দিলেন সিভিল প্রশাসন চালু না হওয়া পর্যন্ত বা সরকারের পক্ষ থেকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমি যেন সিভিল প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন থানা ম্যাজিস্ট্রেট গিয়াস উদ্দিন পাঠান, সার্কেল অফিসার ও থানার ওসি মাজেদকে কাজে যোগদান করতে আহ্বান জানালাম। কিন্তু তারা সরকারের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাজে যোগ দিলেন না। ওই সময় শেরপুর ডিগ্রি কলেজ খোলার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে আহ্বান জানালাম। তিনি কলেজের কার্যক্রম শুরু করলেন। তখন প্রতিদিন অনেক রাজাকার, খুনি, অগ্নিসংযোগকারীকে গ্রেফতার করে বগুড়া জেলে চালান দিতে হতো। আমার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারাই এসব কাজ করতেন। সেই সঙ্গে শেরপুর পৌরসভা এবং নয়টি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম চালু করলাম। যুদ্ধকালীন ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে রাজাকার কর্তৃক লুটকৃত মালামাল উদ্ধার করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করতাম।

স্বাধীনতা মানুষের জীবনে পরম পাওয়া। মুক্তিযোদ্ধারা দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। যারা যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, তারা সৌভাগ্যবান। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে। তাহলেই বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও স্থায়ী সদস্য, জাতীয় প্রেস ক্লাব

ছবি: সালিমউল্লাহ সেলিম

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নয় মাস

মৃণাল কৃষ্ণ রায়

১৯৭১ সাল। কলকাতা শহর। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। তখনও এলাকাটি ততটা কর্মচঞ্চল ছিল না। সার্কুলার রোডের মোড়ে একটি পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্ট। চা, তরকা (একটি পাঞ্জাবি রেসিপি) থাকত খাবার। সবসময়ই রেস্টুরেন্টে ভিড় জমে থাকত। সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাদ্যদ্রব্যাদি অত্যন্ত অল্পদামে পাওয়া যেত। ফলে এ দোকানটি ছিল আমাদের (স্বাধীন বাংলা বেতারের মুক্তিযোদ্ধাদের) একটি আকর্ষণ কেন্দ্র।

রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন গলিপথ। কলকাতার বিখ্যাত বিজ্ঞান কলেজের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেই গলির প্রায় শেষ মাথায় একটি ওড়িয়ার (উড়িষ্যার অধিবাসী) ছোট্ট চায়ের দোকান। সেই দোকানের অল্প দূরে একটি দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িটিই হলো স্বাধীন বাংলা বেতারের অফিস (কেন্দ্র)। বাড়িটির অল্প দূরেই মহিষের একটি খাটাল (আমাদের গোয়ালের মতো অনেকটা)। খাটালের মধ্যে মহিষগুলো কাদার মধ্যে নাক ভাসিয়ে ডুবে থাকত। আমরা যদি অবসর পেতাম, তবে অলস দৃষ্টিতে মহিষগুলোকে লক্ষ করতাম। আজ প্রায় সবই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। হয়তো গলির অবস্থান আর সেই রকম নেই। এটাই স্বাভাবিক। তবে স্মৃতির মণিকোঠায় এগুলো অনেকটা জীবন্ত। হয়তো থাকবে যতদিন জীবিত থাকব।

তিন কক্ষের দালান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুরু হওয়ার আগে এই বাড়িতে তাজউদ্দীন আহমদসহ মুজিবনগর সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী অবস্থান করতেন। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীর সংখ্যা বেড়ে গেলে মন্ত্রীগণ অন্যত্র চলে যান। ক্রমেই কেন্দ্রটি সাংবাদিক, শিল্পী, লেখক ও সংগঠক মহান মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের অবস্থান থেকে অবদান রেখে যান। বস্তুত সাংবাদিক, শিল্পী, লেখক এবং সংগঠকদের জন্য এই কেন্দ্রটি হয়ে উঠে একটি পবিত্র স্থান।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আমি চাকরি করতাম পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় বার্তা বিভাগে। তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি।

আজ আমি স্বাধীন বাংলা বেতারের অনেক ঘটনা এবং মূল্যবান তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে এটা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ হলো মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান।

প্রবাসী সরকারের পরিচালনায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে উদ্বোধন করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েব ট্রান্সমিশন। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অপারেশন সার্চলাইট এবং পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু করার পর এক কিলোওয়াট যন্ত্র ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঘটনার প্রচার করে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র। তখন বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। এর সূচনা হয়েছিল ২৬ মার্চ ১৯৭১। এই অংশে ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, মোস্তাফা আনোয়ার, আবদুল্লাহ আল ফারুক, সৈয়দ আবদুস শাকের, আমিনুর রহমান, রাশেদুল হোসেন, শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী এবং হাবিবুর রহমান মনি। এই প্রসঙ্গ আমি দীর্ঘায়িত করব না। তবে এরাই বেতার কেন্দ্রের পূর্বসূরি। তাই এদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

মৃণাল কৃষ্ণ রায়

তারপর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মুজিবনগর অধ্যায়। এই অধ্যায়ের সঙ্গে আমি যুক্ত। তাই আমি গর্বিত-ধন্য। মনে পড়ে সেদিনের অসংখ্য ঘটনা। অনেক ঘটনা স্মৃতিতে নেই। যতটুকু আছে, তা-ই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগদানের একটা কাহিনি আছে। আমরা বিশেষ করে যারা সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসন্ধানে জমায়েত হতাম বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে– এমনই একদিন সেখানে দেখা হলো কামাল লোহানী ভাইয়ের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করছি একটি ঘটনা। যেহেতু আমরা জুনিয়র সাংবাদিক, ভেতরে ঢোকার অনুমতি অনেক দিনই পেতাম না। সঙ্গে কোনো সিনিয়র সাংবাদিক থাকলে তবে অনুমতি পেতাম।

একদিন প্রায় জোর করে ভেতরে ঢুকলাম। ফল হলো খুবই খারাপ। নিরাপত্তাকর্মী আমাকে ধরে ফেলল। তাদের বললাম, সব সাংবাদিকই আমার পরিচিত। নিরাপত্তাকর্মী এটা বিশ্বাস করল না। বললাম নিয়ে চলো সাংবাদিকদের কাছে। আমার বিশ্বাস সাংবাদিকরা আমাকে চিনবে। কারণ আমি নিয়মিত ঢাকা প্রেস ক্লাবে যাতায়াত করতাম। অনেক সিনিয়র সাংবাদিক বসে ছিলেন। প্রথমেই দেখলাম তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে। তার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই প্রেস ক্লাবে দেখা হতো। সে বলল, সে আমাকে চেনে না। নিরাপত্তাকর্মী প্রস্তুত আমাকে আটক করার জন্য। আমার রীতিমতো ঘাম বেরুচ্ছে। তখন তোয়াব ভাই (প্রবীণ সাংবাদিক ও দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক) ছিলেন ঘরের এক অংশে বসা। তিনি এগিয়ে এলেন এবং বললেন, একে আমি চিনি। তিনি আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলেন, বসালেন এবং গল্প শুরু করলেন। সেদিনের ঘটনা আজও স্পষ্ট মনে আছে। হয়তো চিরদিন মনে থাকবে।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। লোহানী ভাই বললেন, স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগদান করেন। ইতঃপূর্বে আমি গাফ্ফার ভাইয়ের 'জয়বাংলা' পত্রিকায় যোগদানের কথা দিয়ে ফেলেছি। তবে লোহানী ভাই আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং আপনজন। ঠিক করলাম স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগদান করব। এই হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদানের ইতিহাস। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বে রইলেন আবদুল মান্নান এমএনএ। প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেলাল মোহাম্মদ ও আশফাকুল রহমান খানকে অনুষ্ঠান, সৈয়দ হাসান ইমাম নাটক এবং কামাল লোহানীকে বার্তা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো। এছাড়া ইংরেজি সংবাদ ছাড়াও অনুষ্ঠান প্রচারের দায়িত্ব পেলেন আলমগীর কবির।

'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটি হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনাসংগীত। চট্টগ্রাম থেকে এটাই সূচনাসংগীত হিসেবে চলে আসছিল। রচনা করেছিলেন গাজী মাজহারুল আনোয়ার। সুর আনোয়ার পারভেজ। উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে। তেলাওয়াত করেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক 'জয়বাংলা' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী। ইসলামের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বলেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা সংবাদ পাঠ করছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম সালেহ আহমদ ছদ্মনামে। ইংরেজি সংবাদ পড়েছিলেন কামাল লোহানী আবু নঈম ছদ্মনামে। সংবাদপাঠক হিসেবে নূরুল ইসলাম সরকার, বাবুল আকতার, আলী রেজা চৌধুরী ছিলেন। ইংরেজি সংবাদপাঠক আবদুল্লাহ আল ফারুক পরে আলমগীর কবির, আলী জাকের, নাসরিন আহমেদ জেরিন আহামদ নামে ও পারভীন হোসেন। একেকটি অধিবেশন গান, জীবন্তিকা, কথিকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে অনেক শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, বাদ্যযন্ত্রী, সাংবাদিক, সংবাদ পাঠক ও পাঠিকা এলেন। এভাবে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটি জমজমাট হয়ে উঠল।

সাংবাদিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমেদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, তোয়াব খান, এমআর আখতার, জালাল উদ্দিন আহমেদ, (আমি) মৃণাল কৃষ্ণ রায়, ম' মামুন প্রমুখ এলেন। কিছুদিন পরে ইংরেজি প্রোগ্রাম চালু হলো। উর্দুতেও প্রোগ্রাম চালু করা হলো। প্রধান হলেন জাহিদ সিদ্দিকী। তার অসাধারণ সুন্দর উর্দু বাচনভঙ্গি সবাইকে অবাক করে দিত। পারভীন হোসেন ইংরেজি নিউজ পড়লেও উর্দুতেও সহযোগিতা করতেন। জাহিদ হোসেন ছিলেন পাকিস্তানের বাবায়ে উর্দু আবদুল হকের সহকর্মী; কিন্তু বাঙালি। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের বাসিন্দা। ফলে বেতার কর্মসূচি বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় নিয়মিত প্রচার শুরু হয়ে গেল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পেল। অবরুদ্ধ বাংলার সব মানুষই গোপনে দরজা-জানালা বন্ধ করে কাঁথা কিংবা লেপের ভেতর ট্রানজিস্টার নিয়ে শব্দ কমিয়ে নিয়মিত শোনতেন। অনুষ্ঠান প্রথমে দুটি অধিবেশনে সকাল ও সন্ধ্যায় প্রচার হতো। পরে তিনটি অধিবেশন চালু করা হয়েছিল– সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা। তিনটি অধিবেশনের অনুষ্ঠানমালা স্পুল টেপে রেকর্ড করে একটি পোর্টফোলিও ব্যাগে করে একজন বিএসএফের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার নিয়ে যেতেন। কোথায় নিয়ে যেতেন, আমরা জানতাম না। পরে শুনেছিলাম ট্রান্সমিশন ভবনটি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি। আমাদের জানানো হয়নি এটি কোথায়। মাঝেমধ্যে ভীষণ সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো আমাদের। একবার সিপিএম (তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল) ৭২ ঘণ্টা টানা বন্ধ (হরতাল) ডাকল। মহাবিপদে পড়লাম। এ সমস্যারও অতিক্রম হলো কামাল লোহানীসহ অন্য শব্দসৈনিকদের মেধার বলে। অনেক সময় বার্তা পরিবেশন নিয়েও সমস্যা হতো। তবে সব সমস্যাকে অতিক্রম করা হতো সবার মিলিত প্রচেষ্টায়।

এখানে আমাকে উল্লেখ করতে হবেই যে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিটি অনুষ্ঠানই অত্যন্ত প্রিয় ছিল শ্রোতাদের কাছে। সংবাদসহ চরমপত্র, বজ্রকণ্ঠ, জল্লাদের দরবার অত্যন্ত প্রিয় ছিল শ্রোতাদের কাছে। পরিবার-পরিজন, মা-বাবাকে রেখে এসে অনেকেই বিমর্ষ থাকত। স্মৃতি থেকে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। তবে কিছু ঘটনা স্মৃতি থেকে কখনো হারিয়ে যাবে না। প্রসঙ্গে ফেরা যাক, সম্ভবত ১৯৭১ এর জুলাই। প্রচণ্ড গরম।

বেতার অফিসে কাজ করছি। চেয়ার-টেবিল বলতে তেমন কিছু নেই। এমন সময় কেউ আমার কাছে একটি 'নিউজ' অথবা প্রেস রিলিজ এগিয়ে দিল। প্রেস রিলেজটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিউজ ছিল এইরূপ: ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (বর্তমানে গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা) মুজিবনগরে এসেছেন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। কারণ জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমার বাল্যবন্ধু। নিউজটা তৈরি করলাম প্রচারের জন্য। এছাড়া একটা খবর প্রচারিত হয়েছিল যে, লন্ডনে এক সমাবেশে ডা. জাফরুল্লাহ নিজের পাকিস্তানি পাসপোর্টটি নষ্ট করে ফেলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল লন্ডন শহরে এক সমাবেশে। খবরটি বেশ প্রচারিত হয়েছিল। ফলে তার সম্পর্কে আমার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। তাই তার সঙ্গে কোথায় দেখা করা যায় ভাবছিলাম। এমনই একদিন হঠাৎ দেখলাম আমার পেছনে এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। কাজ বাদ

দিয়ে কুশল বিনিময় করলাম। দেখলাম অনেকেই জাফরুল্লাহকে চেনে। কারণ ঢাকা মেডিকেলের একজন তুখোড় ছাত্রনেতা ছিলেন জাফরুল্লাহ। তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল। তাই সে নাম পালটিয়ে লন্ডন চলে যান। লন্ডন এসে এফআরসিএস ডিগ্রি লাভের জন্য ভর্তি হয়। যথারীতি এখানেও ভালো রেজাল্ট করতে থাকেন। ফাইনাল পরীক্ষার কিছুদিন মাত্র বাকি, তখন পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচার শুরু হয়েছে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। অসহায় বাঙালিদের হত্যা করছে নির্মমভাবে। তবে বাঙালিরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। কিন্তু উন্নত অস্ত্রের কাছে কতক্ষণ টিকে থাকা যায়। শুধু হত্যা নয়, ধর্ষণ চলছে হাজার হাজার। অসহায়রা আর্তনাদ করছে।

জাফরুল্লাহ সম্পর্কে উৎসাহ বেড়েছে এই কারণে যে– মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি হাসপাতালের প্রয়োজন। জাফরুল্লাহ এসেই এগিয়ে চলল। আগরতলার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশ্রামগড়ে প্রতিষ্ঠা করলেন হাসপাতাল। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। সে অন্য প্রসঙ্গ। জাফরুল্লাহর সঙ্গে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমি জড়িয়ে পড়লাম। তবে তা স্বাধীন বাংলা বেতারের কাজের পর।

এই পর্যায়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান এমএজি ওসমানীর থিয়েটার রোডের অফিসে আমার যাতায়াত শুরু হয়। অবশ্য ডা. জাফরুল্লাহর সঙ্গে এমনই একদিনের ঘটনা। বেতার অফিসের কাজ শেষ করে এলাম জাফরুল্লাহর সঙ্গে। বেলা তখন ৫টার অধিক। এমন সময় জেনারেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য এলেন অত্যন্ত সাধারণ একজন ভদ্রলোক। তিনি বললেন, তিনি রাজশাহী থেকে এসেছেন। তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করবেন। জেনারেলের তখন বিশ্রামের সময়। তিনি ডেপুটি সেনাপ্রধান এ কে খন্দকারকে দায়িত্ব দিলেন ঘটনার সত্যতা বিচার করে দেখার জন্য। এ কে খন্দকার সেই ব্যক্তিকে নিয়ে একটি বেঞ্চে বসে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন, যা আমরা শুনতে এবং জানতে পারিনি।

নামাজের সময় এলে প্রায় সবাই নামাজে চলে গেল। অফিস একদম ফাঁকা। রাজশাহীর লোকটি 'ওয়াশরুমে' প্রবেশ করল। একই সঙ্গে কয়েকটি 'ওয়াশরুম' টিনের ঘর। আমি লক্ষ করলাম বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল তবু লোকটি ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে না। কী করা যায়? আমাদের এখনই বের হয়ে যেতে হবে, একটি জরুরি কাজ আছে বাইরে। একজন কর্মচারীকে দেখতে পেয়ে তাকে ঘটনাটি বললাম। সে বলল, এটা কোনো ব্যাপার নয়। কর্মচারী ব্যক্তি 'ওয়াশরুমের' কাছে গিয়ে বাইরে থেকে শিকল টেনে দিল এবং বলল, এখন লোকটিকে বের হতে হলে কারও সাহায্য নিতে হবে। আমরা বের হয়ে আসি। তারপর কী ঘটল আমার জানা নেই অথবা জানার চেষ্টাও করিনি। অনেকটা সময় চলে গেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তবে কিছু কিছু ঘটনা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তারিখ মনে নেই। সময়টা অস্পষ্ট মনে আছে। ঘটনার দিন দুপুর ২টার আগে কোনো সময়। জাফরুল্লাহ তখন লন্ডনে। সেখান থেকে একটা বার্তা চিঠির মাধ্যমে পাঠাল আমার কাছে। বলল, এটা জেনারেল সাহেবকে পৌঁছে দিবি। অত্যন্ত জরুরি। জেনারেল সাহেবকে বলা আছে। তুই যাবি।

নির্দিষ্ট দিনে গেলাম জেনারেল ওসমানী সাহেবের অফিসে। জেনারেল সাহেবের রুমের পাশেই ছিল একটি ছোটো 'রুম'। সেখানে বসতেন 'এডিসি' বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ কামাল। অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্র এক তরুণ। আমাকে বসতে বললেন। কারণ জেনারেল ওসমানী সাহেবের রুমে আছেন একজন ভারতীয় শিখ জেনারেল। তারা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত।

অনেকক্ষণ আলাপ হলো বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ কামালের সঙ্গে। অত্যন্ত প্রাণবন্ত এই তরুণ বললেন, দাদা চিন্তা করবেন না, খুব তাড়াতাড়ি দেশ স্বাধীন হবে। আমরা সবাই দেশে ফিরে যাব। নতুন দেশ গড়ব। পাকিস্তানিদের পরাজিত করব। বাংলার মাটি থেকে মুছে দেব তাদের নাম-নিশানা। তবে কথার ফাঁকে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন পিতা-মাতা, ভাইবোন এবং পরিবার-পরিজনের কথা ভেবে।

ভারতীয় জেনারেল চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে আমার ডাক পড়ল জেনারেল ওসমানীর ঘরে। আমার জন্য অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দেখলাম চকচকে পিতলের নবে হাত দিয়ে জেনারেল দরজা খুলে আমাকে 'স্বাগতম' জানালেন। আমি সালাম দিলাম। তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলাম। তারপর তিনি বসলেন।

ডা. জাফরুল্লাহর প্রেরিত খামটি খুলে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়লেন। তারপর 'আরদালিকে' চা দিতে বললেন। চা দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করেন 'চা অথবা কফি' পান করবে? দ্বিতীয় বিস্ময় হলো, চা নিয়ে 'আরদালি' এসে স্বাভাবিকভাবে চায়ের পেয়ালা প্রথমে জেনারেলকে দিলেন, পরে আমাকে। আবার বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড ধমক দিলেন 'অরদালিকে' এবং তিনি নিজে তাঁর কাপটি আমাকে দিলেন এবং আমার কাপটি তিনি নিলেন। আমি অভিভূত। জেগে আছি না ঘুমুচ্ছি। মেসেজটি মনে হলো দুইবার পড়লেন। তারপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হলো অনেকক্ষণ। এবার বিদায়ের পালা। আবার একই অবস্থা, জেনারেল দরজা খুলে নব ধরে দাঁড়িয়ে। বেরিয়ে এলাম, দরজা বন্ধ হলো। অপার বিস্ময় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমি সত্যিই অভিভূত।

অনেকক্ষণ আলাপ হলো বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ কামালের সঙ্গে। অত্যন্ত প্রাণবন্ত এই তরুণ বললেন, দাদা চিন্তা করবেন না, খুব তাড়াতাড়ি দেশ স্বাধীন হবে। আমরা সবাই দেশে ফিরে যাব। নতুন দেশ গড়ব

ডিসেম্বরের শুরু থেকেই পরিপূর্ণ বিজয়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল আকাশে-বাতাসে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় এলেন। গড়ের মাঠে ভাষণ দিতে এসে জানতে পারলেন পাকিস্তানি জঙ্গিবিমান ভারতের অমৃতসরসহ বেশ কয়েকটি শহরে বোমা হামলা করেছে। ভাষণ সংক্ষিপ্ত করেই তিনি দিল্লি রওয়ানা হন। দিল্লিতে জরুরি মিটিং বসে। যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের প্রায় সব জায়গায় প্রচণ্ড যুদ্ধ। পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় বরণ করতে থাকে একের পর এক।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সীমান্তের প্রায় সবদিক দিয়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সৈন্যদের সহায়তায় পাকিস্তান বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আর এই স্বীকৃতির পরেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে গঠিত মিত্রবাহিনী পূর্ব রণাঙ্গনে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে।

ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনেও পাকিস্তানের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। পাকিস্তানের দুই অংশেই বেগতিক অবস্থা দেখে আমেরিকা পাকিস্তানের সমর্থনে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে। এদিকে চীনও পাকিস্তানকে সাহায্য করার বিষয়ে সম্মতি দেয়। কিন্তু চীন কার্যত কিছুই করেনি। আমেরিকা ও চীনের হুংকার ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানকে ভারতের দখল হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা এবং পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের সরে আসার সুযোগ করে দেওয়া। ইতোমধ্যে চীন-আমেরিকার সমর্থন পাওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী বেশ কিছু সময় পেয়ে যায়। এই সুযোগে রাজাকাররাও রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার, অধ্যাপকসহ বাঙালি কৃতীসন্তানদের। এ হত্যাকাণ্ডে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য বেদনাদায়ক ঘটনা হলো এই বুদ্ধিজীবী হত্যা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন নিজেদের পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়, তখনই রাজাকার, আলবদর,

আলশামসদের দিয়ে এদেশের পেশাজীবী কৃতীসন্তানদের হত্যা করে। এ দেশের মানুষ যাতে স্বাধীনতা লাভ করেও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, দেশ চালাতে না পারে– এই জঘন্য মনোবৃত্তি থেকে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, সন্তোষ ভট্টাচার্য, আবুল কালাম আজাদ, ডা. সিরাজুল হক, সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার, সিরাজুদ্দীন হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নিজামুদ্দীন, ডা. ফজলে রাব্বি, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. মুর্তুজা, গায়ক-সুরকার আলতাফ মাহমুদ প্রমুখসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, ডাক্তারদের এ সময় হত্যা করা হয়। পৃথিবীর গণহত্যার ইতিহাসে এ ধরনের নারকীয় ঘটনা বিরল। ১৪ ডিসেম্বর তাই আমাদের বিজয় উল্লাসের মাঝে বেদনার অশ্রু ঝরায়।

যুদ্ধের সময় একের পর এক বিভিন্ন সেক্টরে পরাজিত হতে লাগল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। চূড়ান্ত বিজয় এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। দুর্ধর্ষ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলার কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার সমন্বয়ের গঠিত মুক্তিবাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ করতে লাগল। পরাজয় আসন্ন বুঝতে পারছিল নরখাদকরা। একই সঙ্গে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হানতে লাগল দখলদার বাহিনীর ওপর। মিত্রবাহিনীর কাছে কোণঠাসা ইয়াহিয়া বাহিনী। মিত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হলো হানাদারদের। লিফলেট ফেলা হলো হেলিকপ্টারের মাধ্যমে। বলা হলো, 'হাতিয়ার ডাল দো' অর্থাৎ অস্ত্র সমর্পণ করো। এটা একটা চরম মুহূর্ত। ইংরেজিতে যে আত্মসমর্পণের ডাক মিত্রবাহিনী দিয়েছিল, এর বাংলা উর্দু অনুবাদ করতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে বলা হলো। অনুবাদটি সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে করে দেয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বাংলা-উর্দু-ইংরেজি লিফলেটগুলো অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ভেতরে ছড়ানো হয়েছিল। একই সঙ্গে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি অনুবাদটি প্রচার হতে লাগল বিভিন্ন রেডিও চ্যানেলে।

যুদ্ধ শেষ। দেশ পরিপূর্ণ মুক্ত। এখন পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ মিত্রবাহিনীর কাছে (রেসকোর্স ময়দানে)। ১৬ ডিসেম্বর। বেলা ৪টা ২১ মিনিট। নয় মাসের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু স্থানীয় বেইমান বিশ্বাসঘাতক মৌলবাদী অপশক্তি, তাদের নেতাসহ অনেকেই বাঁচার জন্য ঠিকানা খুঁজে নিয়েছিল পাকিস্তানিদের সামরিক আশ্রয়ে। আর বহুসংখ্যক লুটেরা, লুণ্ঠনকারী মানবতাবিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত ছিল যারা, তারা আত্মগোপনে চলে গেল।

১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর হেডকোয়ার্টার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে নির্দেশ এলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে মার্শাল সংগীত বাজিয়ে জোরালো স্লোগান দেওয়ার জন্য। আমরা যথাযথভাবে নির্দেশ পালন করলাম।

একই সঙ্গে বার্তা বিভাগের প্রধান হিসেবে কামাল লোহানী ভাই বিশেষ ঐতিহাসিক সংবাদ বুলেটিন রচনা করলেন। সহযোদ্ধা বেলাল মোহাম্মদ, আশফাকুল রহমান খান, প্রকৌশলী আবদুস সাকের, আমিনুর রহমান ও শরফুজ্জামানসহ আমরা সবাই লোহানী ভাইয়ের অসামান্য দক্ষতা লক্ষ করলাম। বুলেটিনে দেশপ্রেমের আবেগ, বিজয়ের আনন্দ এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠল। এ অনুভূতি অল্প জায়গায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দেড় মিনিটের সংবাদটি পাঠ করতে গিয়ে বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন তিনি। সে আবেগ, অনুভূতি আনা সম্ভব হচ্ছিল না। তারপর আবার কামাল লোহানী ভাই। মাঠে-ময়দানের পাকা কণ্ঠস্বর। আবার জ্বলে উঠল। সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে রেকর্ড হলো। সবাই শুনলাম। সবাই একত্রে চিৎকার করে উঠলাম চমৎকার হয়েছে বলে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের আনন্দ আমরা অনুভব করলাম স্টুডিওর ক্ষুদ্র কক্ষে।

একই সঙ্গে একটি অনন্যসাধারণ গান রচিত হয়েছিল। লেখা, সুরারোপ ও পরিবেশনার গুণে এই গানটিও ইতিহাস হয়ে গেছে। বিজয়ের সংবাদ বুলেটিন স্বাধীন বাংলা বেতারে ধ্বনিত হওয়ার পরপরই বেজে উঠছিল গানটি।

গানটির শিল্পী অজিত রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ, কথা শহীদুল ইসলাম, সুর সুজেয় শ্যাম। গানটি হলো–

বিজয় নিশান উড়ছে ঐ
খুশির হাওয়ায় ঐ উড়ছে
বাংলার ঘরে ঘরে
মুক্তির আলো ঐ ঝরছে॥

আজ জীবনের জয় উল্লাসে
জমছে শিশির দূর্বাঘাসে
পাশে নেই আমাদের মহান নেতা
হাসির মাঝে আজ জাগে ব্যথা
সাত কোটি প্রাণ দিকে দিকে ঐ
দীপ্ত মশাল জ্বেলে চলেছে॥

অন্ধ কারার আঁধার থেকে
ছিনিয়ে আনবো বঙ্গবন্ধুকে
উজ্জ্বল বন্যার কলগ্রাসে
শত্রুরা নিশ্চল হয়েছে
সাত কোটি প্রাণ দিকে দিকে ঐ
বন্ধ কারার দ্বার খুলছে॥

> এবার ঘরে ফেরার পালা। সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় মিলিত হয়েছিলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। আমাদের সবার চোখে-মুখে বিজয়ের অপূর্ব আলো

পাকিস্তান সেনা এবং তার দোসরদের পতন ঘটছে। ১৬ ডিসেম্বর। আনন্দের দিন। উৎসবের দিন। এবার ঘরে ফেরার পালা। সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় মিলিত হয়েছিলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। আমাদের সবার চোখে-মুখে বিজয়ের অপূর্ব আলো। পরস্পরে জড়িয়ে ধরছি আমরা। সেই আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

যে ছেলেটি কেন্দ্রের কোনায় বসে অশ্রুপাত করত স্বজনদের জন্য, তাদের ফেলে এসেছিল অবরুদ্ধ বাংলাদেশে, তার নাম মনে নেই। তার চোখে-মুখেও বিজয়ের অপূর্ব আলো, উচ্ছ্বাস।

আজ মুক্তিযুদ্ধের পথ অতিক্রম করে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। কিন্তু ওই মুখগুলো হারিয়ে গেছে। স্মৃতিতে উজ্জ্বল, বাস্তবে নেই। কেউ হয়তো পৃথিবীতে নেই, কেউ হয়তো জীবনসংগ্রামে লিপ্ত অথবা কেউ হয়তো খ্যাতির উচ্চশিখরে অবস্থান করছে। এমনটাই ঘটে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম।

বালিগঞ্জের সার্কুলার রোডের সেই দালানটি হয়তো আর নেই। পাঞ্জাবি হোটেল, ওড়িয়ার চায়ের দোকান এবং গড়িহাটার মাসির হোটেলটা হয়তো আর নেই। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সেইসব মুহূর্ত এবং ঘটনা।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সহযোদ্ধা

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

একদিনের রোজনামচা

আতিয়ার রহমান আতিক

আষাঢ় মাস। ১৯৭১। সকালের আকাশ রক্তিম আভায় লালবর্ণ ধারণ করতে শুরু করেছে। পাশ থেকে গ্রুপ লিডার সরোয়ার হোসেন মোল্লা, স্বাধীন বাংলাদেশে যিনি হয়েছিলেন রক্ষী বাহিনীর ডেপুটি লিডার এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রতিনিধি ও সর্বশেষ সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন, বলে উঠলেন withdraw & back. আমার অস্ত্র এলএমজি (Light Machine Gun) তুলতে গিয়ে লতায় এলএমজি'র পা দুটো আটকে গেছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না। সহযোদ্ধারা সবাই দৌড়ে পেছনদিকে ছুটছে। সরোয়ার ভাইয়ের নজর পড়ল, দৌড়ে এসে তার কাছে রক্ষিত ছুরি দিয়ে দ্রুত লতা ছাড়িয়ে এলএমজি মুক্ত করলো। কাঁধে তুলে ছুটতে শুরু করলাম পেছনদিকে এবং পরিষ্কার শুনতে পেলাম মিলিটারি কনভয়ের শব্দ, যা ধেয়ে আসছে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের বরিশাল প্রান্ত থেকে। আগে থেকেই রেকি করে নিশ্চিত হয়েছিলাম প্রতিদিন সূর্য ওঠার পূর্বমুহূর্তে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর থানাধীন আমগ্রাম ব্রিজে পাহারারত পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও স্থানীয় রাজাকাররা প্রাতঃকালীন কুচকাওয়াজ করে। এ তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের ২২ জনের বিএলএফ বাহিনী, যা পরবর্তীকালে মুজিব বাহিনী নামে অধিক পরিচিত, যাদেরকে ভারতের টাঙুয়ায় এবং হাফলংয়ে এক মাসের অস্ত্র পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়– পরিকল্পনা গ্রহণ করি। দুটি বাচারি (ছাউনিবিহীন লম্বা নৌকা, যার ধারণক্ষমতা ২০-২৫ জন যাত্রী) নৌকাযোগে ফজরের আজানের আগে ব্রিজ সংলগ্ন হালকা জঙ্গলে অবস্থান নিয়ে যখনই ওরা কুচকাওয়াজে নামবে ঠিক তখনই আক্রমণ শুরু করা হবে এলএমজির ব্রাশফায়ার দিয়ে। আর অন্যরা যতদূর সম্ভব অগ্রভাগে গিয়ে শত্রুদের লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাবে এবং ওদের অস্ত্র ও গোলাগুলি সংগ্রহ করে ফিরে আসবে।

পরিকল্পনামতো রাতের আঁধার দূর হয়ে আলো ফোটার আগেই যথাস্থানে পৌঁছে দেখলাম ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন। ব্রিজ সংলগ্ন সড়ক থেকে ৪০-৫০ গজ দূরে যে জঙ্গলে আমাদের অবস্থান নেওয়ার কথা, সেখানে বেশকিছু পুরোনো কবর, যা আমাদের ট্রেঞ্চের কাজ করছে। কবরের ভেতর দাঁড়িয়ে খুব ভালোভাবেই এলএমজির পা দুটো কবরের কার্নিশে রাখতে পেরেছি।

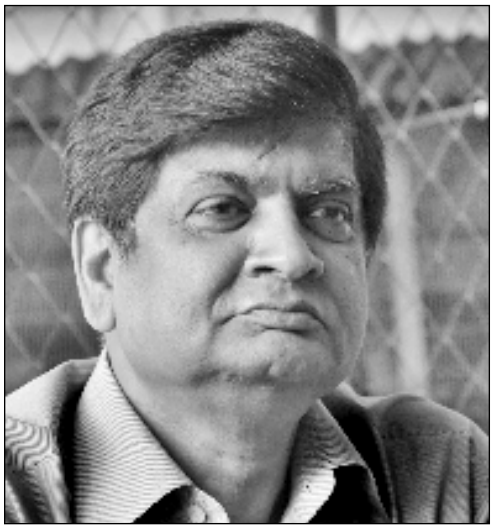
আতিয়ার রহমান আতিক

অন্যরা রাইফেল, এসএমজি বা আরসিএল'র মাথা রাখার সুব্যবস্থা পেয়েছে। আমাদের কিন্তু একবারের জন্যও মনে হয়নি জঙ্গলে সাপ-বিচ্ছু বা বিষধর কিছু থাকতে পারে। তখন শুধুই শত্রু নিধনের উত্তেজনায় উদ্বেলিত আমরা সবাই। শত্রুপক্ষের কেউ কেউ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আমাদের অস্ত্রের নলের মাথায় ৪-৫ গজ দূরে বসে প্রাতঃকালীন কর্ম সম্পাদনে লেগে গেল। ট্রিগারের উপর আঙুল নিশপিশ করছিল। কিন্তু ধৈর্য ধরতে হলো। ১২ জনকে নিয়ে গঠিত পাহারারত দলটি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুত। লিডারের সংকেত পাওয়া মাত্র গর্জে উঠল আমার মেশিনগান। জয় বাংলা বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সহযোদ্ধারা। সাঁই সাঁই গুলি ছুটছে। ঝাঁজরা করে দিল টহলদারদের কয়েকজনকে। ওরা ছিল তখন অস্ত্রবিহীন। ব্রিজে অবস্থিত অস্থায়ী ক্যাম্পে অস্ত্র রেখে খালি হাতে কুচকাওয়াজ সেরে ঘুমোতে যাওয়ার কথা প্রতিদিনকার মতো। আচমকা আঘাতে দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগল এদিক-সেদিক প্রাণটা হাতে নিয়ে। সহযোদ্ধাদের গুলিতে বা বেয়নেটের আঘাতে প্রাণ দিতে হলো বেশ কয়েকজনকে। সহযোদ্ধাদের একাংশ ক্যাম্পে রক্ষিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহে ব্যস্ত। লিডারের চিৎকার withdraw and back.

ওখান থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দক্ষিণে আমাদের নৌকা রাখা। সবাই সেদিকে ছুটছি। সাঁই সাঁই গুলি আসছে সড়ক থেকে অর্থাৎ সেই শব্দশোনা কনভয় থেকে। দ্রুত নৌকায় উঠে সবাই মিলে বৈঠা বাঁ হাত দিয়ে বেয়ে চললাম আমাদের ক্যাম্পের দিকে।

আমাদের ক্যাম্প প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার, গয়লাবাড়ি, যে বাড়ির কর্তাব্যক্তি হরিদাশ গয়লা তাদের চারটি টিনের ঘরের একটি আমাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। ক্যাম্পে পৌঁছে প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও লেগে গেলাম আমাদের এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্র পরিষ্কারে। সেই সঙ্গে পালা করে আমাদের জন্য প্রস্তুতকৃত চালডালের পাতলা খিচুড়ি খেতে। ঘণ্টাখানেক পর আবার গুলির শব্দ, তা-ও আমাদের দিকে। তড়িঘড়ি করে নেতার নির্দেশে ব্যস্ত হয়ে গেলাম অস্ত্র প্রস্তুত করে প্রত্যুত্তর দিতে, সেই সঙ্গে নৌকা করে আরও দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করতে (Hit and run পদ্ধতি অনুসরণ করে)। এখানে বলে রখি, সে বছর দেশে প্রচুর বন্যা হয়েছিল বিধায় মাঠঘাট সব অথৈ জলে নিমগ্ন– শুধু বাড়িগুলো দ্বীপের মতো ভাসমান।

বাড়ির সব লোকজনকে নৌকায় তুলে আমি আর সরোয়ার ভাই সবার শেষে ছোট্ট একটি নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। বৃষ্টির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছিল উত্তরদিক থেকে। উপায়ন্তর না দেখে নৌকার দুমাথায় দুজন শুয়ে পড়ে হাত দিয়ে নৌকা বেয়ে চললাম আর মাঝে মাঝে দু-একটা গুলি ছুড়ে জানান দিতে থাকলাম আমরা আছি। মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, যে কোনো একটির আঘাতে হতে পারত আমাদের সলিল সমাধি। কিন্তু মহানুভবতার কৃপায় ঘণ্টাখানেক এভাবে চলার পর গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার কোনো ছোট্ট বাজারে পৌঁছলাম। বাজারের নামটি মনে নেই, তবে মনে আছে সেখানকার লোকদের সেবা, সহযোগিতা ও আতিথেয়তার কথা।

পরে জানতে পেরেছিলাম ওইদিন শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা ছিল আমাদের ক্যাম্প আক্রমণের। কিন্তু পূর্বাহ্নে আমাদের আক্রমণে ওদের পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। থিতিয়ে যায় সড়কে পড়ে থাকা লাশ দেখে।

সেদিন আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম দুটি কারণে। প্রথমত, ওরা আমাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিল ব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল হয়ে আর আমরা পিছিয়েছিলাম বন্যায় ডুবে যাওয়া মাঠঘাট দিয়ে। তাই ওরা আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল বলে আমরাও ছিলাম সশস্ত্র ও দীপ্যমান। ওদের ফিরে যেতে হয়েছিল খালি হাতে সতীর্থদের ৮টি লাশ বয়ে।

আজও মনে পড়ে গয়লাবাড়ির সেদিনকার মানুষগুলোকে। তাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও অবদানকে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, স্থায়ী সদস্য, জাতীয় প্রেস ক্লাব

ছবি: সালিমউল্লাহ সেলিম

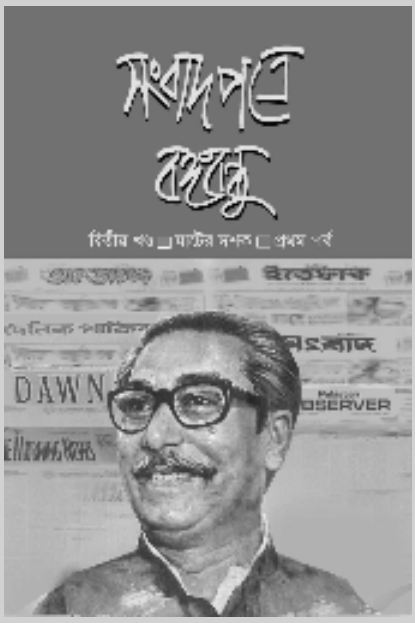

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধঃ দেরাদুনের টুকরো স্মৃতি

আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া

যে কোনো জাতির ইতিহাস চলমান 'রিলে রেস'-এর মতো। জাতির ইতিহাসকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য একেক প্রজন্মকে একেকটি 'কাঠি' নির্দিষ্ট গন্তব্যে বহন করে নিয়ে যেতে হয়। আমরা বাঙালি জাতির হিরণ্ময় প্রজন্ম। জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সোনার কাঠিটি বহন করার দায়িত্ব আমাদের কাঁধে বর্তিয়েছিল। এই কাঠিটি ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক পরিণতির দিকে সফলভাবে পৌঁছে দিয়ে দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। আমরা সেই মহান দায়িত্ব সফলভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে জাতিকে পৃথিবীর ইতিহাসে বীরের জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সমাপ্ত করে হাতের সোনার কাঠিটি নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছি। এবার এই কাঠিটি তারাই বহন করবে। তারাই তাদের লক্ষ্য স্থির করবে। স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনা-প্রেরণা ও প্রতিশ্রুতি কীভাবে বাস্তবায়ন হবে, কেমন বাংলাদেশ তার পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দেবে, তা বর্তমান প্রজন্মই নির্ধারণ করবে। আমরা কেবল গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা, আমরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছি। এটাই আমাদের অহংকার। এটাই আমাদের গর্ব। এটাই আমাদের গৌরবগাথা।

আমাদের মুক্তিসংগ্রাম বিশাল ক্যানভাসজুড়ে প্রতিষ্ঠিত। একদিন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আমরা গড়ে তুলেছিলাম স্বাধিকার আন্দোলন। এই আন্দোলনের রূপকার ছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারপর ক্রমান্বয়ে আমরা স্বাধিকার আন্দোলন থেকে অবশ্যম্ভাবী এক স্বাধীনতাযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়েছি। অতঃপর একাত্তরের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন অযুত নিযুত লক্ষ জনতার সামনে ঘোষণা দিয়েছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', তখন থেকেই বীর বাঙালি অস্ত্র হাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়। অনেক বন্ধুর পথ, অনেক শ্বাপদসংকুল হিংস্র

প্রতিকূলতা আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে স্বাধীনতার মন্দির মঞ্জিলে পৌঁছতে। সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মাত্র নয় মাসে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে খচিত করেছি একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র ও একটি নতুন জাতীয় সংগীত।

ভারতের দেরাদুনস্থ টাঙুয়া মিলিটারি একাডেমিতে পূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পৃথিবীর সব সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ব্রিটেনের 'স্যান্ডহার্স্ট'-এর পরেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি একাডেমি হলো টাঙুয়া সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আমরা সৌভাগ্যবান পৃথিবীর অন্যতম এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা আগরতলা থেকে সোভিয়েত কার্গো প্লেনে চড়ে এই একাডেমিতে পৌঁছার পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জীবন ভিন্নমাত্রায় প্রবাহিত হয়েছে। আমরা যারা এখানে ট্রেনিং নিয়েছি, তারা ছিলেন বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) সদস্য। তবে সারা দেশ ও বিশ্বে বিএলএফের যোদ্ধারা মুজিব বাহিনী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাধারণত রাজনীতি-সচেতন কর্মীদেরই এখানে প্রশিক্ষণ দিতে আনা হতো, যাতে দেশে ফিরে গিয়ে তারাই স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিতে পারেন। আজও জনমনে এই মুজিব বাহিনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। আমি এই একাডেমির ১৪তম ব্যাচের সদস্য ছিলাম। দেরাদুনের স্মৃতি নিয়ে, বিশেষ করে এর তাত্ত্বিক বিষয় বিশ্লেষণ করে আমার একটি বই বর্তমানে প্রকাশের অপেক্ষায়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে 'নিরীক্ষা'র পাঠকদের জন্য টাঙুয়া মিলিটারি একাডেমির কয়েকটি টুকরো স্মৃতি তুলে ধরতে চাই। এই লেখায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দিলেও আমাদের টাঙুয়া ক্যাম্প-জীবনের একটি চমকপ্রদ ও স্পর্শকাতর চিত্র পাঠকহৃদয়ে সারা জাগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

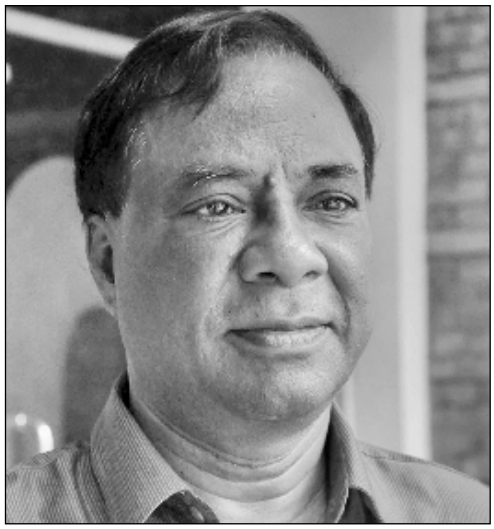

আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া

তবুও মাথা নোয়াবার নয়

সকাল ৬টার সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল বেজে উঠত। ওস্তাদ রূপ সিংয়ের হৃদয়-কাঁপানো বাঁশির শব্দে গোটা ব্যারাকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যেত। সবাই এসে জমায়েত হতেন মুজিব হলের সামনে প্রশস্ত প্রান্তরে। এখানেই দিনভর কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ চলত। এই একাডেমিতে প্রতিদিন ট্রেনিং শুরু হতো অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে। এখানে আমাদের প্রিয় জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গেয়ে সবুজের মধ্যে রক্তলাল গোলক ও সোনালি রঙের 'বাংলাদেশ'-এর মানচিত্র আঁকা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হতো দৈনন্দিন কার্যক্রম। আর বঙ্গবন্ধুর সম্মানে এই প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন বিল্ডিংটির নামকরণ করা হয়েছিল 'মুজিব হল'।

একাডেমির বাঘা বাঘা সামরিক কর্মকর্তা ছাড়াও এই ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং সেশনে উপস্থিত থাকতেন আমাদের দেশীয় প্রশিক্ষকরা। যারা প্রথমে এসে এখানে সামরিক ট্রেনিং নিয়েছেন, সেসব নেতৃস্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্তদের 'ট্রেইনার' হিসেবে একাডেমিতে রেখে দেওয়া হতো ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক, আবদুর রহমান, মাসুদ আহমেদ রুমি, বিডি মুখার্জি প্রমুখ।

টাঙুয়া মিলিটারি একাডেমি পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে টাঙুয়ার উচ্চতা সাড়ে সাত হাজার ফুট। এখানকার প্রকৃতি মাঝেমধ্যেই রুদ্ররোষে ফুলেফেঁপে উঠত। দূর পাহাড়ের গায়ে জমে থাকত শ্বেত-শুভ্র বরফের স্তর। এখানে অবস্থানকালে মাত্র একদিনই আমরা প্রকৃতির ভয়াবহ তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করেছি। ভোর থেকেই দমকা হাওয়া আর ভারি থেকে মাঝারি আকারের বৃষ্টি, প্রচুর ঠাণ্ডায় সবাই কাঁপছিলেন। এমন সময় রূপ সিংয়ের হুইসেল বেজে উঠল। ব্যারাক ছেড়ে বারান্দায় এসে দেখি বাইরে প্রচুর ঝড় ও বৃষ্টি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম এই বিরূপ আবহাওয়ায় হিমশীতল বাতাস আর ভারি বৃষ্টিপাতের মধ্যে কোনোক্রমেই অ্যাসেম্বলি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই মুজিব হলের সামনে না গিয়ে ব্যারাকে ঢুকে পড়লাম। আস্তে আস্তে অশান্ত বাতাস ও ঝড়ো হাওয়া থেমে যায়। সকাল ১০টার মধ্যে মেঘ ফুঁড়ে দেখা দেয় ঝলমলে সূর্যের আলো। গোটা একাডেমি, দূরের পাহাড় স্বর্ণালি আভায় ভরে ওঠে। সকালের নাশতা আগেই সেরে নিয়েছিলাম। তাই রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মিত ট্রেনিং কার্যক্রমে অংশ নিতে বেরিয়ে পড়ি।

দিনভর কঠোর অনুশীলন চলে, ধীরে ধীরে দিনের আলো কমতে থাকে। পড়ন্ত রোদের আমেজ গায়ে মেখে আমরা মুজিব হলের সামনে 'ফল-ইন' করি। এবার জাতীয় সংগীতের মূর্ছনার মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা নামানো হবে। সামনে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের সারিতে আমাদের ইনস্ট্রাকটররাও সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু জাতীয় সংগীত শুরু না করে ইনু ভাই কিছু বলার জন্য সামনে এসে দাঁড়ালেন। সবাইকে জাতীয় পতাকার দিকে তাকাতে বললেন। আমরা তাকিয়ে দেখলাম, প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার তোড়ে গোটা পতাকাটি ছিঁড়ে গেছে। পতাকাটির প্রায় আশি-নব্বই ভাগই নেই। পতাকাটি শুধু স্ট্যান্ডের সঙ্গে গিঁট দিয়ে বাঁধা অবস্থায় চার-পাঁচ ইঞ্চি কাপড় বাতাসে পতপত করে উড়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল।

অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে ইনু ভাই বলতে শুরু করলেন– দেখুন, আপনারা বৈরী প্রকৃতির জন্য সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে আসতে পারেননি, এটাই স্বাভাবিক। তবে ভারতীয় সামরিক অফিসার ও আমরা (ইনস্ট্রাকটররা) এসেছিলাম এবং জাতীয় সংগীত গেয়ে পতাকাটি উত্তোলন করেছিলাম। সারাদিন বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে এই পতাকাটিকে। অশান্ত ঝড়ো হাওয়ার তোড়ে পতাকার অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; কিন্তু পতাকাটি মাথা নত করেনি। দেখুন, এখনো অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসে দুলছে পতপত করে।

তবে সকালে যে এখানে আসতে পারেননি, এর জন্য দায়ী আপনারা নন। দায়ী আমরা, যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আপনাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের গহিনে প্রচুর দেশপ্রেম, সব ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য যতটা হৃদয়াবেগ আপনাদের ভেতর জাগরূক করার কথা, এর সমুদয় দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপর। আমরা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। অতএব আমাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

কথাগুলো যখন ইনু ভাইয়ের মুখে উচ্চারিত হয়, তখন মনে হচ্ছিল আমাদের হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে ব্রাশফায়ার হচ্ছে, রক্তনালি ছিঁড়ে তীব্র ব্যথায় আমাদের বুক টনটন করছে। কেন আমরা সকালে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে জাতীয় সংগীত গাইতে এলাম না, কেন আমাদের সামর্থ্য হলো না জাতীয় পতাকার সম্মানের জন্য সামান্য ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করার? অপমানে-ক্ষোভে-আবেগে আমরা সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এ সময় ইনু ভাই যেন হিমালয়ের মতো আত্মপ্রত্যয়ী বুক উঁচিয়ে চলে গেলেন আগের স্থানে। সেখানে গিয়ে শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হকসহ সবার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘোষণা দিলেন– আমাদের সবার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, আপনাদের হৃদয়ে গভীর দেশপ্রেম এবং প্রিয় জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাই ছিন্নভিন্ন জাতীয় পতাকাটিকে সাক্ষী রেখে এখন আমরা (ইনস্ট্রাকটররা) একশবার কান ধরে ওঠবস করব।

সে কী অপরূপ দৃশ্য! হৃদয় মাতানো এক অভূতপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা মুজিব হলের সামনে। সব ইনস্ট্রাকটর কান ধরে ওঠবস করতে শুরু করলেন, আর ওঠবস করার সঙ্গে সঙ্গে মাহবুব ভাই উচ্চৈঃস্বরে গুনতে লাগলেন এক, দুই, তিন ...। এতক্ষণ আমাদের হৃদয় তোলপাড় করছিল নিজেদের চরম ব্যর্থতার জন্য। ইনু ভাই যখন কান ধরে ওঠবস শুরু করলেন,

তখন আমরা আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমরা ১ হাজার ৫০০ যোদ্ধা শুধু কান ধরেই ওঠবস করিনি, আমাদের বুকফাটা কান্নায় সেদিন পাহাড়-পর্বতঘেরা টাঙুয়া মিলিটারি একাডেমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাহবুব ভাইয়ের যখন একশ গোনা শেষ, তখন ইনু ভাই আমাদের সবাইকে বুকে জড়িয়ে স্নেহ-আদর দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় লেগেছিল সে কান্নার সুর-মূর্ছনা মুছে যেতে। এই অভূতপূর্ব হৃদয়ভেজা দৃশ্য দেখে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা রূপ সিং এগিয়ে এসে ইনু ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আপলোক তো ইনসান নেহি, দেবতা হায়। আপকা বিজয় অবশ্যম্ভাবী।'

একটি মিছামিছি যুদ্ধ

হঠাৎ অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই মহাসাইরেন বেজে উঠল। আমরা যে যেই অবস্থায় ছিলাম হুড়মুড় করে প্যারেড গ্রাউন্ডে 'ফল-ইন' হলাম। চারদিকে পাহাড়বেষ্টিত টাঙুয়া মিলিটারি ক্যাম্প। ট্রেনিংয়ের একপর্যায়ে আমাদের শেখানো হলো, যদি কখনো মহাসাইরেন বাজানো হয়, তখন আমরা যে যেখানে থাকি না কেন তাৎক্ষণিকভাবে প্যারেড গ্রাউন্ডে সমবেত হতে হবে। আমাদের ট্রেনিং পর্যায়ে টাঙুয়া মিলিটারি একাডেমিতে এটাই ছিল প্রথম মহাসাইরেন, যা পাহাড়-পর্বতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দিল। 'ফল-ইন' হয়ে দেখলাম শুধু বাঘা বাঘা ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাই নন, আমাদের যারা ট্রেনিং কাম মটিভেশন দিতেন (যাদের ইনস্ট্রাকটর বলা হতো), তারাও প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত। আমরা ১৪তম কোর্সের পুরো ৩০০ মুজিব বাহিনীর সদস্য ট্রেনিং প্যারেড গ্রাউন্ডে আর্মির রেওয়াজ অনুযায়ী 'র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইলে' দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের সামনে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নিলেন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা রূপ সিং, এইচজি গুরাং, মেজর দেবদাস প্রমুখ এবং একই সারিতে ছিলেন আমাদের ইনস্ট্রাকটররাও।

একপর্যায়ে এগিয়ে এলেন মাহবুব ভাই (আ ফ ম মাহবুবুল হক)। আবেগাপ্লুত ও গম্ভীর কণ্ঠে তিনি জানালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লাহোর সীমান্ত বরাবর বিশাল আকারের সৈন্য সমাবেশ করছে এবং ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দারা সংবাদ পেয়েছেন দু-একদিনের মধ্যেই তারা লাহোর সীমান্ত দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। তাই দ্রুত লাহোর সীমান্তের দিকে বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন ভারতীয় যোদ্ধারা। তিনি আরও জানালেন, ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ মুজিবনগর সরকারের চুক্তি আছে– এই দুই দেশের যে কেউ বহিঃশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্য দেশ সেই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দেবে। আজ যেহেতু ভারত পাকিস্তানের সামরিক হামলার শিকার হচ্ছে, অতএব টাঙুয়া মিলিটারি একাডেমিতে ট্রেনিং গ্রহণকারী বাংলাদেশের বীর যোদ্ধারাও এই দুঃসময়ে ভারতের পাশে দাঁড়াবে এবং লাহোর সেক্টরে সম্ভাব্য যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেবে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বক্তৃতা শুনলাম এবং পাকিস্তানি হায়েনাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করতে যাচ্ছি– এই কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও শিরা-উপশিরায় এবং রক্তের ধমনিতে একধরনের ভূমিকম্পের শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল।

যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি চলছে। আমাদের বলা হলো, আর মাত্র তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। তখন টাঙুয়ায় প্রচণ্ড শীত। এই মিলিটারি একাডেমিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। আমাদের প্রথমে পোশাক দেওয়া হলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রদত্ত কমব্যাট ড্রেস পরে নিলাম আমরা। বিশাল ওভারকোট জড়িয়ে, জঙ্গল শু পরে মাথা-কান ঢেকে আমরা যখন প্রস্তুত হলাম, তখন সামনের লোকটি পেছনের কিংবা পাশের জনকে চিনতে পারছিলাম না। সব ড্রেসের পেছনে নম্বর দেওয়া শুরু করলেন মার্কার পেন দিয়ে। ১ থেকে ৩০০ জনের প্রত্যেককে দেওয়া হলো 'হেভার চেক লাঞ্চ ব্যাগ'। প্রত্যেককে দেওয়া হলো ২৪টি করে বিশাল সাইজের পুরি ও ১২টি করে সিদ্ধ ডিম। এই ডিম চোখে না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের দেশের রাজহাঁসের ডিমের চেয়েও বড়ো। এগুলো নাকি পাহাড়িজাতীয় পাখির ডিম। মরুভূমি ও পাহাড়ের পাদদেশ থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে দেওয়া হলো সুস্বাদু ভাজি। প্রত্যেককে দেওয়া হলো দুটি করে আর্মি ওয়াটার পট। এবার দেওয়া হলো আনুষ্ঠানিক মটিভেশন লেকচার। শরীর-মনে শিহরণ জাগানো সেই বক্তৃতা। ইনু ভাই, আম্বিয়া ভাই ও মাহবুব ভাইয়ের বক্তৃতাই সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী হতো।

আমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অরক্ষিত ছিল আমাদের লক্ষ-কোটি মা-বোন। আমরাও সিদ্ধান্ত নিয়েই মুক্তিযুদ্ধে এসেছি– লড়ব। দেশ স্বাধীন করব। জন্মমৃত্যু পায়ের ভৃত্য জেনেই তো আমরা নাম লিখিয়েছি মুক্তিযোদ্ধার তালিকায়। আজ আমরা যাচ্ছি পাকিস্তানিদের খতম করতে। আমাদের রক্তে টগবগ করছিল দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা। একপর্যায়ে আমরা রওয়ানা হলাম অজানা দুর্গম পাহাড়ি পথে। আমাদের সামনে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন। বিশাল বিশাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, বিশাল ভারতীয় তেরঙা পতাকা হাতে– জোর কদমে এগিয়ে চলল অশ্বারোহী সিপাহিরা। জানানো হলো যথাস্থানে পৌঁছে আমাদের দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র। বিভিন্ন সাইজের মর্টার, রিকোলেস্স গান, হরেক রকমের কামানসহ আধুনিক অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ আমাদের অনেক আগেই শেষ হয়েছে। অতএব, বীরের মতো সুতীব্র অন্ধকার ভেদ করে আমরা পাহাড়ের পাদদেশের বন্ধুর পথ ধরে লাহোরের দিকে অগ্রসরমান।

> প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম বলেই আমাকে সবাই ওস্তাদ বলতেন। আমি তাকে সাহস দিয়ে বলতাম, 'আলী আহাম্মদ, ভয় পেও না। আল্লাহ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েছেন বলেই আমরা এই মহান দায়িত্ব পেতে যাচ্ছি পাকিস্তানিদের খতম করতে'

এখানে একটি কথা বলে রাখি, বেশ কদিন ধরেই কেমন জানি একটি গুমোট ভাব বিরাজ করছিল আমাদের পুরো ট্রেনিং একাডেমিতে। সব জায়গায় কেমন জানি একটু ফিসফিস ভাব। বিশেষ করে ট্রেনিং শেষ হলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার 'ফল-ইন' হতাম ট্রেনিং গ্রাউন্ডে। আমাদের সামনেই পতপত করে উড়ত লাল-সবুজের প্রিয় জাতীয় পতাকা। আবার সকালে আমাদের প্রিয় জাতীয় সংগীত– 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গেয়ে পতাকা নামাতাম। তারপর আমরা পুরো এক ঘণ্টা বিশ্রাম পেতাম। সকালেই দৌড়ে যেতাম ক্যান্টিনে। আমাদের থাকা-খাওয়া, কাপড়চোপড় সবই দেওয়া হতো ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। উপরন্তু প্রতিদিন হাতখরচ বাবদ আমাদের দেওয়া হতো ইন্ডিয়ান এক রুপি। এখানে কোনো হাসার বিষয় নয়। এই এক টাকার অর্ধেকও আমরা খরচ করতে পারতাম না। কারণ একটি বড়ো সাইজের কমলা, একটি কলা বা আপেল এবং দুটি বড়ো জিলাপি খেলে আমাদের বিল আসত মাত্র পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ আটআনা।

তাই যখনই আমরা ক্যান্টিনে যেতাম, নানা ধরনের গুজব শুনতাম। সপ্তাহখানেক ধরে আমরা আওয়াজ পেতাম আমাদের নাকি নিয়ে যাওয়া হবে পাকিস্তানিদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে। তবে আমরা ভাবতাম আসলেই যুদ্ধ হবে বাংলাদেশের মাটিতে, নিদেনপক্ষে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাকিস্তানি দখলদার হায়েনাদের সঙ্গে। তবে লাহোরের পথে যাত্রা শুরু করার পর আমাদের সে ভুল ভাঙল। আমার সঙ্গে একজন সদস্য ছিল খুব ভীতু প্রকৃতির। পথচলার সময় দু-একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল– ওস্তাদ, আমাদেরকে কামানের সামনে বলির পাঁঠা করে দাঁড় করাবে না তো? প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম বলেই আমাকে সবাই ওস্তাদ বলতেন। আমি তাকে সাহস দিয়ে বলতাম, 'আলী আহাম্মদ, ভয় পেও না। আল্লাহ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েছেন বলেই আমরা এই মহান দায়িত্ব পেতে যাচ্ছি পাকিস্তানিদের খতম করতে।'

হঠাৎ আমাদের বিস্ময়-বিব্রত করে চারদিক থেকে নির্বিচারে গুলি আসতে লাগল। বিকট বিকট শব্দে পাহাড়ি প্রান্তর কেঁপে উঠতে লাগল। কামান-গোলার মুহুর্মুহু বিকট আওয়াজে আমাদের কানের পর্দা ভেদ করে প্রকম্পিত করে তুলল রাতের পাহাড়ি ভূমি। কে যে কোথায় ছিটকে পড়লাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না। যে যেখানে পেরেছে গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছে আত্মরক্ষার্থে। সারারাত চলল নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কামানের গর্জন। শুনতে পারলাম বারবার কামান ও মর্টারের শেল এসে পাহাড়ি গাছগাছালিকে উথালপাতাল করে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। বুঝতে বাকি রইল না যে ভারতের প্রস্তুতি টের পেয়ে পাকিস্তানই আগে আক্রমণ করে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে এই একতরফা আক্রমণ। এভাবে তীব্র গোলাগুলির আওয়াজ চলল সুবেহ সাদেক পর্যন্ত। একটি গাছের গোড়ার সঙ্গে মুখ লুকিয়ে আমি সারারাত কাটিয়ে দিলাম। ভাবলাম সৌভাগ্যবশত আমিই বুঝি বৃক্ষটির সহায়তায় বেঁচে গেছি। আর হয়তো কিছুক্ষণ পরেই পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ব। এবং বাঙালি বুঝতে পারলে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করবে। ইতোমধ্যেই আমার মনে কয়েকজন সহযোদ্ধার কথা ভেসে এলো, যাদের মায়েদের কাছ থেকে আমি তাদের ফিরিয়ে আনব– এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছিলাম। সেই বাকের মিয়া, প্রাণের ভাই মোখলেছ, গুরুজন আবদুল মতিন, স্নেহাস্পদ শাহ আলম, আবদুল আজিজ, মিয়াবাড়ির নেপু, ঢাকাইয়া জাকির প্রমুখ প্রিয়জনের মুখ আমার হৃদয়ের ক্যানভাসে ভেসে উঠছিল এবং আমি একধরনের নিশ্চিত ছিলাম তারা কোনো না কোনো মর্টার বা কামানের শেলবিদ্ধ হয়ে এই প্রিয় পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে।

রাতের আঁধার মুছে গিয়ে পূর্বদিগন্তে সূর্যের প্রথম রশ্মি পাহাড়ি গাছগাছালি ও লতাগুল্ম স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি সংবিৎ ফিরে পেয়ে যে গাছের গোড়ার সঙ্গে মুখ ঢেকে গোটা রাত কাটিয়েছি, সেই গাছটিকে ধরেই উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দূর থেকে একটি পাহাড়ি চূড়ায় দেখতে পেলাম কী যেন একটি উড়ছে। লক্ষ করে বুঝতে পারলাম, এটা ছিল আমাদের প্রাণের প্রিয় জাতীয় পতাকা। হঠাৎ মনে হলো, ট্রেনিংয়ের সময় আমাদের শেখানো হয়েছিল কোনো যুদ্ধের পর সব যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন একজন গিয়ে উঁচু স্থানে একটি নিশান উড়াবে, যাকে লক্ষ করে যারা বেঁচে থাকবে তারা সেখানে গিয়ে সমবেত হবে। সামরিক ভাষায় ওই নিশান উড়ানো স্থানটিকে বলা হয় রাঁদেভো। এখানে এসে সবাইকে জড়ো হতে হয়। আমি ওই পতাকাকে নিশানা ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মনে হয়, এই সামনেই; কিন্তু যতই হাঁটি ততই দূরে মনে হয় স্থানটিকে। শেষ পর্যন্ত অপরাহ্ণ নামলে ওই পাহাড়শীর্ষে গিয়ে পৌঁছলাম। ততক্ষণে ২৫০ জনের মতো সহযোদ্ধা সেখানে সমবেত হয়েছে। ভারতীয় সৈন্য ও সেনা কর্মকর্তা এবং আমাদের ইনস্ট্রাকটররা সবাই উপস্থিত। জনাপঞ্চাশেক সদস্য এখনো আসতে বাকি। মাউন্টেন ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের পাহাড়ে পাহাড়ে পাঠানো হয়েছে সবাইকে খুঁজে আনতে। তবে এর পরদিন সকাল ১০টা লেগেছিল সর্বমোট ৩০০ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীকে খুঁজে বের করতে। সে কতই না অভিজ্ঞতা– কে কীভাবে পালালেন, কে কীভাবে বেঁচে গেলেন এবং কে কীভাবে ২৪টি পুরি ও ১২টি বড়ো সাইজের ডিম, ভাজি ও দুই ব্যাগ পানি সাবাড় করলেন– এ গল্প শুনলাম। আবার অনেকে ছিলেন একটি পুরিও স্পর্শ করেননি। ভয়ে জড়সড়ো হয়ে সারারাত-সারাদিন অনাহারে কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত আমাদের বোঝানো হলো পুরো ঘটনাটি একটি সাজানো মিছামিছি যুদ্ধ। এটি একটি ট্রেনিংয়ের নাম 'হিট অ্যান্ড রান'। প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে বিকট গোলাগুলির সময় কীভাবে জীবন নিয়ে পালাতে হয়, এটি ছিল তেমনই একটি মহড়া।

ভয়ংকর ষড়যন্ত্র

একটি কথা আছে, 'Shadow comes first.' দুঃসংবাদ বেগে ধায়। খারাপ খবর ত্বরিতগতিতে সবার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে রক্তক্ষরণের সৃষ্টি করে। আমাদের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম থেকে জাগতে হতো। প্রত্যুষে সব ধরনের কাজকর্ম সেরে ইউনিফর্ম পরে আমাদের প্যারেড গ্রাউন্ডে 'ফল-ইন হতে হতো। সারারাত আমাদের মন প্রফুল্লই থাকত। কারণ নিত্যনতুন ট্রেনিং, ভারী অস্ত্র চালনার কৌশল আত্তীকরণ ও শীঘ্রই ট্রেনিং শেষ করে স্বদেশের মাটিতে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুর্দান্ত বাসনা আমাদের সদাসর্বদা উল্লসিত করে রাখত। কিন্তু সেদিনের সকালটা ছিল ভিন্নতর। প্রকৃতিতে গুমোট আবহাওয়া। সূর্যের দেখা নেই, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি দিয়েই সকালটা শুরু। এদিক-ওদিক কেবল ফোঁসফাঁস ষড়যন্ত্রের গন্ধ ভেসে আসছিল। আমরা ট্রেনিংয়ে মন বসাতে পারছিলাম না। ১১টার দিকে আমাদের নাশতা খাওয়ার ব্রেক হতো। আমরা কজন নাশতা না খেয়ে ক্যান্টিনের দিকে রওয়ানা হলাম। ক্যান্টিনে আমাদের জন্য রেডিও-টিভি উপভোগ করার সুযোগ ছিল। সকাল থেকে যেসব গুজব শুনে আমাদের হৃদয়-মন ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল, এর কিছু সত্যতা পেলাম বিবিসির খবর শুনে। খবরে বলা হলো, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পূর্ব পাকিস্তানের ইস্যুতে একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন। একই সময় তিনি কঠোর ভাষায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে নাক না গলানোর জন্য সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'East Pakistan Issue is purely an internal matter of Pakistan and India should not push its nose in it.' পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আমেরিকার ওকালতি ও নিক্সন কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধীকে শাসিয়ে দেওয়া– সবকিছুই ছিল সকাল থেকে আমরা যে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছি, এর সঙ্গে যথাযথ সংগতিপূর্ণ। এই মর্মে গোটা মিলিটারি একাডেমিতে রটনা ছড়িয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক ও মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি চক্র মুক্তিযুদ্ধকে

শেষ পর্যন্ত আমাদের বোঝানো হলো পুরো ঘটনাটি একটি সাজানো মিছামিছি যুদ্ধ। এটি একটি ট্রেনিংয়ের নাম 'হিট অ্যান্ড রান'। প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে বিকট গোলাগুলির সময় কীভাবে জীবন নিয়ে পালাতে হয়, এটি ছিল তেমনই একটি মহড়া

বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদতে তার এই ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য কুটিল তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এই কুটিল ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক তৎপরতা চালানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুখ্যাত ড. হেনরি কিসিঞ্জারকে। মোশতাক-জিয়া চক্র এই নটোরিয়াস কিসিঞ্জারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশে যে কজন এমএনএ ছিল, তাদেরসহ অন্তত ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ম্যানেজ করা, যারা গোপনে ভারত ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবে। সামরিক বাহিনী সামলাবে মেজর জিয়াসহ অন্যরা। এই ব্লু-প্রিন্টের আওতায় মোশতাককে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানো হবে এবং লোক দেখানো হলেও ছয় দফার অধিকাংশ দাবিই মোশতাক সরকার প্রথম সভায়ই মেনে নেবে।

বিবিসির সংবাদের সঙ্গে এই রিউমার খুবই সংগতিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। যাহোক, আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম। মধ্যাহ্নবিরতির সময় চেষ্টা করলাম ইনু ভাই, শরীফ নুরুল আম্বিয়া ভাই, মাহবুব ভাই প্রমুখের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা বলতে। অবশ্য প্রথা অনুসারে প্রতিদিন রাতেই ইনু ভাইয়েরা ব্যারাকে ব্যারাকে গিয়ে আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে থাকেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমাদের তর সইছিল না। আমার সঙ্গে একজন ছিলেন খুবই ডেডিকেটেড; কিন্তু অস্থির চিত্তের মানুষ। তার নাম ছিল আবদুল মতিন। তিনি রাজ্জাক ভাইয়ের নেতৃত্বে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য ছিলেন। সবসময় গায়ে 'মুজিব কোট' জড়িয়ে রাখতেন। ওই 'মুজিব কোটে' বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া আছে বলে তিনি মুজিব কোটটি কখনো ধুতেন

না। মতিন ভাই এসে কেঁদেকেটে সারা। লিডার, আমাদের আর দেশে ফেরার কোনো উপায় নেই। মোশতাক গিয়ে সরকার গঠন করলে চিরদিন আমাদের ভারতের কোনো এক শরণার্থী ক্যাম্পেই বসবাস করতে হবে। আমি তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিতাম– থামেন, মোশতাক সরকার চালাবে আর আমরা কি ঘোড়ার ঘাস কাটব! বিশ্বের এই নামিদামি সামরিক একাডেমিতে আধুনিক সমরাস্ত্র পরিচালনার ট্রেনিং নিয়ে আমরা শরণার্থীশিবিরে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করব? এক মাসের মধ্যেই গোটা বাংলাদেশ মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। মতিন ভাই কিছুটা সাহস পেলেন। তাকে বললাম, রাতে আমরা ক্যান্টিনে গিয়ে বিবিসি ও অল ইন্ডিয়া রেডিও শুনব। আমরা ক্যান্টিনে গিয়ে বসতেই অল ইন্ডিয়া রেডিওর ইংরেজি সংবাদ শুনতে পেলাম। প্রেসিডেন্ট নিক্সন পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নে নাক না গলানোর যে আবদার করেছেন, তার জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'Yes Mr. Nixon, we know very well that East Pakistan issue is an internal matter of Pakistan. But you don't know that India bears records of civilization for centuries. When innocent people are being killed indiscriminately at our next door, India can't remain as a silent spectator.'

ইন্দিরা গান্ধীর এই কথায় আমরা প্রাণ ফিরে পেলাম। সারাদিনের গুজব, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সংকট, সবকিছু কেটে গেল। আবার আমরা দ্বিগুণ সাহসের সঙ্গে ব্যারাকে ফিরে এসে ঘুমাতে গেলাম। জেগে রইল সুন্দর সকালের প্রত্যাশা। পরে শুনেছিলাম ভারত সরকার ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার মোশতাক-জিয়া চক্রের ষড়যন্ত্রের কথা জানলেও কৌশলগত কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তবে তাদের সর্বদাই ওয়াচে রাখা হয়েছে।

আজ স্বদেশে ফেরার পালা। একদিন টাঙুয়ায় এসেছিলাম কাঁচামাল হিসেবে। আজ ফিরে যাচ্ছি দুর্দান্ত গেরিলাযোদ্ধা হিসেবে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমরা সবাই উন্মুখ

ফেরার পথেঃ রক্তের রাখিবন্ধন

দুরন্ত বেগে ছুটে আসা ট্রেনটির গতি শ্লথ হয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত লখনৌর আউটার স্টেশনে এসে 'ডেডস্টপ' হয়ে গেল ট্রেনটি। আমরা যারা দীর্ঘ সময় ধরে আঁকাবাঁকা ট্রেনটির ছন্দায়িত চলার গতির সঙ্গে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, ট্রেনটি থামার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যালার্ট হয়ে গেলাম। মুহূর্তেই বেজে উঠল পরিচিত বাঁশির হুইসেল। বুঝতেই পারলাম, মেজর এইচজি গুরাং আমাদের 'ফল-ইন' করতে বলছেন। উত্তরপ্রদেশের দেরাদুনস্থ বিশ্ববিখ্যাত টাঙুয়া মিলিটারি একাডেমিতে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় দীর্ঘ তিন মাস প্রতিদিন আমরা এই হুইসেলের শব্দে ঘুম থেকে জেগে অ্যাসেম্বলিতে গেছি। আবার একই বাঁশির শব্দ শুনে রাতে ব্যারাকে ঘুমাতে গিয়েছি।

এই মুজিব বাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত ১৪তম ব্যাচের তিনশ' গেরিলা যোদ্ধা নিয়ে ট্রেনটি সম্ভবত শাহরানপুর শহরের একটি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই বিশেষ ট্রেনটির গন্তব্য ছিল আগরতলা। এখান থেকেই সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারূপে আমাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইনডাক্ট করার কথা।

মেজর গুরাংয়ের বাঁশির হুইসেল শুনে আমরা ট্রেন থেকে নেমে 'ফল-ইন' হলাম প্রশস্ত প্রান্তরে। আমাদের বলা হলো প্রচণ্ড বাতাসের জন্য চলন্ত ট্রেনে রান্নার অসুবিধা হচ্ছে। অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখানে ট্রেনটি ঘণ্টাদুয়েক থামবে। রান্না শেষে আমরা মধ্যাহ্নভোজ সেরে আবার গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করব। আমাদের আরও বলা হলো, ইচ্ছা করলে আমরা ট্রেনেই সময় কাটাতে পারি এবং এটাই কাম্য। তবে কেউ ইচ্ছা করলে একটু এদিক-সেদিক ঘুরেফিরে দেখতে পারে। তবে আমাদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, আমরা যেন দূরে কোথাও না যাই। নিষ্প্রয়োজনে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে 'বাতচিৎ' না করি। বিশেষ করে নিজেদের পরিচয় কিংবা গন্তব্যস্থান নিয়ে কথা না বলাই ভালো।

যা হোক, নির্দিষ্ট সময়েই আমরা সবাই ট্রেনের কাছে পৌঁছে গেলাম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির ফলে আমরা সবাই ক্ষুধার্ত ছিলাম। ট্রেনের কাছে আসতেই 'কিচেন বগি' থেকে খাবারের সুঘ্রাণ নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করায় ক্ষুধার তীব্রতা আরও অনুভূত হতে লাগল। আমরা যে মুহূর্তে খেতে যাওয়ার জন্য উসখুস করছিলাম, তখনই আমাদের হৃদয় কাঁপিয়ে বাঁশির হুইসেল বেজে উঠল। এবার বাঁশি বাজালেন মেজর রূপ সিং। এই বাঁশির হুইসেলে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। নিশ্চয়ই কোনো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছেন আমাদের কোনো সহযোদ্ধা এবং দেশে ফেরার পথে আমাদের হয়তো আবার বকাঝকা খেতে হবে। তবুও হুইসেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 'ফল-ইন' হতে হলো।

আজ স্বদেশে ফেরার পালা। একদিন টাঙুয়ায় এসেছিলাম কাঁচামাল হিসেবে। আজ ফিরে যাচ্ছি দুর্দান্ত গেরিলাযোদ্ধা হিসেবে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমরা সবাই উন্মুখ। এমনই সময় না জানি কোনো অবিমৃশ্যকারীর দুষ্কর্মের জন্য আমাদের আবার বকাঝকা খেতে হবে। তবে মেঘের ফাঁকেও রোদের ঝলক দেখলাম। 'ফল-ইন'-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন মেজর দেবদাস। টাঙুয়া মিলিটারি একাডেমির সবেধন নীলমণি একমাত্র বাঙালি অফিসার। তাও মেডিকেল কোরের। বাঙালিত্বের কী বিরাট আকর্ষণ, কী দুরন্ত এর প্রাণশক্তি। এই বহু দূরদেশে অবস্থিত টাঙুয়ায় এসে তা বুঝতে পেরেছিলাম অস্থিমজ্জায়। যখনই কোনো দুঃসংবাদ কিংবা বিপদ সমাগত, মেজর দেবদাস সাক্ষাৎ দেবতার মতো আমাদের মধ্যে হাজির। একে তো বাঙালি, তার ওপর নাম দেবদাস। কোথায় মেজরফেজর। আমরা সবাই তাকে ডাকতাম দেবদা বলে। এটাই তিনি আশা করতেন বটে। আজও যখন লখনৌর রেলস্টেশনে আমরা অজানা অমঙ্গল চিন্তায় অধীর অপেক্ষমাণ, তখন এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে, বকা খেলেও যাওয়ার বেলায় বাঙালির মুখ থেকে বকা খাব। আর দেবদা কতটুকুই বকতে পারবেন?

মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখলাম, বিভিন্ন রকমের একদল মহিলা আমাদের দিকে এগোচ্ছে। এবার আর বিপদ অজানা রইল না। এমন একটি আশঙ্কা আমরা শুরুতেই করেছিলাম। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে দেখলাম নিকটস্থ কলোনির দিকে যেতে। সন্দেহ হয়েছিল, তারা কী জানি কী করে বসে। এবার মহিলাদের আসতে দেখে আমরা নিশ্চিত হলাম, আমাদেরই কোনো কোনো বন্ধু, যারা পার্শ্ববর্তী কলোনিতে গিয়েছিল, না জানি তারা কী গর্হিত কাজই করে ফেলেছে।

কিন্তু মহিলাদের মিছিলটি খুব কাছে এলে কেমন জানি অন্য একটি আবহ, অন্য একটি মেজাজ আমাদের কাছে অনুভূত হলো। সবাই সুন্দর করে পরিপাটি সাজে সজ্জিত। প্রত্যেকের হাতেই আল্পনা আঁকা ডালা-কুলা। একটু আবেগ ও কম্পনজড়িত কণ্ঠে মেজর দেবদাস সামরিক কায়দায়ই একটি ছোট্ট ভূমিকা দিতে গিয়ে বললেন, আগত এই মহিলারা নিকটস্থ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের আবাসিক কলোনির বাসিন্দা। তোমাদের কয়েকজন ছেলে এই কলোনিতে গিয়ে জল খেতে চাইলে প্রথম মহিলারা জানতে পারে, এই ট্রেনে জয় বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং শেষে স্বদেশে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। এতদিন তারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা কিংবা রেডিও-টিভিতে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা পড়েছে কিংবা শুনেছে। আজ তাদের সৌভাগ্য হয়েছে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে কিছু বাংলা মায়ের তরুণ ট্রেনে চড়ে যাচ্ছে– এখন তারা তোমাদের একনজর দেখার ও আশীর্বাদ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

এরই মধ্যে দেবদা একজন প্রৌঢ়গোছের মহিলাকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি সামনে এসে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে বললেন, তোমরা আমাদের ভাই ও সন্তানতুল্য। তোমাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও যুদ্ধজয়ের খবরে গোটা বিশ্ব আজ

মুগ্ধ। আমরা তোমাদের বিজয় কামনা করি। তোমাদের শুভ কামনা করি। আমরা আজ আরও আনন্দিত এজন্য যে, আজ ভাইফোঁটার দিন। রাখিবন্ধনের দিন। তাই আমরা শুভ কামনায় রাখি বেঁধে দিতে এসেছি তোমাদের কোমল-কঠিন হাতে, আজ ভাইফোঁটা দিয়ে শুভ কামনার সিঁদুর পরিয়ে দিতে চাই তোমাদের প্রশস্ত ললাটে। এরপরই প্রতি লাইনে দুজন করে মহিলা হাতে ডালা-কুলা নিয়ে আমাদের প্রত্যেককে রাখি বেঁধে দিতে লাগলেন এবং একই সঙ্গে ললাটে রক্তলাল সিঁদুরের ফোঁটা।

দীর্ঘদিন আমরা দেশান্তরী। প্রিয় মাতৃভূমিতে আমরা আমাদের মা, বোন, ভাবিদের রেখে এসেছি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। আমরা অনেকেই জানি না আমাদের স্নেহময়ী জননী বেঁচে আছেন নাকি পুত্রশোকে মৃত্যুর শীতল কোলে ঢলে পড়েছেন। আমরা অনেকেই জানি না আমাদের জায়াদের নম্র হাতের কোমল পাতায় কোনো গ্লানি কলঙ্কিত করেছে কি না, বোনদের রজনিগন্ধার মতো পবিত্রতা এখনো নিষ্কলুষ আছে কি না। এমনই মুহূর্তে আজ লখনৌর রেলস্টেশনে ছুটে আসা সরকারি আবাসিক কলোনির মা-বোনদের দেখে আমাদের চোখের সামনে ভেসে এসেছে স্বদেশের ভূমিতে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে আসা আমাদের প্রিয়জনদের কথা। প্রিয় মাতৃভূমির মাটি ও মানুষের কথা। হিজলফুল, কণ্টকারীর ঝোপ, তিল্লুৎপাতার হলুদ ফুল, কাজলাদিঘি, শান বাঁধানো ঘাট– সবকিছুর কথা।

সেই আকুল আবেগমাখা লখনৌ রেলস্টেশন ছেড়ে এসেছি আমরা প্রায় ৫০ বছর আগে। এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কত জল, কত জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ও প্রকৃতির বিপর্যয়। এতগুলো বছর পেরিয়ে এলেও মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। আমরা আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে ৩০ লাখ প্রাণের রক্ত ঢেলে দিয়েছি। একই সঙ্গে আমাদের মাতৃভূমি হানাদারমুক্ত করতে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন সাড়ে এগারো হাজার ভারতীয় সৈন্য। পরদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই আত্মদান নিশ্চয়ই অনন্য গৌরবের। এই রক্তের রাখিবন্ধনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধ।

আমরা যখন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কথা বলব, তখন অবশ্যই সাড়ে এগারো হাজার ভারতীয় জওয়ানের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করব, বিবেচনায় আনব। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সাহসী হতে হবে, দৈন্য ঘোচাতে হবে। ভারতীয় যোদ্ধাদের স্মরণে এখন পর্যন্ত কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে পারিনি। এই দীনতা বীরের জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গ্লানিকর। ইতিহাসের তাগিদেও এটা আমাদের করা দরকার। আমরা শৌর্য-বীর্যশালী বীরের জাতি। আমাদের সম্মানবোধ রয়েছে। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করতে সোভিয়েত নৌবাহিনীর টিম এসেছিল। সেসময় রেটকিন নামে একজন সোভিয়েত নাবিক মৃত্যুবরণ করেন। কর্ণফুলীর তীরে আমরা রেটকিনের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রতিবছর শত শত মানুষ গিয়ে রেটকিনের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসে। এটাই শোভন। এটাই আমাদের কর্তব্যবোধ। একই কারণে আমাদের স্বাধীনতার বেদিমূলে আত্মোৎসর্গকৃত এগারো হাজার ভারতীয় বীরের জন্য গড়ে তোলা উচিত ছিল এক বিশাল স্মৃতিসৌধ।

একই সঙ্গে আজ ভারতকেও একটি ধ্রুব সত্য অনুধাবন করতে হবে, ভারত আমাদের বিশাল প্রতিবেশী। এমতাবস্থায় আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টিকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ তাদের থাকতে পারে না। আমাদের ছোটো-বড়ো সব সমস্যাকেই আমাদের অনুকূলে সমাধান করার উদ্যোগ নিতে হবে ভারতকেই। বাংলাদেশকে যদি তার সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ হতে হয়, সেটা ভারতের জন্যও হবে দুঃখ ও বেদনার। রাজনৈতিক পরাজয়ও।

অতএব এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সেতুবন্ধ করতে গিয়ে কেবল প্রচলিত রাষ্ট্রাচার, কূটনৈতিক কলাকৌশল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট পরিভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এই দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু আবেগের স্থান থাকতে হবে, যে আবেগের তাড়নায় আটচল্লিশ বছর আগে লখনৌর সরকারি কলোনির মা-বোনরা ঘর থেকে ছুটে এসেছিল জয় বাংলার দামাল ছেলেদের হাতে রাখি পরিয়ে দিতে, ভাইফোঁটার রক্তিম তিলক পরিয়ে দিতে।

লেখক: সম্পাদক, বাংলাদেশের খবর/দ্য বাংলাদেশ নিউজ, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাসস

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

জুমন আলীর মানিকরতন

আবু তাহের

বিরাহিমপুর ঠাকুরবাড়ি পেরিয়ে একটু পুবদিকে গিয়ে উত্তরমুখী রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই বাচ্চু ভাই ও আমি। তখন একাত্তরের মধ্য এপ্রিল। মোটরবাইক চালাচ্ছেন বাচ্চু ভাই, বাইকের পেছন সিটে আমি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম রাজাপুর গ্রামে। এখানেই একসময়ের সাড়া জাগানো ফুটবলার সাইফউল্লাহর, মানে আমাদের প্রিয় বাচ্চু ভাইয়ের বাড়ি।

নোয়াখালী জেলা শহরেও তাদের একটি বাড়ি আছে– আমাদের বাড়ি থেকে হাঁটাপথে দুই মিনিটের দূরত্ব। তার মামা আর আমার বাবা কলকাতা-জীবনের বন্ধু। সেই সুবাদে বাচ্চু ভাই বাবাকে 'মামা' ডাকেন। বেগমগঞ্জ থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে জেলা শহরের দিকে ছুটে আসছে হানাদার পাকিস্তানি সেনা। বাচ্চু ভাই বললেন, 'গতিক খুব খারাপ মামা! বাস্টার্ডরা বোধহয় রাইতকার মধ্যে টাউনে হান্দাই যাইবো। তাহের কোনাই?'

কোনাই মানে কোথায়। আমাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক, এই অভিমত ব্যক্ত করেই তার বাইকে বসলেন বাচ্চু ভাই। স্টার্ট দেওয়ার আগে বললেন, 'সাবধানে থাকবেন মামা!' বাবা বলেন, 'আল্লাহ ভরসা! রওনা হয়ে যাও।' এভাবেই চলে এলাম রাজাপুর। এলাম বটে। নিরাপদবোধ করলাম না। দাগনভূঞা থেকে দক্ষিণে যে সড়কটি চলে গেছে বসুরহাটে, এরই পাশে রাজাপুর। এ সড়কে মিলিটারি যানচলাচল সহজ।

'ডরাস ক্যা? ডরনের কিছু নাই। বাড়িতে খোকন আছে।' বলেন বাচ্চুভাই, 'বাস্টার্ডরা আইসলে তুই আর খোকন দুইজনে মিলি বুদ্ধি করি পালাইবি।' খোকনের প্রকৃত নাম ওবায়দুল কাদের, যিনি এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। বাড়ির কাচারি ঘরের দুই বিছানায় কাদের আর আমি ঘুমাই, গল্প করি, সামনের দিনগুলো কত ভয়ংকর, কত মনোরম হবে বিশ্লেষণ করি। ওই সময় হেমন্ত মুখার্জির 'সবাই তো চলে গেছে, শুধু একটি মাধবী তুমি...' গানটি প্রায়ই গাইতেন বাচ্চু ভাইয়ের চাচাতো ভাই খোকন।

রাজাপুর যাওয়ার পথে যে ঠাকুরবাড়ি পার হই, ওই বাড়ির ছেলে তরুণ তপন চক্রবর্তী ঢাকায় স্বনামখ্যাত সাংবাদিক। তপনের বাবা বিখ্যাত শিক্ষক হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। তপনের এক ভাইও একাত্তরে শহিদ। ওবায়দুল কাদেরের বাবা মোশাররফ হোসেন ছিলেন

বসুরহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। নীতিনিষ্ঠা আর আদর্শদৃঢ়তার জন্য তিনি ছিলেন সব মানুষের শ্রদ্ধেয়।

কাদেরদের বাড়িতে ছিলাম আটদিন। এরপর চলে গেলাম খানপুর। এখানে আমাদের টুনি ভাবির পিত্রালয়। টুনি ভাবির স্বামী বাচ্চু ভাই। তার শ্বশুরালয় ভূঁইয়াবাড়ি নামে পরিচিত। জামাই বলে গেছেন তার এক মামাতো ভাই আশ্রয় নেবে, সেজন্য টুনি ভাবির ৮০ বছর বয়সি মা আমার যত্ন-আত্তির ব্যাপারে সদাব্যস্ত থাকার জন্য তার চার ছেলেকে নির্দেশ দেন। প্রায় প্রতিদিনই এ বাড়িতে ৭-৮ জন হবু মুক্তিযোদ্ধা যাত্রাবিরতি করতেন। অস্ত্রচালনা শিখে ৮-১০ জনের টিমভুক্তরা সীমান্তের এদিকে এসে ভূঁইয়াবাড়িতে দিনদুয়েক কাটিয়ে অ্যাকশনে যেতেন। বাচ্চু ভাই শহর থেকে সপ্তাহে দুদিন এসে ছোটো ভাইদের সেবাযত্ন যথাযথ হচ্ছে কি না, খবর নিতেন। হাতখরচ দিতেন। টুনি ভাবির ছোটো ভাই সালাহউদ্দিন ছিলেন তাদের বাড়িতে আসা মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিকদের নিরলস সেবক। একদিন তাকে বলি, শত শত মানুষকে খাইয়ে চলেছেন, বিরক্তি লাগে না? সালাহউদ্দিন বলেন, 'কী যে বলেন তালতো ভাই! আম্মায় কইছেন এই বছর মেহমান আইবো বেশি, সেই জন্য আল্লায় ইরি ধানের ফলনও দিছেন বেশুমার।'

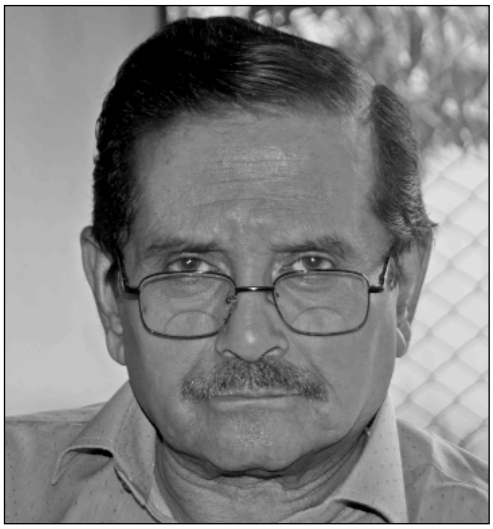

আবু তাহের

খানপুর, কেশরপাড়, মানিকপুর– এই তিন গ্রামের মানুষের মতোই বাংলাদেশের বহু গ্রামে সাধারণ লোকজন অকাতরে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়েছেন। সেবাপুষ্ট হয়ে আমরা যুদ্ধ-প্রশিক্ষিত ফিরে এসেছি, বিজয় অর্জন করেছি। নিবেদিতপ্রাণ এই সেবকরা কোনো প্রতিদান চাননি। ভূঁইয়াবাড়ির লোকরাও সেবার বিনিময়ে কিছুই দাবি করেননি। আজও করেন না। শুধু নামকরা কোনো মুক্তিযোদ্ধার প্রসঙ্গ-আলোচনার ক্ষেত্রে তারা হয়তো বলেন, 'ও, উনি! উনি তো একাত্তরে আংগো বাড়িতুনই ট্রেনিংয়ে গেছিলেন।' বলার সময় তাদের চোখেমুখে আনন্দের হিরণ্ময় দ্যুতি খেলা করে। সে আনন্দ ইতিহাসের অংশ হওয়ার আনন্দ।

খানপুর থেকে তুমুল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক দুপুরে হাজির হলাম কেশরপাড়। এই গ্রামের ডা. নুরুজ্জামান চৌধুরীর ছেলে শামসুজ্জামান চৌধুরী বাবুল আমার সহপাঠী। বাবুলকে বলি, তাদের বৈঠকখানায় এত লোক কেন? সে বলে, ভাত খাবে। তুইও খাইতে বসে পড়।' গুনে দেখি, ২২ জন খাদক। জানতে চাই, বাইশজন? বাবুল জানায়, 'হ্যাঁ, বাইশ। কোনো কোনোদিন ত্রিশও ক্রস করে।'

কেশরপাড়ে খানার আয়োজন খানপুরের স্টাইলেই। মাছ-মাংস-ডাল। খাও-ঘুমাও-ট্রেনিংয়ে যাও। মাঝারি সাইজের ডেকচিতে টগবগ করছে চায়ের পানি। দুধ ছাড়া কিংবা দুধ দেওয়া, য্যামতে ইচ্ছা খাওন যায়। স্মোকারদের জন্য সিগারেট জোগানোর ব্যবস্থা আছে। বললাম, এতই যখন ব্যবস্থা, বিয়েশাদির ব্যবস্থা করস নাই কেন? ফওজুল করিম (বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলায়) বলেন, 'গৃহকর্তা ঘোষণা দিয়া রাইখছেন এই বাড়িতে শেল্টার নেওয়া যে ফাইটার গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড পাবে, তার বিয়ার সব খরচাপাতি গৃহকর্তা বহন করবেন।'

ফওজুল করিম, আর আমি ট্রেনিংয়ের সময় একই ব্যাচে ছিলাম। আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে জিরানিয়া নামক স্থানে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বিএলএফ) ট্রানজিট ক্যাম্পে যারা গানে-কৌতুকে-ফুর্তিতে প্রাণবন্ত করে রাখে, তাদের অন্যতম ফওজুল। পাকিস্তানি সেনারা ফওজুলদের গ্রামের বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। সে অন্যান্য জেলার বিএলএফ সদস্যদের উচ্চারণ জটিলতার শিকার হওয়ায় 'ফজলুল' হয়ে যায়। ফওজুল বলে, 'আঁর কিসমত দেইখলিনি? বাড়িঘর হারাইলাম, নামখানও হারাইলাম!'

জিরানিয়া ক্যাম্পে রাতে আকাশের নিচে হ্যাজাক লাইটের আলোয় খেতে বসতাম আমরা। আশপাশের ঝোপঝাড়ের ছোটো ছোটো গেছো ব্যাঙ লাফ দিয়ে পড়ত ভাতের থালায়। নিয়ম ছিল ব্যাঙ তুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা। জালি কুমড়া আর চিংড়ি, কুচো মাছ আর আলু, মাঝেমধ্যে আধখানা ডিম। গো মাংসের জন্য হাহাকার অশেষ। অনেকে জানতে চাইত, 'ফজলু ভাই গোশত খাওয়াইবো কবে।' ফওজুলের উত্তর: 'গরু মনে কইরা ব্যাঙ খাইয়া ফালাও। নো প্রবলেম! ব্যাঙের চাইর ঠ্যাং, গরুরও চাইর ঠ্যাং!'

ডা. নুরুজ্জামান চৌধুরী ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। যৌবনে গণমুখী রাজনীতিতে নেমেছিলেন। এখন বার্ধক্য ছুঁয়েছে, সক্রিয় রাজনীতিতে থাকেন না; কিন্তু মুখটা গণ'র দিকেই রেখে দিয়েছেন। মেডিসিন আর সার্জারিতে পাকা হাত তিনি, বিস্তর রোজগার। সঞ্চয় বোঝেন না। তাকে 'খালু' ডাকি, তার স্ত্রী 'খালাম্মা'। দুজনই আমাকে সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করেন আর বলেন, 'বাবুইল্লার লগে ওঠবস করতেছো। করো। জীবনটা বরবাদ হইলে ট্যার পাইবা।'

ডাক্তারবাড়িতে এক গভীর রাতে একটি অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, 'বাবুল ভাই। ও বাবুল ভাই।' বারকয়েক এরকম আওয়াজ দেওয়ার পর বলে, 'খাইছে! ঘুমাই গেছে। খামু কিয়া? খালি পেটে ঘুমামু কেমনে!' মাঝ-উঠানে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী ছাত্রনেতা গোলাম সরোয়ার দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বোঝা গেল। তার সঙ্গী গোটাসাতেক নওজোয়ান। তাদের একজন বলে, 'লিডার! বাবুইল্লা কইয়া চিক্কর দেন। নাম বিগড়াই ডাইকলে প্রেসট্রিজ পাংচার হবে। রাগে গর্জাইতে গর্জাইতে সাড়া দিবো।' শামসুজ্জামান চৌধুরী বাবুল দরজা

> 'কোনো চিন্তা নাই। আংগো মানিকরতনরা আই গেছে!' দীর্ঘদেহী মুখভর্তি দাঁড়ি ষাটোর্ধ্ব এক মুসল্লি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে থাকেন, 'রহমত, সাজু, মকরম। তোরা আয়, দ্যাখ মানিকরতনরা আসি গেছে'

খুলে টর্চের আলো ফেলে নিশিথ অতিথিদের ওপর। বলে, 'রাইত-দুপুরে ভাতমরা গাবর গো অত্যাচার সহ্য অয় না।' সরোয়ার সদলে উচ্চহাস্য করেন: হা-হা-হা।

পরদিন সকাল থেকে আকাশ উপুড় করা বৃষ্টি। দুপুরের খাবার খেয়ে সরোয়ার, মোস্তফা কাদির, হালিম আর আমরা বৈঠকে বসি। সিদ্ধান্ত হয়, আজ রাতেই ওপারে যাত্রা। তেত্রিশ জনের তালিকা প্রস্তুত। খালু আর খালাকে বিষয়টা জানানো হলো। সাধারণত রাত ৯টায় রাতের খানা হয়। আজ হয়ে গেল ৮টায়। রাত ১১টার দিকে বৃষ্টি কমে টিপটিপ হচ্ছিল। খালা-খালু চোখের পানিতে আমাদের বিদায় দিলেন। একটা সারি হয়ে সাপের মতো কিলবিলিয়ে আমরা চলছি। নিঃশব্দে। গন্তব্য পূর্ব-উত্তরে ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাংক রোড। রোড পেরিয়ে পৌনে এক মাইল পরই ভারতীয় ভূখণ্ড।

ট্রাংক রোডে মিলিটারি গাড়ি চলছে। হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে আধ মাইল দূর থেকেই। আজিজ নামে একজনকে পাঠানো হলো অবস্থা

বোঝার জন্য। তিনি রোডের কাছাকাছি একটি গ্রামের মানুষ। বললেন, 'জালিমের বাচ্চারা ঘনঘন আসে-যায়। সরোয়ার ভাই, আইজকা প্রোগ্রাম ক্যানসিল করেন।' যাত্রাকালের সংকট-সমস্যা মোচনের জন্য পাঁচজনের একটা অঘোষিত কমিটি করা হয়েছিল। কমিটি ভেবেচিন্তে বলে, 'আমরা ফিরে যাব।'

অনভ্যস্ত দীর্ঘ হন্টনে ক্লান্ত চরণ এগোয় না। তাই তিনটি নৌকায় উঠলাম আমরা। পরের রাতে এসব নৌকায় সওয়ার হয়েই আমরা পুবমুখী এগিয়ে যাই এবং প্রত্যুষে নিরাপদে সীমান্ত পাড়ি দিই। পাকা রাস্তায় উঠে পাবলিক জিপ চেপে আগরতলায় পৌঁছাই। সেখানে আমাদের বরণ করেন এমএ মান্নান (প্রয়াত, সাবেক শ্রমমন্ত্রী), আবদুল কুদ্দুস মাখন (ডাকসুর সাবেক জিএস), সৈয়দ রেজাউর রহমান (এখন প্রখ্যাত আইনজীবী) এবং আরও অনেকে।

মিলিটারির ভয়ে পিছিয়ে আসার জন্য আমরা নৌকায় চেপে খালের পানিতে ভাসতে ভাসতে সুবেহ সাদেকের পর লোকালয়ে পৌঁছাই। নৌকা তিনটি তখনও চলছে। আজিজ ইশারা করলে থামবে। ভোরের আলো ফুটছিল। খালের বাম পাড়ে টিনের ছাউনির একটি মসজিদ দেখতে পাই। ফজরের নামাজ হয়ে গেছে। মাথায় টুপি ১০-১২জন মুসল্লি শিথিলপায়ে হাঁটছেন। তারা সবাই বিস্মিত চোখে আমাদের দেখছেন। আজিজের সংকেত পেয়ে নৌকাগুলো থেমে যায়। লাফিয়ে লাফিয়ে যাত্রীরা নামতে থাকে।

'কোনো চিন্তা নাই। আংগো মানিকরতনরা আই গেছে!' দীর্ঘদেহী মুখভর্তি দাঁড়ি ষাটোর্ধ্ব এক মুসল্লি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে থাকেন, 'রহমত, সাজু, মকরম। তোরা আয়, দ্যাখ মানিকরতনরা আসি গেছে।' যেখানে এলাম তার নাম মানিকপুর। যিনি হাঁক দিলেন, তার নাম জুমন আলী, দমকল বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য। তার ধারণা, আমরা প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধা। সরোয়ার বলেন, 'চাচা! আমরা ট্রেনিং নিই নাই। রাস্তা নিরাপদ ছিল না। ফিরি আইছি। ট্রেনিং নিতে আইজ রাইতে আবার বর্ডারে রওনা দিমু।'

জুমন আলী বলেন, 'একবার না পাইরলে একশবার রওনা দিবেন। ট্রেনিং নিছেন কি নেন নাই, মানিকরতন তো মানিকরতনই। এখন চলেন নাশতা করি রেস্ট নিবেন। আংগো লগে কষ্ট করি ডাইলভাত খাবেন।' তিনি প্রতি বাড়িতে তিনজন করে এগারো বাড়িতে বণ্টন করে দিলেন তার মানিকরতনদের।

খুবই গরিব এলাকা মানিকপুর। অধিকাংশ বসতঘর জীর্ণ। কিন্তু বাসিন্দারা আমাদের আপ্যায়ন করলেন রাজকীয় অতিথির সম্মানে। বাড়ি বাড়ি থেকে মুরগি সংগ্রহ করে বড়ো ডেকচিতে রান্না করা হয়েছিল। ঘি ছিল না। নারিকেলের শাস বেটে রস বের করে দুধ বানিয়ে, সেই দুধ দিয়ে পাকানো হয়েছিল পোলাও। যখন আমরা খাচ্ছি, জুমন আলী তদারকি করছিলেন আর বলছিলেন, 'আমনেগো কোনো খেদমত হইল না। যুদ্ধ জিতনের পর আইয়েন। কী সেবাযত্ন করি তখন দেখবেন মানিকরতন বাবারা আমার।'

মানিকপুর আর তার আশপাশের গ্রামগুলোয় জুমন আলীর মতো অনেক সেবক ছিলেন। আমরা শহুরে মানুষ একাত্তরে তাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে থেকে পুষ্ট হয়েছি। বিজয়ের সামর্থ্যে শানিত হয়েছি। তারপর? যুদ্ধ শেষে শহুরে মানুষের চরিত্র বজায় রাখার জন্যই ওই জুমন আলীদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছি। জায়গাগুলোর নামও আবছা হয়ে গেছে স্মৃতিকোণে। অন্যের কথা থাক। নিজে কী করলাম! জুমন আলীর বাড়ি যাওয়া দূরকথা। রাজনীতিক হাসান মনজুর মনে করিয়ে না দিলে তো এই স্মৃতিকথায় মানিকপুরকে 'মানিকনগর'ই লিখে ফেলতাম!

লেখক: যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

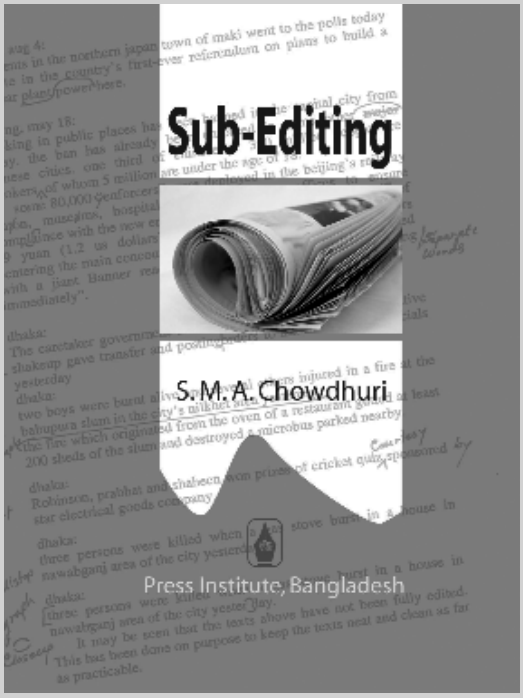

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

১৯৭১: কিছু স্মৃতিকথা

তরুণ তপন চক্রবর্তী

স্মৃতিকথা বলতে বা লিখতে গেলে বেশির ভাগ সময়ই নিজের কথা এসে যায়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা লিখতে বসলে অনেক পেছন থেকে শুরু করতে হয়। ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র শহিদ হওয়ায় ছাত্র আন্দোলন বেগবান হয়। আন্দোলন শহর ছেড়ে জেলা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত চলে যায়। এ সময় আমাদের এলাকায় (নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ থানা) জেলা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা আবু ছালেহ গোলাম মহিউদ্দিন ভাইয়ের নেতৃত্বে আসেন এবং একটি ছাত্র-জনসভা করেন। আমরা ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাদের বক্তব্য শুনেছি। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে মিছিল হতো। এ সময় মহিউদ্দিন ভাই আমাদেরকে মিছিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্কুলের বাইরে অপেক্ষা করতেন। স্কুল ছুটি হলে আমরা মিছিলে যেতাম এবং স্লোগান দিতাম। আমরা তখন রাজনীতির কোনো কিছুই বুঝতাম না।

এর মধ্যে শেষ হলো আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা। এদিকে আন্দোলনও গতি পেতে লাগল। আমাদের অংশগ্রহণও ক্রমেই বাড়তে লাগল। সময়য়টা ১৯৬৩ সাল, আমাদের থানায় গঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কমিটি। মহিউদ্দিন ভাই জেলা ছাত্রলীগের নেতা, তিনিই কমিটি অনুমোদন দিলেন। আমাকে করলেন সহসভাপতি। ক্লাস নাইনের ছাত্র আমি। লেখাপড়ার চেয়ে মনে হতো আন্দোলনেই মনোযোগ বেশি। বাড়ি থেকে শত চাপ সত্ত্বেও কেন যেন নেশাগ্রস্তের মতো রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছি। প্রধান শিক্ষক এই (রাজনীতির) কারণে স্কুল থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। বিপদে পড়ে গেলাম, বাড়িতে ঢোকাই মুশকিল হয়ে পড়ল। পরে মুচলেকা দিয়ে আবার স্কুলে গেলাম।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডামাডোল। প্রতিদিনই মিছিল-মিটিং হচ্ছিল। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোম্পানীগঞ্জের মানুষও জেগে উঠল। সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ছিলেন ফাতেমা জিন্নাহ আর মুসলিম লীগের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। কোম্পানীগঞ্জে মুসলিম লীগ অফিসে একদিন সন্ধ্যায় আক্রমণ হলো আমাদের মিছিল থেকে। মামলা হলো, আমরা ২৭ জন গ্রেফতার হলাম। আমাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ নেতারাও ছিলেন। অবশ্য

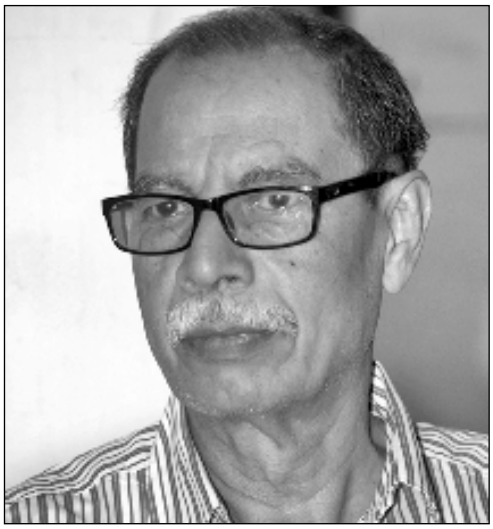

তরুণ তপন চক্রবর্তী

আবদুল মালেক উকিল (তৎকালীন পাকিস্তান পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় নেতা), সোবাহান উকিল, সাখায়েত উল্যা উকিলসহ অনেকেই আমাদের পক্ষে দাঁড়ালেন কোর্টে। তিনদিন পর আমরা জামিন পেলাম। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে আমরা মিছিল-মিটিং করছিলাম। তখনও মাইকের প্রচলন আমাদের অঞ্চলে খুব একটা হয়নি। টিনের তৈরি চোঙা দিয়ে মাইকের কাজ সারা হতো। একদিন থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক এমদাদ ভাইয়ের কাছে জানতে পারলাম আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম যাবেন। যাওয়ার পথে কোম্পানীগঞ্জে কিছুক্ষণের জন্য থামবেন। শুনে কেন যেন আমার ভেতর বিদ্যুৎ খেলে গেল। অপেক্ষায় রইলাম। (তারিখ মনে নেই) তিনি এলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা এবং নোয়াখালী জেলা থেকে অনেক নেতা এলেন। দুপুর হয়ে গেল, থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি আলী ইমাম চৌধুরীর ইচ্ছায় আবু নাছের চৌধুরীর বাড়িতে (পরবর্তী সময়ে এমপি ও গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন) খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। সবাই খেতে বসেছে। আমি নেতার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একমনে সুন্দর এই দিব্যকান্তি লোকটিকে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ তিনি মুখ তুলে বললেন, 'এই ছেলে তুমি খাচ্ছ না কেন?' আমি কিছু বলার আগেই আবু নাছের চৌধুরী বললেন, তারা ব্রাহ্মণ, বাইরে খায় না। নেতা বললেন, 'কী বলো? সে খাবে, তাকে খেতে দাও।' একটা প্লেটে ভাত এবং এক টুকরো মুরগির মাংস আমার হাতে কে যেন দিয়ে গেল। আমি বসে আছি, তিনি আবারও বললেন খাও, খাও। আমি খেয়ে নিলাম, সে এক নতুন এবং দারুণ অভিজ্ঞতা। এরপর দক্ষিণ বাজারে এক সভা হলো।

১৯৬৬ সাল। উত্তাল হয়ে উঠল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান। ছয় দফা পেশ হলো। আন্দোলন ক্রমেই তুঙ্গে। ছাত্র আর শ্রমিকরাই ছিল আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করল। ১৯৬৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর 'ডাক'-এর আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লা খানের ডাকে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। আন্দোলন বেগবান হয়। ছাত্রসমাজের ১১ দফা প্রণীত হয়। '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দিশেহারা হয়ে পদত্যাগ করেন। তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সামরিক বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে। আবারও মার্শাল ল' জারি হলো। অনেকের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হলো। সরকারের কোনো কৌশলই আন্দোলন থামাতে পারল না। আমি তখন নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব রাজবন্দি মুক্তি পান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হলো। শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নির্বাচনের তারিখ হলো। এলএফও'র অধীনে নির্বাচন হলো। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। ক্ষমতা আটকে রইল পাকিস্তানিদের হাতে। এলো মার্চ, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনীতিকদের ষড়যন্ত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর হলো না। আমরা রাজপথ দখল করে নিলাম। ৭ মার্চ আওয়ামী লীগ সভা ডাকল রেসকোর্স ময়দানে। আমি তখন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি এসএম ইউছুফ ও সাধারণ সম্পাদক সাবের আহমেদ আসগরীর নেতৃত্বে আমরা ঢাকা এলাম। মিটিংয়ে এসে দেখি জনসমুদ্র। বঙ্গবন্ধু এলেন। মঞ্চে উঠে হাত নেড়ে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন। বক্তৃতা দিলেন– বজ্রকণ্ঠে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা করে আমাদের করণীয় জানিয়ে দিলেন। মিটিং শেষ হলো। মুহুর্মুহু স্লোগানে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হতে লাগল। আমরা সে রাতেই চট্টগ্রাম চলে এলাম।

ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনায় বসল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে একটি দল। কালক্ষেপণ চলছে। ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানের বর্বর সামরিক জান্তা। বঙ্গবন্ধুর পাঠানো স্বাধীনতার তারবার্তা চট্টগ্রামে প্রথম হান্নান ভাই জানানোর পর সমগ্র চট্টগ্রাম জেগে উঠল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কারফিউ জারি করল। ২৭ মার্চ ২ ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল হলে লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটতে লাগল। আমি ২৮ মার্চ বের হয়ে নোয়াখালীর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। পথে আমার সঙ্গে অনেককেই সাথী হিসেবে পেলাম। বারআওলিয়া, বাড়বকুণ্ড আসার পর শ্রমিকদের ঢল নামল। রাস্তা ছেড়ে আমরা কর্ণফুলী নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে চললাম। একদিন পর বাড়ি পৌঁছলাম। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম কমিটি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে এপ্রিলের ২৯/৩০ তারিখে ২০-২৫ জনের রাজাকার বাহিনী বসুরহাট বাজারে অবস্থান নিলে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাই। মে মাসের মাঝামাঝি মহিউদ্দিন ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসা মেরিন একাডেমির ক্যাডেট আমাদের শ্রদ্ধেয় আনোয়ার বিএসসি স্যারের কনিষ্ঠ ভাই আজাদকে রাজাকাররা গুলি করে মেরে তাদের অবস্থান এবং করণীয় জানান দিল।

ইতোমধ্যে আমাদের একটি দল ভারত চলে গেল। হঠাৎ আমরা খবর পেলাম অতি দ্রুত বর্ডার পার হয়ে ভারতে যেতে হবে। আমরা ১৮-২০ জনের একটি দল রওয়ানা হলাম। সেবারহাট, সিন্দুরপুর বাজার হয়ে আমরা সন্ধ্যায় বর্ডারে পৌঁছলাম। চোত্তাখোলায় এমপি আবু নাছের চৌধুরী আমাদের স্বাগত জানালেন। আমাদের বলা হলো, পরের দিন একিমপুর থানায় গিয়ে নাম লিখিয়ে আসতে হবে। গ্রামের বাজার কিছুই নেই। মুড়ি-বিস্কুট-চা খেয়ে আমরা রাত কাটালাম। পরের দিন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির মধ্যে আমরা পিচ্ছিল পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে একিমপুর গেলাম। নাম-ঠিকানা লিখে আবার রওয়ানা হলাম। এবার আমাদের যেতে হবে রাজনগর। বিকেল হয়ে গেল। আমরা পৌঁছলাম রাজনগর ইয়ুথ ক্যাম্পে। সেখানে দেখি কয়েক শ যুবক অবস্থান করছেন নীল পলিথিনে ঢাকা ক্যাম্পে।

আমাদের বহু পরিচিত লোককে দেখতে পেলাম। পরদিন সকালে দেখা পেলাম মোস্তাফিজ ভাইকে (মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও পরে এমপি হয়েছিলেন)। তাঁর নির্দেশে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হলো। যথাসময়ে তিনি আমাদের মধ্য থেকে চারটি দল করে চারটি ট্রেনিং সেন্টারে পাঠালেন। যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে যাব, তাই ভিন্ন ভিন্ন ট্রাকে উঠলাম। আমরা সন্ধ্যায় আগরতলা গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের থাকার জায়গা হলো এমবিবি কলেজে। একদিন পর আমাদের যাত্রা, তাই একদিন ছুটি। আমরা সবাই ঘুরতে বের হলাম। গোলবাজার আসার পর প্রথমে দেখা হলো শ্রমিকনেতা ছায়েদুল হক ছাদু ভাইয়ের সঙ্গে, পরে দেখলাম রব ভাই ও মাখন ভাই এদিকে আসছেন। তাদের সালাম দেওয়ার পর তারা জানতে চাইলেন মনি ভাইকে দেখেছি কি না? না বলায় আমাদেরকে তাঁদের সঙ্গে যেতে বললেন। তাঁরা একটা বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়ির সামনে লেখা আছে 'শ্রীধর ভিলা'। (এই শ্রীধর ভিলাই ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-যুবসমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু) এই শ্রীধর ভিলায় এসে প্রথমে জানলাম মুক্তিযোদ্ধাদের দুইটি ভাগ আছে। একটি হলো এফএফ আরেকটি হলো বিএলএফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (পরবর্তীকালে মুজিব বাহিনী)। ট্রেনিং শেষ হলে যথাসময়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ফিরে আসেন। ২নং সেক্টরের আওতাধীন এই সেক্টরের অধীনস্থ সবাইকে উদয়পুরে এসে একটি ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করতে হতো অস্ত্র নেওয়ার জন্য। উদয়পুর থানায় গিয়ে একটি ফরম পূরণ করে পুনরায় রাজনগর ইয়ুথ ক্যাম্প হয়ে চোত্তাখোলায় মিলিত হলাম। আমাদের সঙ্গে আরও দুটি দল ছিল। একটি দল যাবে কুমিল্লার লাকসাম আর অন্যটি শাহরাস্তি।

আমরা বিএসএফ ক্যাম্পে রাতের খাবার খেয়ে গভীর রাতে ভারতীয় সীমান্ত পার হই। তখন পুরোপুরি বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। আমরা গুণবতীর কাছাকাছি গেলে খবর পেলাম রাস্তা ক্লিয়ার নেই। সারারাত অস্ত্র মাথায় নিয়ে ধানক্ষেতে বুকসমান পানিতে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক আজানের সময় ওপি (অবজারভিং পার্টি) এসে বলল, পুরো রাস্তাই রেকি করেছি। এখনই

রেললাইন পার হতে হবে। আমরা সাবধানে রেললাইন ক্রস করে সাতপাড়া গ্রামে একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিই। যার বাড়িতে আশ্রয় নিলাম, তার আতিথেয়তা যতদিন বেঁচে থাকব, কখনো ভুলব না। মাসকলাই ডাল আর পুকুর থেকে ধরা মাছ দিয়ে আমাদের এত লোককে খাওয়ালেন। এই লোকটা এবং তাঁর পরিবারের দরদ দেখে মনে হলো, আমাদের দেশের স্বাধীনতা কেউ আর আটকাতে পারবে না।

সন্ধ্যার পর আমরা কোম্পানীগঞ্জের পথে যখন রওয়ানা হলাম, তখন আমাদের ওপি এসে জানাল রাস্তায় কারফিউ চলছে। মুক্ত এলাকায় কারফিউ শুনে আমরা অতি সন্তর্পণে এগোতে থাকলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর জানতে পারলাম সেনবাগ থানায় এই অঞ্চলের শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ফেনী চৌমুহনী ট্রাঙ্ক রোডের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে যোগ দেই। কোথাও শত্রুপক্ষের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো না। আমরা কল্যাণদি বাজারের পশ্চিম পাশ দিয়ে রাস্তা ক্রস করে কোম্পানীগঞ্জ এবং সুধারাম থানার মাঝামাঝি বাটইয়া নামক একটি জায়গায় এলাম। সেখানে এসে দেখি, আরও দুটি দল অবস্থান করছিল। আমরা বরদা পিয়নের বাড়িতে উঠলাম। এই বাড়ি থেকেই পরবর্তী সময়ে আমরা বেশির ভাগ অপারেশন চালিয়েছি। 'বিএলএফ'-এর নেতৃত্বে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক আর এফএফ-এর নেতৃত্বে ছিলেন নূরনবী কমান্ডার। সেপ্টেম্বরে বিএলএফ-এর জোনাল কমান্ডার হিসেবে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ওবায়দুল কাদের।

আমরা যোগ দেওয়ার আগে আগস্টে কিছু সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান, মুক্তিযোদ্ধা শহীদ উল্ল্যাহ ও ক্যাপ্টেন অমল নাগের নেতৃত্বে কোম্পানীগঞ্জ থানায় আক্রমণ হয়। এই আক্রমণে পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও রাজাকারদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই রাজাকাররা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা ডা. নগেন্দ্র কুমার কর্মকারের বাড়িতে হানা দিয়ে তার অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কৈলাস কর্মকার এবং তার স্ত্রী সরমা কর্মকারকে হত্যা করে। এর দুদিন পর আমাদের বাড়িতে এসে আমার বাবা হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তীকে হত্যা করে এবং বাড়ির অন্য সদস্যের ওপর নির্যাতন ও লুটপাট করে। এদিকে ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরেই আমার বড়ো ভাই পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় কর্মরত শিবসাধন চক্রবর্তীকে রমনা কালীমন্দির চত্বরে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা। তারা শচীন্দ্র ভূল্যাই, সতিশ ধুপিসহ বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে। এভাবে পুরো থানা এলাকায় হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। আমাদের তরফ থেকে পরপর কয়েকটি অপারেশন চালানোর পর রাজাকাররা কোণঠাসা হয়ে যায়। ফলে থানার বেশির ভাগ অংশই মুক্ত থাকে। এ সময় আমরা বিভিন্ন রাজাকার ক্যাম্পে অপারেশন চালাচ্ছিলাম। বামনী রাজাকার ক্যাম্প অপারেশন করতে গিয়ে আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হই। বামনীতে যে রাজাকার ক্যাম্প ছিল, সেখান থেকে তারা প্রায়ই গ্রামে বেরিয়ে লুটপাট করত। অক্টোবরের শেষ নাগাদ বিএলএফ জোনাল কমান্ডার ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বামনী রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমাদের কয়েকজন শাহাদতবরণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা নাছের গুরুতর আহত হন।

১৬নং স্লুইস গেটের পাশেই শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাহিত করা হয়। এরপর আমরা পুরো নভেম্বর রাজাকার-পাক মিলিশিয়া ক্যাম্পগুলোয় অপারেশন চালিয়ে যাই এবং তাদের কোণঠাসা করে রাখি। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে আমাদের কাছে খবর আসতে লাগল, দ্রুতই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। মনে হয়, পাকিস্তানি দোসররা আগেই টের পেয়ে গেছে। তাই তারা ক্যাম্প থেকে খুব কম বেরুতে লাগল। চারদিকে লুটপাটও কম হতে লাগল। আমরাও ক্রমান্বয়ে থানার বেশির ভাগ এলাকা মুক্ত করলাম।

ডিসেম্বর শুরু হতেই মনে হলো পুরো এলাকায় আনন্দের জোয়ার বইছে। সর্বত্র বলাবলি হতে লাগল, ভারত-রাশিয়া আমাদের স্বাধীনতার জন্য সারা বিশ্বে কাজ করছে। এদিকে ৩ ডিসেম্বর ভুটান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল। আমরা আরও উজ্জীবিত হলাম। প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম থানা আক্রমণ করার জন্য। ৬ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যুদ্ধ বেধে যায়। আমরা ৭ ডিসেম্বর থানা মুক্ত করলাম। রাজাকার ও পাকিস্তানি মিলিশিয়াদের আটক করলাম। যুদ্ধের অবসান ঘটে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। পুরো এলাকা জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল। আমরা সব মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তী নির্দেশের জন্য থানায় অবস্থান নিলাম।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, স্থায়ী সদস্য, জাতীয় প্রেস ক্লাব

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

আমার মুক্তিযুদ্ধ

মোহাম্মদ শাহজাহান

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি ছিলাম মুজিব বাহিনী 'বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' (বিএলএফ)-এর দাউদকান্দি থানার কমান্ডার। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসিতে (রসায়ন শাস্ত্র) পড়ি। মাত্র কদিন আগে প্রথমবর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। থাকতাম ফজলুল হক হলের ৩০১ নম্বর রুমে। পাশে ব্যালকনি রুমে থাকতেন তৎকালীন ডাকসুর জিএস, স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন। একই দলের ও জেলার মানুষ এবং পাশের রুমের ছাত্র হিসেবে মাখন ভাইয়ের সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়ে যায়। সত্তরের নির্বাচনে দাউদকান্দি-হোমনা নির্বাচনি এলাকায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী খন্দকার মোশতাক আহমদ (বাংলার দ্বিতীয় মীরজাফর) এবং প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ারের সব নির্বাচনি জনসভা আমি পরিচালনা করেছি। সেই সুবাদে মাত্র ২৩-২৪ বছর বয়সে সমগ্র দাউদকান্দিতে আমার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২টায় অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পূর্ব বাংলার সেনানিবাসগুলো থেকে বের হয়ে বাংলার নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে থাকে। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা আওয়ামী লীগ সভাপতি বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাত দেড়টায় গ্রেফতার হওয়ার আগে ওয়্যারলেস মেসেজের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন– 'আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন।' বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতা ঘোষণা' আমাদের বাড়ির পাশে শহীদনগরের ওয়্যারলেস সেন্টারেও এসেছিল। ২৬ বা ২৭ মার্চ আমাদের এলাকার মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলী এ খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন।

আমি ছাত্রাবস্থা থেকেই নিয়মিত সকাল-বিকাল বিবিসির নিউজ শুনতাম। স্বাধীনতার ৯ মাসে বিবিসিই ছিল বাংলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধের খবর শোনার অন্যতম নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দাউদকান্দি থানা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ উদ্দিন চৌধুরী, আমি ও শওকত আলী দাউদকান্দির বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য উজ্জীবিত করি। সারা বাংলায় তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার। এপ্রিলেই থানায় থানায় আর্মি চলে আসে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও

সমর্থকদের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দিতে থাকে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মী এবং যুবকদের ধরে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন চালায়। এপ্রিলে দাউদকান্দিতে সেনাবাহিনী আসে। একদিন রোববার হাটের দিন গৌরীপুর বাজারে আর্মি যায়। হাজার হাজার ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ বাজারসদাই না করে তাদের দোকানের মালামাল ফেলে দৌড়ে পালায় বাজার ছেড়ে। ওইদিন বাজারের লাখ লাখ টাকার মালামাল নষ্ট হয়।

এপ্রিলে কুমিল্লা থেকে দীপক নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা লিফলেট ও অন্যান্য প্রচারপত্র নিয়ে আসে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা কুমিল্লার কৃতীসন্তান সৈয়দ রেজাউর রহমান (রেজা ভাই) আগরতলা থেকে দীপকসহ আরও অনেকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কাগজপত্র বিভিন্ন থানায় পাঠান। ফরহাদ চৌধুরী এপ্রিলে একবার ভারতে গিয়ে কিছুদিন পর ফিরে আসেন। তাঁর কাছে ওপারে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণ তৎপরতার কথা শুনি। আমিও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কাপড়চোপড় নেওয়ার জন্য একটি কালো কাপড়ের নতুন ব্যাগ বানাই। আশঙ্কা ছিল, যে কোনোদিন আমাদের বাড়িতে আমার খোঁজে আর্মি আসবে। পাকা সড়ক থেকে দেড় মাইল দূরে আমাদের বাড়ি। পাকিস্তানি আর্মির হাতে আটক এড়াতে ফরহাদ ভাই আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। আমাদের পাশের খ্যাতিমান সিরাজ মীরের বাড়িতে শিল্পপতি ফজলু মুনশীর পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নেন। জুনের শুরুতে একদিন সকাল ১০টার দিকে শুনলাম আমাদের গ্রামের দিকে আর্মি আসছে। আমরা দৌড়ে পাশের মোহাম্মদপুর গ্রামে চলে গেলাম। ভাবলাম, ওই গ্রাম থেকে আমাদের বাড়ি পোড়া দেখব। আর্মি প্রথমদিন এমএনএ খন্দকার মোশতাক, এমপিএ রশীদ ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের নূরপুর গ্রাম, পাশের লালপুরে শওকত আলীর বাড়ি এবং খলিলবাদ গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আউয়াল ভাইয়ের বাড়িতে হানা দেয়। ওরা রশীদ ভাই, আউয়াল ভাই ও শওকত আলীর বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়। অলৌকিকভাবে পোড়া থেকে আমাদের বাড়ি সেদিন রক্ষা পায়। আর্মি প্রথমে সিরাজ মীরের বাড়িতে যায়। মুনশীবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে সেদিন ওই বাড়িতে বিমানবাহিনীতে চাকরিরত সাবেক এক পদস্থ কর্মকর্তার স্ত্রী রোকেয়া আব্বাস উপস্থিত ছিলেন। ওই সেনা সদস্যদের সঙ্গে মিসেস আব্বাসের কয়েকদিন আগে পরিচয় হয়েছিল। রোকেয়া আব্বাস এবং গ্রামের মুরুব্বি সিরাজ মীর আমাদের বাড়ি না পোড়াতে সেনা সদস্যদের অনুরোধ করেন। সিরাজ মীর চাচা ওদেরকে বলেন, 'আওয়ামী লীগ করার কারণে বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। বাড়িঘরের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' আমাদের বাড়ির চারপাশে তখন বর্ষার পানি এসে গেছে। তবুও কয়েকজন সেনা সদস্য রমিজ কাকার নৌকা দিয়ে আমাদের বাড়িতে যায়।

আমাদের বৈঠকঘরে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমার তৈরি ব্যাগে মুক্তিযুদ্ধের প্রচারপত্র ছিল। ভাগ্যক্রমে ওরা ব্যাগের ভেতরের কাগজপত্র চেক করে দেখেনি। নৌকার মাঝি রমিজ কাকার কাছে পরে শুনেছি, নৌকায় আমাদের বাড়িতে আসার সময় সেনা সদস্যরা বলাবলি করছিল– 'আগ লাগায় দেয়গা।'

জুনের মাঝামাঝি একদিন ভারতে যাওয়ার জন্য বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার ২-৩ বছরের ছোটো পাশের গ্রামের শওকত আলী ভারতে যাওয়ার পথঘাট সম্পর্কে জেনে নেয়। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে মা-বাবার কাছে বলে বাড়ি ছাড়ি। চাচা ও আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। আমি পরিবারের বড়ো সন্তান। অর্ধশতাব্দী আগের বাড়ি ছাড়ার সেই দৃশ্য আমার স্মৃতিতে এখনো জ্বলজ্বল করে। তখনও শোয়ার ঘরের ঘুমানোর বিছানা ওঠানো হয়নি। মাকে সালাম করে বের হই। আমার চাচা আস্কর আলী আমাকে ৫০ টাকার একটি নোট দিলেন। বসন্ত হয়ে ৬-৭ বছর বয়সে চাচার দুচোখ অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান এই চাচার কাছেই আমাদের ধানের ব্যবসার তহবিল থাকত। ওই অজানার পথে বের হওয়ার সময় আমি ও মা খুবই স্বাভাবিক ছিলাম। বিদায়বেলায় মায়ের চোখের পানি যাতে দেখতে না হয়, এজন্য মুহূর্তের মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে নৌকায় উঠি। সঙ্গে শওকত আলী ও নজরুল ইসলাম নামে একজন ছাত্র ছিল। আমার ও শওকতের চেয়ে বয়সে ছোটো নজরুলের বাবা ছিলেন তহশিলদার।

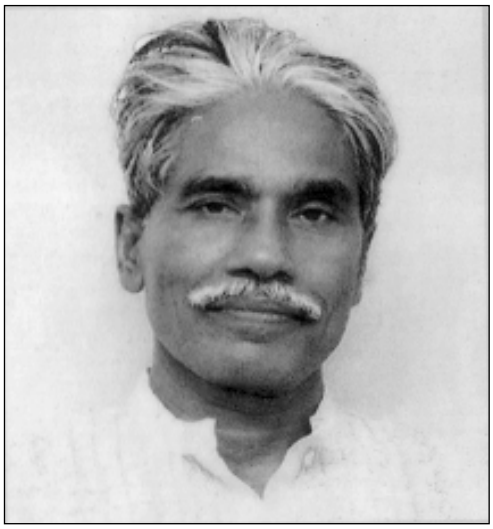

মোহাম্মদ শাহজাহান

মুক্তিযোদ্ধারা দেবিদ্বার থানার মাসিগারা দিয়ে ভারতে যেত। সারাদিন হেঁটে রাত নেমে এলে এক বাড়িতে যাত্রাবিরতি করি। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সেদিন এক মা পরম স্নেহ-মমতায় আমাদের রাতের খাবার খাওয়ান। ওই দরদি মায়ের কথা আজও ভুলতে পারিনি। একাত্তরের নয় মাসে বাংলার প্রতিটি গ্রামে মা-বোনরা মুক্তিযোদ্ধাদের পরম আদরে আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলার মানুষ মনে করত আল্লাহ প্রেরিত দেবদূতের মতো। মাছ যেভাবে পানিতে থাকে, তেমনিভাবে পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী রাজাকার-আলশামসদের অপতৎপরতার মধ্যেও সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের মতো আশ্রয় দিয়েছেন।

সূর্য ডোবার পর রাতের প্রথম প্রহরে নৌকা দিয়ে একটি ছোটো নদী পার হয়েছিলাম। হাজারও মুক্তিযোদ্ধা এই গুদারাঘাট দিয়েই আসা-যাওয়া করতেন। রাজাকাররা কোনো কোনো সময় ওত পেতে বসে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে যেত। তুলনামূলকভাবে শওকত ও নজরুল দুজনই আমার চেয়ে বেশি সাহসী। ফেরি পার হওয়ার আগে সেই অন্ধকার রাতে একটু দূরে আমাকে ও নজরুলকে রেখে শওকত অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই ফেরিঘাটে যায়। উদ্দেশ্য, রাজাকাররা সেখানে আছে কি না দেখা।

সারাদিন হাঁটাহাঁটির পর রাতে ওই মায়ের আদরের খাবার খেয়ে বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুম নেমে আসে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার শুরু হয় পদযাত্রা। মোটামুটি রোদের উত্তাপ ভালোই ছিল। কিছুক্ষণ হেঁটে জিজ্ঞাসা করতাম, দুদেশের সীমান্ত কতদূর। উত্তরে বলা হতো– আর কিছুদূর। সেই কিছুদূর যেন আর শেষ হয় না! সম্ভবত শেষ বিকেলের দিকে আমরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করি।

সারাদিন আমরা শুধু হেঁটেছি আর হেঁটেছি। মনে পড়ে, যাওয়ার পথে বেশ কয়েকবার জামগাছে উঠে পেট ভরে পাকা জাম খেয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিনে সীমান্তের এপারে-ওপারে সারাদিন যে কত মাইল রাস্তা হেঁটেছি, তা বলে শেষ করা যাবে না। রাতে সম্ভবত কংশনগরে আমরা ছিলাম। পরদিন আগরতলা গিয়ে দেখা হয় রেজা ভাইয়ের সঙ্গে। ১৯৬৫ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তখনকার শীর্ষ ছাত্রনেতা রেজা ভাই, রউফ ভাই ও আফজল ভাইয়ের মতো নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই। আগরতলায় দেখা হওয়ার পর রেজা ভাই এক-দুদিনের মাথায় প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে দেন। গত অর্ধশতাব্দী ধরেই রেজা ভাইয়ের স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা পেয়েছি। রেজা ভাই ছিলেন বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা মুজিব বাহিনীর প্রধান। কুমিল্লা জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করার দায়িত্বে ছিলেন রেজা ভাই। আগরতলা গিয়ে শওকত ও নজরুলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ওরা মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে গিয়ে ট্রেনিং নেয়। আমাদের পাঠানো হয় আসামের হাফলংয়ে। আমাদের টিমে ৩০ জন ছিলেন। আমি ছিলাম কমান্ডার আর সহ-অধিনায়কের নাম ছিল নজরুল ইসলাম। একটি বড়ো ট্রাকে খুব ভোরে আগরতলা থেকে আমরা রওয়ানা হই। আসামের হাফলং পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যায়। রাস্তা ছিল বেশ উঁচু-নিচু ও আঁকাবাঁকা। মনে আছে, যাত্রাপথে আমি ছাড়া টিমের প্রায় সবাই বমি করে। ওখানে ছয় সপ্তাহের মতো আমাদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই সময় আমরা অস্ত্র চালনা এবং গ্রেনেড নিক্ষেপ শিখি। ট্রেনিংয়ের সময় জঙ্গলে বড়ো বড়ো মশা শরীরে বসত। প্রশিক্ষকের ভয়ে নড়াচড়া করা যেত না। এ সময় আমার প্রচণ্ড জ্বর হয়। আগস্টের মাঝামাঝি আমাদের ট্রেনিং শেষ হয়। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ব্যারাকের বাইরে একটি অনুষ্ঠানে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় উপলব্ধি করলাম, আমি পড়ে যাচ্ছি। পাশের একজনকে বললে সে আমাকে ধরে ব্যারাকে নিয়ে আসে। লম্বালম্বি বিশাল ব্যারাকে আমি

তখন একা। অন্যরা অনুষ্ঠানস্থলে। মুখমণ্ডলসহ আমার পুরো শরীর ভারী কম্বলে ঢাকা। জ্বরকাতর দুর্বল শরীরে মনে পড়ল– মা, বাবা, ভাই, বোনসহ স্বজনদের কথা। আমার দুচোখ দিয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সেই স্মৃতি কোনোদিন ভুলার নয়।

ট্রেনিং শেষে আগরতলা ফিরে এলে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্রিফিং দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় পাঠানো হলো। আমার দেশে ফিরতে বিলম্ব হয়। ওই সময় প্রতিদিন আমি ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে দাউদকান্দির মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করে ওদের এবং এলাকার খোঁজখবর নিতাম। এদের মধ্যে বাছাই করে বেশ কয়েকজনকে রেজা ভাইয়ের মাধ্যমে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিংয়ে পাঠাই। দাউদকান্দির মুজিব বাহিনীর কমান্ডার নজরুল ইসলাম ছিলেন খুবই কর্মঠ, সাহসী এবং অসাধারণ রাজনৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন দেশমাতৃকার একজন বীর সন্তান। ১৯৭১-এর ২৭ অক্টোবর রমজান মাসে নজরুলসহ ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক রাজাকারের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েন। পাকিস্তানি আর্মির হাতে আটক মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম জেল থেকে পালানোর সুযোগ পেয়েও পালাননি। তিনি বলেছিলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা পালাতে শেখেনি। মুক্তিযোদ্ধারা একদিন ফুলের মালা দিয়ে এখান থেকে আমাদের বরণ করে নিয়ে যাবে।'

নজরুল আরও বলেছেন, 'যখন কোনো পাকিস্তান আর্মি দেখবি, একটা করে মাথায় গুলি করবি।' ঈদের দিন গভীর রাতে পৈরতলা খালপাড়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে নজরুলসহ ৩৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। শহিদদের লাশ ফেলে দেওয়া হয় পৈরতলা খালে। সেখানে ইটের গাঁথুনি দিয়ে যেনতেনভাবে একটি স্মৃতিচিহ্ন থাকলেও স্থানটি এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সরকার এখন ক্ষমতায়। শহিদদের স্মৃতিবিজড়িত ওই স্থানসহ সারা বাংলায় মুক্তিযোদ্ধারা যেখানে শহিদ হয়েছেন, সেখানেই শহিদ মিনার নির্মাণ করে শহিদদের নাম লিখে রাখা উচিত। নজরুলের বাবার কাছে শুনেছি, কথা আদায় করার জন্য তাঁকে এত নির্যাতন করা হয়েছিল যে, নজরুলের শরীরে কোনো মাংস ছিল না। আমি ও শওকত নজরুলের বাবা আজিজ সরকার যতদিন জীবিত ছিলেন দেখা হলে তাঁকে বাবা ডাকতাম আর নজরুলের মাকে ডাকতাম মা। মাত্র কিছুদিন আগে একাত্তরের যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শফিউল বশর ভাণ্ডারী ইন্তেকাল করেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে নজরুলের নামে একটি কলেজের নামকরণ করা হলেও দাউদকান্দিতে এই বীর শহিদসহ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে কিছু একটা করা উচিত। মুক্তিযোদ্ধাদের নামে দাউদকান্দির বিভিন্ন রাস্তার নামকরণ হতে পারে।

নজরুল গ্রেফতার হলে তাঁর জায়গায় আমাকে অধিনায়ক করে দাউদকান্দিতে পাঠানো হয়। ওই বছরও আমি সব রোজা রেখেছিলাম। রোজার সময় বর্ডার ক্রস করে দেশে ফেরার পথে কাঁধে রাইফেল, গুলিসহ কাপড়চোপড় এবং ভারতে কেনা বেশকিছু বইয়ের একটি প্যাকেট আমার সঙ্গে ছিল। বই কেনা আমার চিরায়ত অভ্যাস। আসার সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়। আমার শরীর ছিল খুবই দুর্বল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পড়ে যাচ্ছি। ভোরে বর্ডার ক্রস করি। আমার ট্রুপসের সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভিটিকান্দি ইউনিয়নে মিলিত হই।

> পাকিস্তানি আর্মির হাতে আটক মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম জেল থেকে পালানোর সুযোগ পেয়েও পালাননি। তিনি বলেছিলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা পালাতে শেখেনি। মুক্তিযোদ্ধারা একদিন ফুলের মালা দিয়ে এখান থেকে আমাদের বরণ করে নিয়ে যাবে'

একাত্তরে ২০ নভেম্বর দাউদকান্দির গোয়ালমারী-জামালকান্দিতে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই হয়। ১৭ ঘণ্টার এই যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজিত হয়। যুদ্ধে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মতলবের কৃতীসন্তান এমএ ওয়াদুদ যুদ্ধে বুলেটবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দক্ষিণ গাজীপুরের রুহুল আমিন সরকার, ঝাউতলীর মোশতাক আহমদ, সুন্দলপুরের মজিবুর রহমান, রফারদিয়ার নুরুল ইসলাম, কামারকান্দির গিয়াসউদ্দিন, সোনাকান্দার আবদুস সাত্তার এবং গোয়ালমারী বাজারের ইনসার পাগলী শহীদ এবং ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। গ্রামবাসীর মধ্যে শহিদ হন জামালকান্দির আছিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার ও তাঁর মেয়ে রেজিয়া খাতুন, ছাইদুর রহমান, আবদুর রহমান, লামছরি গ্রামের হুমায়ুন কবির, সোনাকান্দার শহিদ উল্লাহ ও মোল্লাকান্দির জুলফিকার আহমদ।

একাত্তরের ৯ ডিসেম্বর দাউদকান্দি এবং ৮ ডিসেম্বর কুমিল্লা শহর মুক্ত হয়। ডিসেম্বরের প্রথমদিকেই বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা পালাতে শুরু করে। ৮ ডিসেম্বর রাতে আমাদের ট্রুপস পাকা সড়কের কাছে ছিল। ওই রাতে জিংলাতলী গ্রামে এক বাড়িতে আমরা খাবার খাই। দুপুর হওয়ার আগেই পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লা থেকে দাউদকান্দির দিকে পালিয়ে আসতে থাকে। পাকিস্তানিদের পেছনে ট্যাঙ্কসহ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ছিল। বিকেল ৩টার দিকে ঢাকা-কুমিল্লা সড়কে রায়পুর ও গৌরীপুরের মাঝপথে আমাদের ট্রুপস মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। অন্য মুক্তিযোদ্ধাসহ হাজারও মানুষ রাজপথে নেমে আসেন। পাকিস্তানিদের পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য জীবনে কোনোদিন ভুলব না। শহীদনগরের কাছে পাকিস্তানিদের সমর্থক তমিজ ডাক্তারের বাড়িতে জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়। আমি আগুন দিতে নিরুৎসাহিত করি। জনতাকে বললাম, বাড়িঘর আগুনে না পুড়িয়ে এই বাড়ির মালামাল আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। এ কথায় কাজ হলো। আগুন নিভে গেল। লুটপাট থামাতে চেষ্টা করি। এরপর মোহাম্মদপুরে ওহাব চেয়ারম্যানের বাড়িতে জনতা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পড়ন্ত বেলায় সূর্য ডোবার আগে পাকিস্তানিরা লঞ্চযোগে দাউদকান্দি থেকে চলে গেল। বাজারে ঢোকার আগে আরেক রাজাকারের বাড়ি পুড়তে দেখলাম। একই সঙ্গে কাজীবাড়ির সামনের পাকা সড়কে বহু মানুষকে ওই বাড়ির মালিককে মারতে দেখি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান। বাজারে শচীন্দ্র ঘোষের মিষ্টির দোকানের সামনে একটু পশ্চিমদিকে তুজারভাঙ্গার এক সাবেক সেনা সদস্যের লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। তার পেটে গুলির চিহ্ন ছিল। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেশে কার্যত কোনো সরকার ছিল না। ৯ ডিসেম্বরের পর থেকে বাংলাদেশ সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি আরও মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে সমগ্র দাউদকান্দির শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। মনে আছে, এই উপলক্ষ্যে শহীদনগর প্রাইমারি স্কুলের সামনে একটি বড়ো জনসভা করেছিলাম।

মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরুতে এলাকার যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, আগরতলায় অবস্থান, হাফলংয়ে প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ আমার জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বল্প পরিসরে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি তুলে ধরা সম্ভব নয়– এখানে কিঞ্চিৎ স্মৃতিচারণ করলাম মাত্র।

বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব তিনি বাংলার জনগণকে তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। ১২শ মাইল দূরে পাকিস্তান কারাগারে বন্দি থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এমন অনুপস্থিত সেনাপতির সেনাপতিত্ব ইতিহাসে বিরল। মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা এবং জনগণ সম্মিলিতভাবেই দেশ স্বাধীন করেছেন। কারও চেয়ে কারও কৃতিত্ব কম নয়। ভারতের জনগণ এবং সেনাবাহিনী (মিত্রবাহিনী), সেদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। সবশেষে শহিদ ও জীবিত সব মুক্তিযোদ্ধা, দেশের জনগণ, মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মুক্তির মহানায়ক, জাতির পিতা, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা

একাত্তরের 'জাগ্রত বাংলা'

এসএ কালাম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখালেন। উত্তাল জনসমুদ্রে ঘোষণা করলেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে? রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব, এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন– বাংলাদেশে গণহত্যাই বাঙালিদের শায়েস্তা করার একমাত্র পথ। কারণ শেখ মুজিবুরের কাছে স্বাধীনতার বিকল্প আর কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলার উত্তাল জনতা ভিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরির মতো এখন উত্তাল। কোনো যুক্তিই এখন আর তাদের রুখতে পারবে না। তাই জ্যাকসনের মতো অভিজ্ঞ গণহত্যার নীলনকশা প্রস্তুতকারীকে দিয়ে তৈরি করল অপারেশন সার্চলাইট। বাঙালি নিধনযজ্ঞ। সহায়তাকারী– সিআইএ বিশ্লেষক ও হ্যারল্ড স্যান্ডার্স জোসেফ শিসকো, যিনি নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবং উইলিয়াম ফার্গো। জ্যাকসনের ছিল পূর্ব-অভিজ্ঞতা ভিয়েতনাম-ব্রাজিলে হত্যা ও ধ্বংসের পরিকল্পনা সরবরাহের মাধ্যম। এরা একাত্তরে ঢাকাতেই অবস্থান করছিল। সামরিক জান্তার সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করেছিল।

২৫ মার্চ ১৯৭১। রাত প্রায় ১২টা। শুরু হলো গণহত্যা। বাঙালি নিধনযজ্ঞ। যদিও রাত ১টার সময় ঘুমন্ত মানুষকে মারার সিদ্ধান্ত হয়েছিল; কিন্তু প্রস্তুতি এমন নিখুঁত ছিল যে, ঘাতকরা ১১টার পরই বেরিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন ব্যারাক, ইপিআর ক্যাম্প, পুরান ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোয় একযোগে আক্রমণ চালায়। বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ হয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা রাস্তায় নামে। কামানের মুহুর্মুহু গর্জন, লাইট মেশিনগানের বিকট শব্দে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে। পুরান ঢাকার বহু বাড়িঘরে গান পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখায় আতঙ্কিত হয়ে যারা ছোটাছুটি করছিল, তারা মেশিনগানের ব্রাশফায়ারে প্রাণ দিল। যারা বের হতে পারেনি, তারা জীবন্ত পুড়ে মরল। রাজারবাগে পুলিশ এ আক্রমণ মোকাবিলা করার চেষ্টা করল,

যদিও তা সাময়িক সময়ের জন্য। সার্চলাইটের আলো ফেলে পুলিশদের খুঁজে বের করে হত্যা করল। যারা আত্মসমর্পণ করল, তারা আর ফিরে আসেনি। পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের আরেকটি লক্ষ্যবস্তু ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের ব্যারাক। পিলখানায় অবস্থিত এ ব্যারাকের একজন ইপিআর সদস্য যেন বাঁচতে না পারে– এরকমই নির্দেশ ছিল।

পাকিস্তানি সৈন্যদল প্রথমে ভারী গোলা মেরে বিল্ডিংগুলো গুঁড়িয়ে দিল। ট্যাঙ্ক, বাজুকা আর স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে আক্রমণ চালাল। এরপর বালুচ পাঞ্জাবি সৈন্যরা ভেতরে এগিয়ে গেল, যারা তখনও বেঁচে আছে, তাদের হত্যা করার জন্য। এক প্লাটুন পাঞ্জাবি এবং এক প্লাটুন বালুচ সৈন্য চারটি আমেরিকায় তৈরি ট্যাঙ্ককে অনুসরণ করে এসে দাঁড়াল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর সামনে। দুটি ছাত্রাবাসের সামনে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূর থেকে শুরু করল গোলাবর্ষণ। ছাত্রাবাসগুলো ছিল ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল। আর মেয়েদের হলগুলো ছিল বেগম রোকেয়া ও শামসুন নাহার হল। হলগুলো একেবারে ধ্বংস করে দিল। মাত্র ১৫ মিনিটে ১১০ জন ছাত্রের মৃতদেহ স্তূপ হয়ে গেল।

৩৫০ থেকে ৪০০ সৈন্য মেয়েদের হলগুলোতে আক্রমণ করে। মেয়েদের রুমে ঢুকে তাদের টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসে। তাদের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ফেলে দেয়। পাশবিক নির্যাতন চালায়। সৈন্যরা তাদের শয়তানের ক্ষুধা মিটিয়ে পরে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এমন অনেক মেয়ে রয়েছেন, যারা ধর্ষণের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। এ অবস্থায় ৫০ জন ছাত্রী ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

২৬ মার্চ ঢাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। চারিদিকে জীবন্ত মানুষের পোড়া গন্ধ। বাতাস ভারী করে তুলেছে। রাস্তায় কুকুর বীভৎস লাশ টানাটানি করছে। চারিদিকে বাড়িঘরে জ্বলছে আগুনের শিখা।

১ মার্চ থেকে মূলত সবকিছু চলছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে। স্কুল-কলেজ, শিল্পকারখানা বন্ধ। ৭ মার্চের ভাষণ এ আহ্বানে ঘি ঢেলে দিল, জ্বলে উঠল বাংলাদেশ।

দৌলার বাজারের বটতলায় বৈঠক বসল। আজাদ সংঘের মাঠে ক্রলিং করা বন্দুক হাতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ট্রেনিং চলছিল। সবাই একত্রিত হলাম। ঢাকার ধ্বংসযজ্ঞ রেডিও ইন্ডিয়া ও বিবিসির মাধ্যমে প্রচার হয়ে গেছে। এখন প্রতিশোধ নিতে হবে। সবাই শপথ নিল– হয় মরব, নয়তো হানাদারদের উপযুক্ত জবাব দেব। আমাদের অস্ত্র চাই– অস্ত্র। শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। নানা মিথ্যা প্রচারণা চালাল রেডিও পাকিস্তান। প্রচারণার জবাব দিতে হবে। তাই বুলেটিন চাই। কিছু নেই, কাগজকলম আছে তো। আমাকে সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। বের করা হলো জাগ্রত বাংলা পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় বাংলাদেশের সবুজ জমিনে লাল রক্তের গোলকের হলুদ মানচিত্র। শত শত সংখ্যা প্রচার হতে থাকে বাংলাদেশের মানচিত্র।

ইপিআরের ফেলে যাওয়া রাইফেল নিয়ে দল গঠন করল আফসার বাহিনী। আমরাও যোগদান

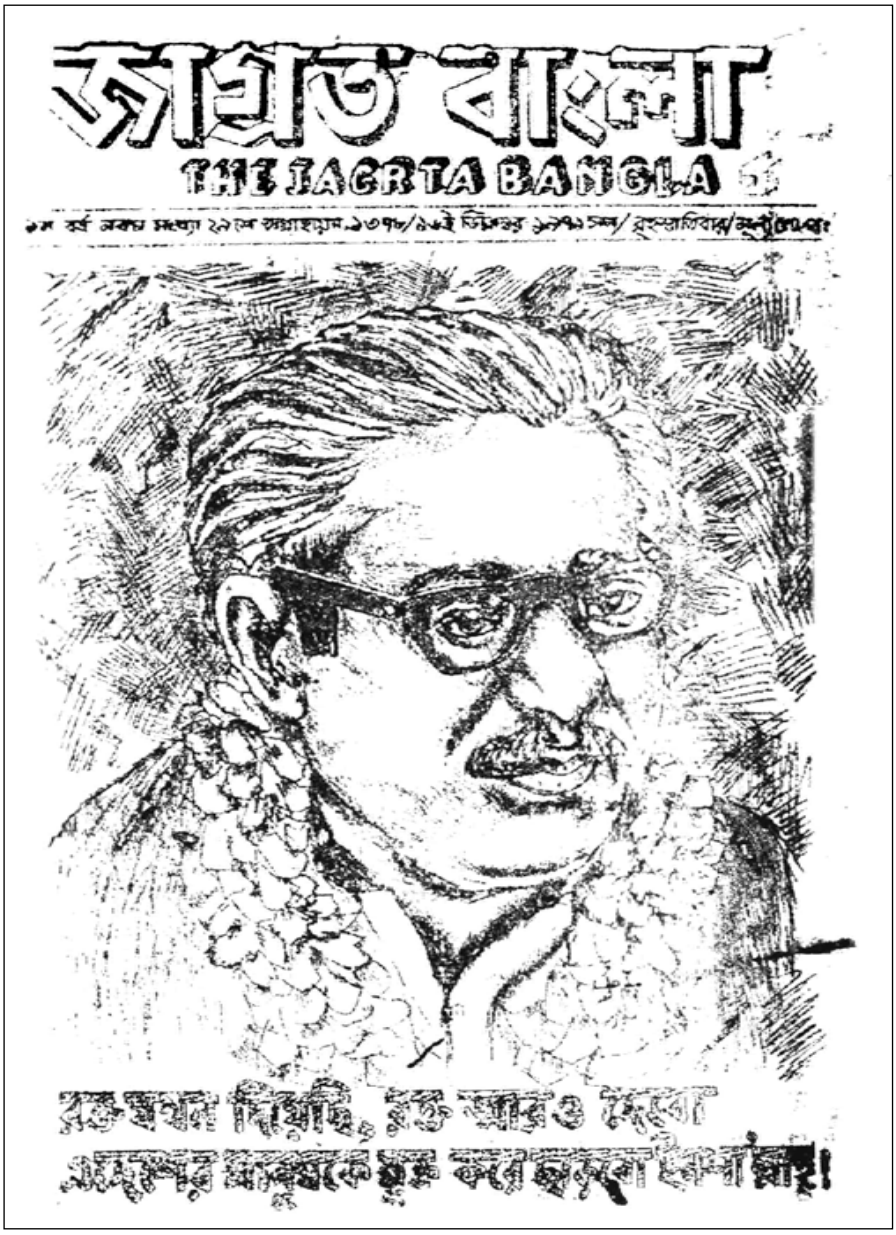

করলাম। প্রথমে ভালুকা থানা আক্রমণ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করলাম। তিনবার আক্রমণ করে অস্ত্র-গোলাবারুদের মজুদ বাড়ল। জাগ্রত বাংলার দ্বিতীয় সংখ্যা বের হলো সাইক্লোস্টাইল মেশিনে। নিক্সন সরকার বসে আছে অর্থ, অস্ত্র ও খাদ্য নিয়ে– কুকুরের মতো জিহ্বা বের করে ইয়াহিয়া ভিক্ষা চাচ্ছে– বাবা, বাবা গো বাঁচাও। নিক্সন ধমক দিয়ে বলছে, থাম ব্যাটা অস্থির হস্ ক্যান। খুবই জনপ্রিয় হলো।

ভাওয়ালিয়াবাজু যুদ্ধ

ভাওয়ালিয়াবাজু একটি গ্রাম। ভালুকা উপজেলার মাঝামাঝি এর অবস্থান। ভালুকা থেকে ১৫ কিমি. পূর্বে। ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা সুতিয়া নদী চেন্নাই খালে বয়ে গেছে। নদী পার হওয়া ছাড়া ভালুকা যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। কয়েকদিন ধরেই খবর পাচ্ছিলাম সশস্ত্র পাকিস্তানি সেনারা তাদের দল বৃদ্ধি করছে গফরগাঁও থানায়। উদ্দেশ্য ভালুকা থানা নিয়ন্ত্রণ করা। যুদ্ধে যাওয়ার মতো আফসার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬০ জন। এর মধ্যে ৩০ জনকে বাছাই করা হলো। সঙ্গে ২৬টি থ্রিনটথ্রি রাইফেল, ২টি মর্টার, ২টি এলএমজি ও একটি চাইনিজ রাইফেল। ২৪ জুন ভাওয়ালিয়াবাজুতে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী সুতিয়ার পশ্চিম পাড়ে বাঙ্কার খনন করে মুক্তিযোদ্ধারা পজিশন নেন। ২৫ জুন সকাল ৮টায় সূর্য উঠি-উঠির সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বড়োসড়ো একটি বহর নদীপাড়ে এসে হাজির হয়। ১৪-১৫টি গাড়ি গরু ও মহিষের রসদ বোঝাই করে ফেরিঘাটে এসে পৌঁছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর পাকিস্তানি বাহিনী ফেরির মাধ্যমে নদী পার হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাকিরা নদীর পাড়ে পার হওয়ার অপেক্ষা করতে

থাকে। পাকিস্তানি সেনা বহনকারী ফেরিটি নদীর মাঝপথে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এলএমজি গর্জে ওঠে। সঙ্গে রাইফেলের গুলি। ফেরিতে অবস্থান নেওয়া ৫০-৬০ জন পাকিস্তানি সেনার সেখানেই সমাধি ঘটে। বাকি যারা ছিল, স্রোতঃস্বিনী নদীতে ভেসে যায়। পাড়ে যারা দাঁড়িয়েছিল, কিছু বোঝার আগেই তারা নিহত বা আহত হয়। এ যুদ্ধ ৪৮ ঘণ্টা চলে। পাকিস্তানি বাহিনী ২৬ জুন দুপুরের পর থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ধলা স্কুলে সৈন্য নামাতে থাকে। গোলাবারুদ না থাকায় আমরা পজিশন থেকে সন্ধ্যায় এলাকায় চলে আসি। এই অসম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মাত্র ১ জন মুক্তিযোদ্ধা আ. মান্নান শহিদ হন। আহত হন ৪ জন– আফাজ উদ্দিন ভূঁইয়া, মোস্তফা কামাল, মজিবুর রহমান ও মনির উদ্দিন।

ভাওয়ালিয়াবাজুর সংঘর্ষে কতজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়, এর সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে মহিষের গাড়ি করে লাশ বা আহতদের হেলিকপ্টার দিয়ে যারা নিয়ে গিয়েছিল, তাদের জবানবন্দি অনুযায়ী এর সংখ্যা শতাধিক।

এসএ কালাম

৪৮ ঘণ্টার সংর্ঘষে আফসার বাহিনীর লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র– সবই ছিল সীমিত। জাগ্রত বাংলা পত্রিকার ৩য় সংখ্যা বের করলাম। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনের খবর ফিচার কার্টুন। পত্রিকা জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ৪র্থ সংখ্যা, ১ অক্টেবর ১৯৭১, বৃহস্পতিবার বজ্রকণ্ঠ ছাপা হলো। বাংলাদেশের টাকার নোট– এ খবরটি ছাপা হলো।

২৩ মার্চ জয়দেবপুর থেকে ১০-১২টি মহিষ ও গরুর গাড়িতে আমাদের এলাকায় আংগারগাড়া স্কুল মাঠে অস্ত্র আনা হয়। অস্ত্রগুলো পাশেই পরশুরাম মেম্বারের বাড়ির আশপাশে মাটিচাপা দিয়ে রাখি। এ খবর পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ছিল। ১ আগস্ট পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বহর আংগারগাড়া বাজারে এসে আগুন দেয়। আমরা এদিন চানপুর নামক স্থানে অতর্কিত আক্রমণ করি। পাকিস্তানি সেনারা বিকট চিৎকারে 'কিয়া মুছিবত হ্যায়, কিয়া মুছিবত হ্যায়' বলে এলোপাতাড়ি দৌড়ায়। এই হামলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ১৪ জন সৈন্য নিহত হয়। দুজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

চতুর্থ সংখ্যায় ছাপা হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ। পঞ্চম সংখ্যায় ছাপা হয়– মুক্ত এলাকায় প্রশাসন, আমরা মল্লিকবাড়ি মুক্ত করি, ৮ ঘণ্টা প্রচণ্ড গুলি বিনিময়, পাকিস্তানি দস্যুদের পলায়ন, রাত ৮টায় মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি হয়। পঞ্চম সংখ্যায় ছাপা হয়– কার্টুন, মুক্তাঞ্চলে জনসভা, রাজাকারদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, রাজাকারদের আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশাবলি, মায়ের চিঠি। সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়– মুক্ত এলাকার মানচিত্র, ন্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা, ৭৬৫ বর্গমাইল এলাকা শত্রুর কবল থেকে মুক্ত। অষ্টম সংখ্যার প্রধান শিরোনাম: ভালুকা-গফরগাঁও মুক্ত।

পাথাইরা বাইত যুদ্ধ

শতাধিক পাকিস্তানি সেনার একটি বহর পাহাড়ি এলাকায় হানা দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত ছিলেন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ১০ জন নিহত হয়। ৪টি লাশ ও ৬ জন জীবিত সৈন্য নিয়ে আমি আমাদের অফিসে আসি। দৌলারপাড়ে পচা পুকুরে লাশগুলো মাটিচাপা দিই। জীবিতদের হত্যা না করে বাঁচিয়ে রাখি। আমাদের ৪জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। নাজিমের গলায় চাইনিজ রাইফেলের গুলি লাগে। পরে সে শহিদ হয়। নবম সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি স্কেচ দিয়ে প্রচ্ছদ করা হয়। দশম সংখ্যায় ইয়াহিয়ার কুপোকাত হওয়ার কার্টুন ছাপা হয়। একাদশ সংখ্যায় বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত– এই সংবাদ খুবই জনপ্রিয়তা পায়। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। এর আগে ১২ ডিসেম্বর থেকে জয়দেবপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে অবস্থান করি। ১৬ ডিসেম্বর জাগ্রত বাংলার কাগজপত্র, মেশিন নিয়ে ময়মনসিংহ আর্মির গাড়িতে করে নিয়ে আসি। রাবেয়া মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে জায়গা নিই। পরে কাজের সুবিধার জন্য ওল্ড পুলিশ ক্লাব রোডে একটি বাসায় চলে যাই, পত্রিকা প্রকাশ করি।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ফিরে আসেনি সেজো ভাই —সলিমউল্লাহ সেলিম

সলিমউল্লাহ সেলিম। মুক্তিযোদ্ধা। ফটোসাংবাদিকতায় চেনা মুখ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চার সহোদর যোগ দিয়েছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। শহিদ অগ্রজের রক্তসিক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে অস্ত্র হাতে আগুন ঝরিয়েছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর। একাত্তরের সম্মুখসমরের যোদ্ধা সলিমউল্লাহ সেলিমের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাংবাদিক– **রেজা এনায়েত**

আপনি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের ডাক পেলেন?

সলিমউল্লাহ সেলিম: মুক্তিযুদ্ধের ডাকের কথা বললে একটা কথা বলতে হয়, ৭ মার্চের ভাষণের কথা। ৭ মার্চের ভাষণই মুক্তিযুদ্ধের ডাক। ৭ মার্চের ভাষণই মুক্তিযুদ্ধের শুরু।

কীভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন যুদ্ধে যেতে?

সলিমউল্লাহ সেলিম: আমার বেড়ে ওঠা রাজনৈতিকভাবে সচেতন এক পরিবারে। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল একাধিক সদস্য। রাজনীতি-আন্দোলনের সঙ্গে আমার পরিচয় পরিবার থেকেই। রাজশাহী ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন আমার মেজো ভাই ডাক্তার আবদুর রউফ। সবার প্রিয় রউফ ভাই। সাধারণ সম্পাদক ছিল ভাগনে। চাচাতো বোনের ছেলে ডাক্তার কাজী নুরুন্নবী, ডাকনাম বাবুল। বাবুল যুদ্ধে শহিদ হন।

মেজো ভাইয়ের কথা শুনতে শুনতে আমরা পারিবারিকভাবে রাজনীতিমনস্ক হয়ে উঠি, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হই।

বড়ো ভাই ছিলেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার। পোস্টিং ছিল সিলেটে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই তিনি সিলেট থেকে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে গ্রামে পাঠিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ভারত চলে যান ট্রেনিং নিতে।

মেজো ভাই যুদ্ধে যান এপ্রিলে। ইমিডিয়েট বড়ো ভাই আবু জাফর মো. সাইদুর রহমান বেলাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাউন্টিংয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়তেন। যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। তিনি যখন যুদ্ধে চলে গেলেন, আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম– যুদ্ধে যাব।

ছোটো ভাইটি তখন অনেক ছোটো। বৃদ্ধ বাবা ছিলেন পরম ধার্মিক। বড়ো তিন ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে বলে আতঙ্ক, শঙ্কায় ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিলেন দ্ব্যর্থহীন। আমরা যে লক্ষ্মীপুর গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেখানে তিনি যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করতেন।

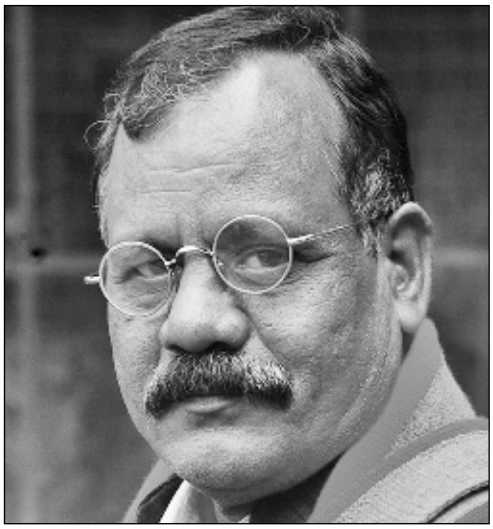
সলিমউল্লাহ সেলিম

আপনার যুদ্ধের প্রস্তুতি ও শুরুটা...

সলিমউল্লাহ সেলিম: একটা কথা বলা দরকার, প্রতিরোধ শুরু হলো ৭ মার্চের পর। বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে', ঈশ্বরদীতে শুরু হলো ট্রেনিং। দেখা গেল, এলাকায় যার কাছে বন্দুক ছিল, এয়ারগান, পিস্তল, টুটুবোর রাইফেল ছিল– ছাত্ররা এগুলো সংগ্রহ শুরু করল। প্রতিরোধের এই পর্বে মানুষ লাঠি, গুলতি, তির-ধনুক, বন্দুক– যার কাছে যা ছিল, তা নিয়েই অংশগ্রহণ করে। এমনকি আক্ষরিক অর্থেই মহিলারা বঁটি নিয়েও নেমেছিল। প্রতিরোধযুদ্ধে পাঞ্জাবি সেনারা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রামে ঢুকে, মহিলারা তাদের বঁটি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছে।

সেসময় পাবনায় টেলিফোন অফিসে ও বিসিকে একটি মিলিটারি ক্যাম্প ছিল। পাবলিক সেখানে আক্রমণ করে। একপর্যায়ে তারা পালাতে শুরু করে পাবনা থেকে গ্রামের ভেতর দিয়ে। চরের মধ্য দিয়ে রাজশাহীর পথে যাত্রায় ঈশ্বরদীর মাধবপুর বটতলায় পৌঁছাতেই সাধারণ মানুষ গাছে উঠে হাতে তৈরি বোমা নিক্ষেপ করে তাদের উপর। তাদের গুলিতে সেখানে শহিদ হন রূপপুরের রাজু। তারা যখন দাশুরিয়া তেঁতুলতলায় পৌঁছায়, পাবলিক আর্মিদের ঘিরে ফেলে। আমাদের পরিবারে একটি বন্দুক ছিল। কারও কাছে বন্দুক, কারও কাছে লাঠি, কারও কাছে গুলতি, কারও কাছে তির-ধনুক, কারওবা কাছে রামদা। আমাদের সঙ্গে আছে বাঙালি পুলিশ, আনসার। আমাদের আক্রমণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

প্রতিরোধযুদ্ধে পাবনা ও গাজীপুরের ইতিহাস বহুল প্রচারিত হলেও সারাদেশেই তখন প্রতিরোধযুদ্ধ চলছিল।

২৫ মার্চ পাঞ্জাবি আর্মি চালাল সর্বাত্মক আক্রমণ। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। গঠিত হলো মুজিবনগর সরকার। তারপর বোঝা গেল কেবল প্রতিরোধযুদ্ধ যথেষ্ট নয়। আমাদের ভালো অস্ত্র লাগবে, ট্রেনিং লাগবে।

শুরু হলো যুদ্ধে যাওয়া। দলবেঁধে ভারত গেলাম। আমি গিয়েছি জুনে। বড়ো ভাই গেছেন এপ্রিলে। সেখানে ২৮ দিনের ট্রেনিং নিলাম। ট্রেনিং থেকে শিখলাম কীভাবে অস্ত্র চালাতে হয়, গুলি চালাতে হয়, আত্মরক্ষা করতে হয়, অ্যামবুশ করতে হয় এবং কীভাবে নিজেদের বাঁচাতে হয়।

ভারতে ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরে আমরা যুদ্ধে অংশ নিলাম। যুদ্ধ শুরু হওয়া মানে আমরা প্রতিদিন যুদ্ধ করেছি তা কিন্তু নয়। যুদ্ধ বিভিন্ন রকম হয়েছে। যেমন– আমরা একটা শেল্টারে অবস্থান করছি, সেখানে মিলিটারি বা রাজাকাররা আক্রমণ করল। যুদ্ধ শুরু হলো। আবার কোনো জায়গায় তারা আছে, আমরা আক্রমণ করলাম, যুদ্ধ হলো। কোনো কোনো সময় আমাদের পাবনায় নকশাল বা সর্বহারাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। তারা কখনো নিজেরা আক্রমণ করত, কখনো পাঞ্জাবি মিলিটারি সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ করত। আমাদের এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল নকশালরা। কারণ পাঞ্জাবি মিলিটারিদের দেখেই চেনা যেত। আবার কেউ রাজাকারও নাম লেখালে এলাকায় প্রচার হয়ে যেত, তাদের আমরা চিহ্নিত করতে পারতাম। কিন্তু নকশালীদের চেনার সুযোগ ছিল না। এদের নিয়ে আমাদের টেনশনে থাকতে হতো। পাবনা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের বহুমুখী আক্রমণ ফেস করতে হয়েছে। আমাদের পাবনার ঈশ্বরদী এলাকা ছিল বিহারিপ্রধান। তারা পাঞ্জাবি আর্মির সঙ্গে এক হয়ে গেল। বিহারিদের গায়ের রং আমাদের মতোই, তারা আমাদের সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছে। কথা না বললে তাদের বাঙালি থেকে আলাদা করা যায় না। তাই তাদের আইডেন্টিফাই করা যেত না। তারা পাঞ্জাবি আর্মির সঙ্গে মিলে বাঙালি হত্যা শুরু করল। এরা আরেকটি ঝুঁকি তৈরি করল। বলা যায়, চতুর্মুখী ঝুঁকি– নকশাল, বিহারি, রাজাকার আর এদের মাথার ওপরে আর্মি। এই চারটি গ্রুপের সঙ্গেই আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে।

আর ছিল শান্তি কমিটি। রাজাকার, আলবদর, আলশামস এমনকি পাকিস্তানি আর্মি শান্তি কমিটির নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে। যেখানে হামলা দরকার, হামলা করবে। শান্তি কমিটির নেতারা এলাকায় ক্ষমতাধর থেকে মহাক্ষমতাধর হয়ে উঠল।

যেখানে নকশাল ছিল, সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঝুঁকি বেশি ছিল।

চারটি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে বলে পাবনা অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। নকশাল, বিহারি ও রাজাকারদের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে।

স্থানীয় জনগণের মনোভাব কী ছিল?

সলিমউল্লাহ সেলিম: স্বাধীনতাযুদ্ধের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণ। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে চারটি ফোর্স নকশাল, বিহারি, রাজাকার ও পাঞ্জাবি আর্মি– এই চার গ্রুপে হয়তো ৪০ জন লোক। কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা একা হলেও তিনি জানতেন তার পেছনে আছে হাজার মানুষ। সাধারণ জনগণের এই যে সমর্থন, এটাই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। সাধারণ জনগণ একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছে, মা-বাবাই শুধু তাঁর সন্তানকে ওইভাবে সাপোর্ট দিতে পারে। ভাইবোনই এমন সাপোর্ট দিতে পারে। সাধারণ মানুষ নিজেরা খেতে না পারলেও মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে। নিজে পান্তাভাত খেতে বসেছে। এমন সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা এলো, তাকেই ভাত খেতে দিয়ে বলল, 'তুমি খাও, আমার চিন্তা করো না, তুমি খাও।' পৃথিবীর কোথাও জনসাধারণ এভাবে যোদ্ধাদের একচেটিয়া সমর্থন দিয়েছে বলে মনে হয় না।

অমুক গ্রামে একজন রাজাকার হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে খবর। ভয়ে তাদের সমর্থন করছে, সালাম দিচ্ছে জনসাধারণ; কিন্তু মন থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে না।

পাঞ্জাবি আর্মিদের ক্যাম্পে কী হচ্ছে, এ কথা আমরা জেনেছি কীভাবে? ওখানে যেসব বাঙালি কাজ করত, এরাই ঝুঁকি নিয়ে সব তথ্য আমাদের দিয়েছে। আর্মিরা কবে, কোথায় আক্রমণ করবে, আমরা আগেই জেনে যেতাম। সেভাবেই প্ল্যান করতাম। মুক্তিযোদ্ধাদের বড়ো অবলম্বন ছিল সাধারণ মানুষ– বড়ো হাতিয়ার।

ঈশ্বরদীর মানিকনগরে আমার এক বন্ধু মতির সম্মুখযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা বলি। তার ভাষায়, 'যুদ্ধ শুরু করলাম ফজরের পর। সারাদিন যুদ্ধ। ক্রলিং করে পজিশন চেঞ্জ করতে হয়। উঠে প্রস্রাব করার সুযোগ নেই। শুয়ে থেকে প্যান্টেই প্রস্রাব করতে হলো। পাঞ্জাবি আর্মিরা সন্ধ্যার পরে মুভ করত না। সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হলো।

আমাদের খাওয়াদাওয়া তো রাত ৮টা-৯টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। সকালে কিছু না খেয়েই সারাদিন যুদ্ধ করেছি। সন্ধ্যায় আমরা উঠে গ্রামে ঢুকলাম। গ্রামে মহা উৎসব শুরু হলো। গ্রামবাসী আমাদের ধামা ভরে মুড়ি এনে খাওয়াল। ২-৩টা গরু জবাই করল। কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে খাওয়াল। কেউ কিন্তু বলেনি তোমরা আমাদের খাওয়াও।' মানুষের তখন প্রচণ্ড অভাব। দেশের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে অনাহারে থাকে। কেউ একবেলা খায়, কেউ দুই বেলা খায়, কেউ দুইদিনে একবার খায়। সেই গরিব মানুষ গরু জবাই করে আমাদের খাইয়েছে। কারও হয়তো হালচাষের সম্বল ছিল একটি গরু। জনসাধারণের সমর্থন ছিল এই পর্যায়ের। এমনটা ছিল সারা বাংলাদেশের কমন চিত্র।

আপনার সম্মুখযুদ্ধের অভিজ্ঞতা যদি জানাতেন...

সলিমউল্লাহ সেলিম: আমি কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও দুইটি যুদ্ধ ছিল বেশ বড়ো আকারের। এর মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি ও সাফল্যের দিক দিয়ে মাঝপাড়া যুদ্ধ বড়ো হলেও সাতআনার মাঠের যুদ্ধ আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয়।

সাতআনার মাঠের যুদ্ধ

ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমি পাবনায় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেই। পরিবারের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিনি। আমরা যেখানে থাকতাম, চারদিকে মুক্তাঞ্চল থাকলেও একটি গ্রাম ছিল নকশালদের ঘাঁটি। ওদের কারণে আমার মুভমেন্ট বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ওদের আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেব। আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে চারদিক দিয়ে ওই গ্রাম ঘিরে ফেললাম। আমাদের দলে ৭০ থেকে ৮০ জন মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের সাতআনার মাঠে অবস্থানের নির্দেশ ছিল। আমাদের দায়িত্ব পাঞ্জাবি আর্মি ঠেকানো। ফজরের আজান দিলেই কয়েকটি গ্রুপ নকশালদের ওপর ফায়ার ওপেন করবে। আমরা সাতআনার মাঠ পৌঁছে দেখলাম চরের মধ্য একটি ফাঁকা জায়গা। হালকা শীতও পড়েছে, সঙ্গে বাতাস। আমরা দেখলাম এখানে আমাদের পজিশন খারাপ। এখানে অবস্থান নিলে পাঞ্জাবি আর্মির সঙ্গে আমরা পারব না। কিছুটা দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আমরা ওই বাড়িতে অবস্থান নিতে পারলে আমাদের পজিশন ভালো থাকবে।

কমান্ডার বললেন, ওই বাড়িতে পৌঁছতে হলে যে প্রথমে এগোবে, তার জীবনের ঝুঁকি আছে। তোমাদের মধ্যে কে যাবে? হাত ওঠাও। কেউ হাত তুলল না। তখন কমান্ডার বললেন– সেলিম তুমি। তুমি যাও। তখন সে আমার আর্মসটা নিয়ে নিল। তাঁর স্টেনগানটা আমাকে দিল। দিয়ে বলল, মাসকলাইয়ের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ক্রলিং করে যাও ওই বাড়ি পর্যন্ত। ওই বাড়ির পাশে গিয়ে একটা গ্রেনেড থ্রো করবা, যেন বাড়ির ভেতর গিয়ে পড়ে। থ্রো করে শুয়ে থাকবা, আমরা পেছন থেকে ফায়ার ওপেন করব। প্রত্যেকে একটি করে ফায়ার করবে। ফায়ার শেষ হলে তুমি দৌড়ে গিয়ে ঘরের ডোয়ার পাশে স্থান নেবা। তারপর তুমি এক ম্যাগাজিন গুলি চালাবা বাড়ির ভেতর।

কথামতো অ্যাকশনে গেলাম। বাড়ির ভেতরে দ্বিতীয় গ্রেনেড মারার পর সবাই জয় বাংলা বলে দৌড়ে বাড়িতে ঢুকল। আমি তখনও ডোয়ার পাশে বসে কাঁপছিলাম। আমার শরীরে একটা গেঞ্জি, যেটা মাসকলাই ক্ষেতের শিশিরে ভেজা

কথামতো অ্যাকশনে গেলাম। বাড়ির ভেতরে দ্বিতীয় গ্রেনেড মারার পর সবাই জয় বাংলা বলে দৌড়ে বাড়িতে ঢুকল। আমি তখনও ডোয়ার পাশে বসে কাঁপছিলাম। আমার শরীরে একটা গেঞ্জি, যেটা মাসকলাই ক্ষেতের শিশিরে ভেজা। শীতে ও ভয়ে আমার শরীর অবশের মতো। আমি ভাবলাম গুলি লেগেছে হয়তো। যাই হোক, বাড়ি দখল হয়ে গেল। বাড়ির ভেতর কেউ ছিল না। আজানের সময় অন্যান্য দলের আক্রমণের আওয়াজ পেলাম। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবি আর্মি হাজির। মেঠো রাস্তার একপাশে আমরা, অন্যপাশে কমান্ডার ফকরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম। একপর্যায়ে আমরা পিছু হটলাম। কারণ দিনে আমরা ওদের সঙ্গে পারব না। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সীমিত। ওদের অনেক। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদারদের সংখ্যা আরও বাড়ল।

আমরা পেছাতে পেছাতে দুপুরের দিকে উঁচু মাটির রাস্তার ঢালে অবস্থান নিলাম। উঁচু ও খাড়া মাটির রাস্তা। ভালো পজিশন। এখানে এসে সাক্ষাৎ হয় আগে থেকে অবস্থান নেওয়া আমার মূল কোম্পানি কমান্ডার কাজী সদরুল হক সুধা। ছিল আমার ছোটোবেলার বন্ধু মতিউর রহমান মতি। তাঁকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রথম কথাই ছিল. 'দোস্ত, বেঁচে আছো!' ওখানে আরও পেলাম কমান্ডর আবুল কালাম আজাদ ও কমান্ডার আবদুর রহিম টিনুর নেতৃত্বে আরও একদল মুক্তিযোদ্ধা। শক্তিবৃদ্ধি করে আমরা পজিশন নিলাম। সামনে আর্মি পজিশন নিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হলো। দুইজন মহিলা রাইফেল হাতে এবং একটি বাচ্চা ছেলে মাথায় ধামা, হাতে অ্যালুমিনিয়ামের জগ নিয়ে এগিয়ে আসছে সড়কের নিচ দিয়ে। আমাদের বোঝার উপায় নেই তারা ছদ্মবেশী নকশাল নাকি অন্য কেউ। কমান্ডার আমাদের বললেন, ফায়ার করো না, টার্গেট করে রাখো।

তারা আমাদের কাছে পৌঁছল। মাথা থেকে ধামা নামাল। তারা এনেছে রুটি আর ঝোলা গুড়। বলল, বাবারা খেয়ে নাও। একজন মহিলা রুটির উপর ঝোলা গুড় মেখে রোল করে আমাদের প্রত্যেক যোদ্ধাকে খাওয়াল। অন্য মহিলা বলল, তোমরা খাও, আমি দেখছি। বলেই সে পজিশন নিয়ে ফায়ার ওপেন করল।

একপর্যায়ে আমরা পিছু হটে চরপ্রতাপপুর ক্যানেলের পাশে এলাম। এই ক্যানেলের ওপারে গেলেই আমরা নিরাপদ। কারণ ওরা পার হবে না ক্যানেল দিয়ে। ক্যানেলে পর্যাপ্ত নৌকা রেখেছিল গ্রামবাসী। কয়েকটি গ্রুপ পার হয়ে গেল। আমাদের ফায়ার চলছিল। যতই বাহাদুরি দেখাই, যুদ্ধের মাঠে তো একটা টেনশন থাকেই। কমান্ডার বললেন, সেলিম তুমি আমার সঙ্গে পার হবে। ক্যানেল পার হলেই ওপারে চরকাতরা বাজার। ক্যানেলের পাড় থেকে বাজারের মাঝখানের পথটুকু দৌড়ে পার হলেই নিরাপদ।

আমরা পার হব– এমন সময় দুই বুড়ো রাইফেল হাতে এলো গ্রাম থেকে। প্রায় সবাই পার হয়ে গেছে। তারা বলল, এই তোরা পালা, আমরা পাঞ্জাবি আর্মিদের ঠেকাব। তোরা যুদ্ধ জানিস, তোরা পালা। আমরা মেরেই মরব। আমরা বুঝতেছি আমরা এখন নিরাপদ। কমান্ডার বললেন, আপনারা নিরাপদে কেটে পড়ুন, এখন ফায়ারের প্রয়োজন নেই। তাঁরা নাছোড়বান্দা। বসে ফায়ার করতে লাগল। আমরা ক্যানেল পার হয়ে গেলাম। চরকাতরা বাজার পার হওয়ার সময় ফায়ার বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম তারা শেষ। একদিন পর ক্যানেলে লাশ ভেসে উঠল। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাহিত করলাম।

মাঝপাড়ার যুদ্ধ

সাতআনার মাঠের যুদ্ধ শেষে আমরা চরকামালপুর ক্যাম্পে অবস্থান নিলাম। এই সময়ে খবর পেলাম আমার ভাই আবু জাফর সাইদুর রহমান বেলাল, যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাউন্টিংয়ে অনার্স পড়তেন, তিনি পাকিস্তান আর্মির হাতে ধরা পড়ে শহিদ হয়েছেন। ভাগনে রাজশাহী ছাত্রলীগের সেক্রেটারি, সেও ধরা পড়ে শহিদ হয়েছে। ভাগনে রাজনীতি করত; কিন্তু আমার এই ভাইটি তেমন রাজনীতি করত না। তার শহিদ হওয়া বেদনা বাড়িয়ে দিল।

মেজো ভাই ডাক্তার আবদুর রউফ, যিনি রাজশাহী ছাত্রলীগের সভাপতি চরকামালপুর ক্যাম্পে খবর পাঠালেন আমার এক ভাই শহিদ হয়েছে, সেলিম আর কোনো যুদ্ধে যাবে না। ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তখন আমাকে আটঘরিয়া থানার মাঝপাড়া ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, কমান্ডার আনোয়ার হোসেন রেণু ছিলেন এই ক্যাম্পের দায়িত্বে। ক্যাম্প ছিল একটা স্কুলে। আড়াই শ থেকে তিন শ মুক্তিযোদ্ধার অবস্থান।

তিন-চারদিন পর ৪-৫ জন মিলে এক বাড়িতে নাশতা করতে গেছি। নভেম্বর মাস। বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা আমাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। জানতে চাইলেন মা-বাবার সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না। আমাদের জন্য ভাত রাঁধতে বলে মুড়ি ও গুড় খেতে দিলেন। আমরা খাচ্ছি– এমন সময় চাইনিজ রাইফেলের গুলির আওয়াজ পেয়ে হতচকিত হলাম। আমরা দৌড়ে ক্যাম্পে গেলাম।

যার যার অস্ত্র হাতে নিলাম। আমরা সবাই আতঙ্কিত। এটা ছিল প্রত্যন্ত গ্রাম, নিরাপদ। এখানে আর্মি আসার কথা না। যাই হোক, কমান্ডার আমাদের বললেন, পালাও। যেদিক থেকে গুলির শব্দ আসছিল, এর উলটোদিকে আমরা দৌড় শুরু করলাম। একটু পরে সেদিকেও গুলির শব্দ পেলাম। গ্রামবাসী বলল, আমাদের তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। একটা দিক ফাঁকা। সেই দিকে বিশাল পাথার। কাদাপানি আছে। আর্মি ওইদিকে ঘিরতে পারেনি। আমরা ওইদিকে রওয়ানা দিলাম।

পাথারে যাওয়ার পথে সরু একটা খাল। গলাসমান পানি। জায়গাটার নাম বংশীপাড়া। আমরা পানিতে নামতে বাধ্য হলাম। কারণ যে কোনো সময়

আর্মি চলে আসতে পারে। গলা পর্যন্ত ভিজে পার হতে বাধ্য হলাম। আমরা এখন নিরাপদ। কারণ আর্মি খাল পার হতে পারবে না।

আমরা যখন পার হলাম, এর কিছুক্ষণ পর আর্মি এসে হাজির। কমান্ডার আমাদের পজিশন নিতে বললেন। আমাদের সাইডটা উঁচু, ওদেরটা নিচু। ন্যাচারালি আমরা ভালো পজিশনে ছিলাম। ওদের বিশাল সংখ্যা। গাড়ির পর গাড়ি আসছিল। পজিশন নেওয়ার পর কমান্ডার ফায়ার করার হুকুম দিলেন। আমরা ফায়ার করলাম। এগারোজন আর্মি মারা গেল, আমরা নিশ্চিত হলাম। ক্লাস নাইন-টেনের আমরা যে কয়জন বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম, ওরা আমার পাশেই ছিল। আমি বললাম পালা, চল পালাই।

কারণ এর আগে যুদ্ধ করে আমার বোঝা হয়ে গিয়েছিল পাঞ্জাবি আর্মি কী! মাহতাব বলল ধুর শালা, পালাইস না।

পাঞ্জাবি আর্মির গুলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। যে দূরত্ব, গ্রেনেড চার্জ করলে খালের ওপাড়ে যাওয়ার কথা না। ছাত্তার একটা গ্রেনেড চার্জ করল। নদীর মাঝখানে পড়ল। ও বলল, দুশ্‌শালা, একটা গ্রেনেড নষ্ট হলো। তারপর ও বলল, চল খালের কিনারে যাই। আমাদের টার্গেট খালের কিনারে গিয়ে গ্রেনেড চার্জ করা। আমরা পাঁচ-ছয়জন একটু একটু করে এগোচ্ছি। মাহতাব বলল, দ্রুত আগা। আমি বললাম, তাড়াহুড়ো করে আগাইস না, মাথা উঁচু করিস না, গুলি লাগবে। এমন সময় মাগো বলে চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ল ইউনুস। ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ হলো। আমরা পিছু হটলাম। ২টা-৩টার দিকে পাঞ্জাবি আর্মি চলে গেল। আমরা দেখলাম আমাদের নয়জন সহযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন।

ওইদিন যুদ্ধ শেষে পাঞ্জাবি আর্মি মাঝপাড়ায় কয়েক হাজার মানুষ হত্যা করে। শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সামনে যাদের পেয়েছে– একজন মানুষও জীবিত রাখেনি। আমাদের পাঁচ-সাতদিন লেগে গিয়েছিল সব লাশ মাটিচাপা দিতে।

মাঝপাড়া যুদ্ধের পর আপনাদের মুভমেন্ট...

সলিমউল্লাহ সেলিম: মাঝপাড়া যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে চলে গেলেন অন্যান্য ক্যাম্পে। এর ১৫-২০ দিন পর, নভেম্বরের একেবারে শেষের দিকে আমরা চিন্তা করলাম ১৩-১৪ মাইল দূরের রাজাপুর বাজারে রাজাকার-মিলিশিয়া ক্যাম্পে আক্রমণ করব। এটা ছিল নাটোরের ভেতর, তবে ঈশ্বরদীর বর্ডারে। সন্ধ্যায় আমরা রাজাপুর বাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম। যাত্রা করার আগে কমান্ডার আমাদের ব্রিফ করলেন। পথে এক বাড়িওয়ালা আমাদের খাওয়ালেন। রাত ১২টার দিকে রাজাপুর বাজারে পৌঁছলাম। আমরা রাতে মিলিশিয়া ক্যাম্প আক্রমণ করলাম। যখন ক্যাম্প দখল করলাম, এর বেশ কিছুক্ষণ পর ফজরের আজান দিল। কয়েক জায়গায় ছোপ ছোপ রক্ত দেখে বুঝলাম কেউ আহত-নিহত হয়েছে। ওরা রাজশাহী-পাবনা মহাসড়ক ধরে নাটোরের দিকে পালিয়েছে। আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

এরপর আমাদের আর যুদ্ধ করতে হয়নি। একদিন কমান্ডার ডেকে বললেন, ইন্ডিয়ান আর্মি যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। ইন্ডিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে। পাকিস্তান আর্মি পেছাচ্ছে। আমাদের মেইন রোডের দিকে যেতে হবে। আমরা মেইন রোডের দিকে এগোলাম।

১৬ ডিসেম্বর রাতে খবর পেলাম দেশ স্বাধীন। আমরা আকাশের দিকে ব্লাঙ্ক ফায়ার করলাম। পরদিন মা-বাবার খোঁজে বের হলাম। ১৯ ডিসেম্বর ঈশ্বরদীর পাশে মুলাডুলি নামক একটি গ্রামে তাদের পেলাম। কয়েকদিন পর অন্য ভাইয়েরা ফিরে এলেও সেজো ভাই ফিরে আসেনি কখনো।

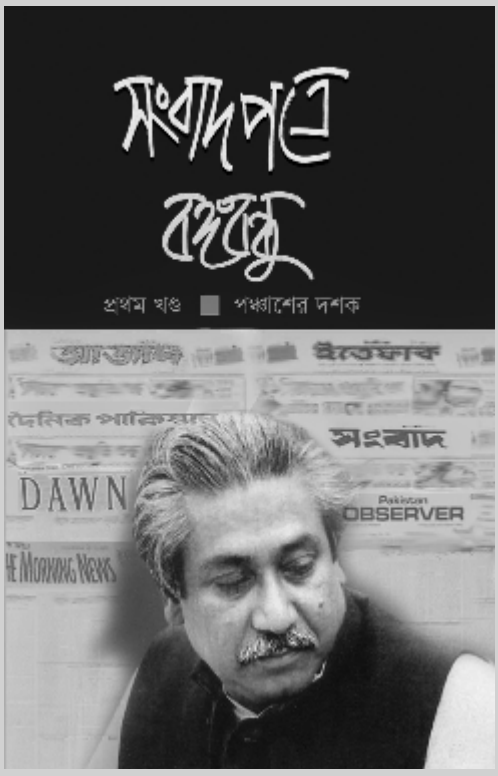

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

৭ মার্চের ভাষণ জানিয়ে দেয় যুদ্ধ আসন্ন —এমএ গনি আকন্দ

মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক এমএ গনি আকন্দ। ১৯৭১ সালে দেশমাতৃকার টানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে টানা ৭২ ঘণ্টা অনাহারে থাকা যুদ্ধদিনের স্মৃতি এখনো দোলা দেয় তার মনে। মুক্তিযুদ্ধ শেষে আশির দশকের শুরু থেকে দেশ ও সমাজের কল্যাণে সাংবাদিকতায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন বীর এই যোদ্ধা। বর্তমানে কাজ করছেন একটি জাতীয় দৈনিকে মোহনগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক এমএ গনির যুদ্ধদিনের কথা জানাচ্ছেন দৈনিক জনকণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার– **রাজন ভট্টাচার্য**

১৯৫২ সালের ৮ মে নেত্রকোনা (বর্তমান) জেলার বারহাট্টা উপজেলার সাহতা ইউনিয়নের দরুনসাহতা গ্রামে জন্ম এই বীর মুক্তিযোদ্ধার। ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল তিন বন্ধু মিলে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা কলমাকান্দা হয়ে ভারতের রংড়া ক্যাম্পে তারা প্রশিক্ষণের জন্য নিবন্ধিত হন। সেখান থেকে তাদের পাঠানো হয় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তোড়া নামক ট্রেনিং সেন্টারে। বেশ কিছুদিন প্রশিক্ষণ নেন সেখানে। তখন কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন মাহবুব আলম। মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে ১৯ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধে অংশ নেন তিনি।

যুদ্ধদিনের স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের আগস্টে নেত্রকোনার মদন থানা এলাকায় একটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আক্রমণ করে পাকিস্তানিরা। খবর পেয়ে আমরা যুদ্ধে যোগ দেই। ২৮, ২৯ ও ৩০ আগস্ট তিনদিন একটানা চলে তুমুল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমাদের একজন সহযোদ্ধা শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু রাজাকার ও পাকিস্তানি আর্মিসহ শতাধিক শত্রু আমাদের আক্রমণে মারা গিয়েছিল।

এত বড়ো যুদ্ধ দীর্ঘ সময়ে আর সামনে আসেনি– এ কথা উল্লেখ করে গনি বলেন, যখন সহকর্মীদের ওপর আক্রমণের খবর পেলাম, তখনও বুঝতে পারনি যুদ্ধ এত দীর্ঘ হতে পারে। তাই যেভাবে ছিলাম, ঠিক সাধারণ প্রস্তুতিতে আমরা সবাই এসে যোগ দিই। কিন্তু পাকিস্তানিরা প্রচুর গোলাবারুদ নিয়ে অর্থাৎ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। খাওয়াদাওয়া নেই। গুলি শেষ হয়ে আসছিল। বারবার শুকিয়ে আসছিল গলা। সবাই চিন্তায় পড়ে গেলাম। কারও কারও মনে ভয় কাজ করছিল। তিনদিনের মাথায় আমাদের খাওয়ার জন্য এক ডালা পিঠা ক্যাম্পে সরবরাহ করা হয়। যিনি পিঠা নিয়ে আসছিলেন, তাকে আমরা সবাই 'মিরাশের মা' বলে ডাকতাম। ধানক্ষেত দিয়ে পালিয়ে কোনো রকমে ক্যাম্পে এসেছিলেন তিনি। খাবার না পেয়ে সত্যিই আমরা সবাই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আস্তে আস্তে আমরা পিছু হটার পরিকল্পনা করলাম। শেষ মুহূর্তে সহযোদ্ধা শহিদ কুদ্দুসের লাশ নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হই।

এমএ গনি আকন্দ

কলমাকান্দা, নাজিরপুর, মদন, নেত্রকোনাসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এমএ গনি। এর মধ্যে কলমাকান্দায় তিনবার, নাজিরপুরে একবার, বারহাট্টায় সাত থেকে আটবার বড়ো বড়ো যুদ্ধে অংশ নেন। সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে টানা তিনদিন অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টার মদনের যুদ্ধ। এর বাইরেও ছোটোখাটো অনেক যুদ্ধে অংশ নেন তিনি।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে আমরা পরিষ্কার হয়েছিলাম যুদ্ধ অনিবার্য। আমাদের সামনে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। সেদিন থেকেই যুদ্ধে নামার প্রস্তুতি শুরু করি। তখন তো মোবাইলের যুগ ছিল না। সমমনা বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতাম। পরিকল্পনা করতাম। প্রায় প্রতিটি দিনই ছিল আমাদের প্রস্তুতি পর্ব। চিন্তা একটাই– মাঠে নেমে যেতে হবে। বসে থাকার আর কোনো সুযোগ নেই। যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। ওড়াতে হবে বিজয়ের পতাকা। একটি স্বাধীন দেশ চাই। চাই স্বাধীন মুক্ত বাতাস। এরকম চিন্তা ও কল্পনা যখন করতাম, তখনই শরীরের রক্ত গরম হয়ে যেত। সাহস বেড়ে যেত।

যুদ্ধের সময় খবর আদানপ্রদান সম্পর্কে তিনি বলেন, কোনো কোনো ক্যাম্পে রেডিও ছিল। যেসব ক্যাম্পে রেডিও ছিল না, সেখানে একমাত্র ভরসা ছিল চিঠি। পরিচিতজনরা ছদ্মবেশে ক্যাম্পে চিঠি নিয়ে আসতেন। চিঠিতে বিস্তারিত লেখা থাকত। আমাদের কখন কী করতে হবে। কোথায় যেতে হবে। কবে কোথায় হামলা হবে– সবকিছু উল্লেখ থাকত। মূলত সেক্টরের মূল দপ্তর থেকেই এসব নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

বিজয়ক্ষণের স্মৃতি মনে করে গনি আকন্দ বলেন, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসটি সবচেয়ে স্মরণীয়। প্রতিদিনই বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চল শত্রুমুক্ত হওয়ার খবর পাচ্ছিলাম। আনন্দ যেন আর ধরে না। কবে দেশ শত্রুমুক্ত হবে– এই প্রতীক্ষা ছিল সবার মধ্যেই। এর মধ্যে আমরা সবাই মিলে ৯ ডিসেম্বর নেত্রকোনা মুক্ত দিবস পালন করলাম। ১০ ডিসেম্বর মুক্ত হয় ময়মনসিংহ। এর আগে ৮ ডিসেম্বর মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা ও ধর্মপাশা মুক্ত হয়। ১৬ ডিসেম্বরের দিন ছিলাম ময়মনসিংহ সার্কেট হাউসে। সেখান থেকেই বিজয়ের খবর পাই। তখন কেউ আকাশে ফাঁকা গুলি ছুড়ছিল। হাজারও মানুষ বিজয় মিছিল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। অনেকে এসে আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। কোলে তুলে উল্লাস প্রকাশ করে। সীমাহীন আনন্দ আর আনন্দ। এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম পুরোটা সময়। মুক্ত বাংলাদেশ, মুক্ত বাতাসে বহুবার দীর্ঘশ্বাস নিয়েছি তখন। সেদিনের অনুভূতিটুকু বলে বোঝানো যাবে না...। সত্যিই না...। এক অসাধারণ মুহূর্ত ছিল ...।

ছবি: সলিমউল্লাহ সেলিম

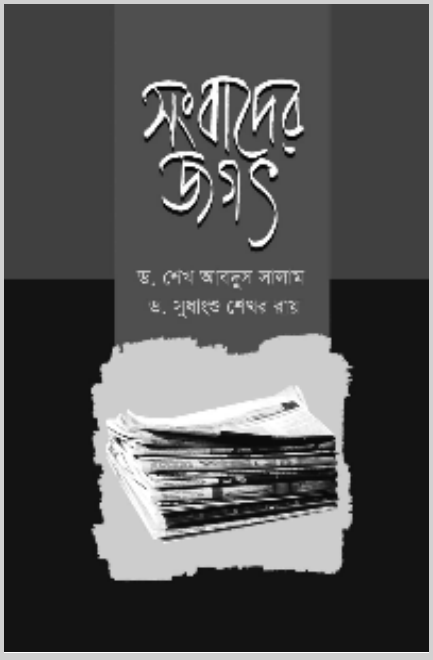

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প একাত্তরের 'সংবাদ পরিক্রমা'

প্রণবেশ সেন

হঠাৎই অনুরোধটা এলো। লিখুন না, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের সেই দিনগুলোর কথা। অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। এখন তো শেষ পারানির কড়ি গুনছি। মগজের কোষে কোষে বিস্মৃতির পলিও জমেছে ঢের। ভাবছি, এখন কি ফিরে যাওয়া সম্ভব উত্তাল সেই দিনগুলোয়? ভরসা একটাই– উসকে দিলে হয়তো স্মৃতিগুলো নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।

আশ্চর্য সেই একাত্তরের দিনগুলো– বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সেই দিনগুলো। কাজ করতাম আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে। তাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম সেই আগুন-ঝরানো দিনগুলোর সঙ্গে। আজ এই শেষ বেলায় এসে মনে পড়ছে, যখন অসংখ্য অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা এখানে-ওখানে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, তখন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিরল গৌরবও তো বহু ভাগ্যে মিলেছিল। লিখতাম 'সংবাদ পরিক্রমা', লিখতাম 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের নিউজ'। এটা যদি একটা বিরল গৌরব হয় কিংবা একটা সাফল্য, তবে তো পটভূমিটাও মনে রাখা দরকার হয়ে পড়ে। তাই শুরু করছি একেবারে গোড়ার কথা দিয়ে।

গোড়ার কথা

গোড়ার কথা মানে 'সংবাদ পরিক্রমা'র গোড়ার কথা। ১৯৬৫ সাল। ভারত-পাকিস্তান লড়াই সবে শেষ হয়েছে। তাসখন্দে স্বাক্ষরিত হয়েছে মৈত্রীচুক্তি। কিন্তু মৈত্রী কোথায়? বাতাসে তো বারুদের গন্ধ ছড়ানো। মৈত্রী, সম্প্রীতি– এসবের নামগন্ধ নেই কোথাও। না পাকিস্তানে, না ভারতে। দুদেশের মনমেজাজে তখনও বিদ্বেষ-বিষ ছড়ানো। কলকাতার রেড রোডের ধারে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পঁয়ষট্টির লড়াইয়ের স্মারক হিসেবে রাখা প্যাটন ট্যাঙ্কটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চড়চাপড় মেরে, পাদুকাঘাত করে অনেকেই গায়ের ঝাল মেটাতেন। শান্তির ললিত বাণী কেউ বরদাশত করতে রাজি নন। এমনই সময় ভারত সরকারের হুকুম এলো ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ঐতিহ্য ও মৈত্রীর দিক দিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে বন্ধুত্বের বাতাবরণ। স্বাভাবিক, কারণ শত্রুতা নয়, বন্ধুত্বই মানুষের শেষ পরিচয়।

ছেষট্টি সালের গোড়ার দিকে আকাশবাণীতে পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য একটি বিশেষ বেতার তরঙ্গ চালু হলো। আমি বার্তা বিভাগে যোগ দিলাম ছেষট্টির ফেব্রুয়ারিতে। এর আগে পর্যন্ত কলকাতা-'ক'তে 'স্থানীয় সংবাদ' ও 'সংবাদ সমীক্ষা' প্রচারিত হতো। আর প্রচারিত হতো সংবাদ বিচিত্রা– রেডিও নিউজ রিল। ভারত-চীন লড়াই এবং তারপর ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের সময়ে দেশপ্রেম উদ্দীপক বহু সংবাদ ও সংবাদভাষ্য প্রচারিত হয়েছে ওই অনুষ্ঠানে। বহুশ্রুত ছিল ওই অনুষ্ঠান। যুদ্ধের পটভূমিতে লড়াকু মেজাজের।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠান চালু হওয়ার সময় ঠিক হলো যে, রাত ১০টা থেকে ১০টা ৫ মিনিট পর্যন্ত একটি সংবাদভাষ্য প্রচারিত হবে, আর এরপরেই প্রচারিত হবে খবর, আন্তর্জাতিক খবর। ঠিক হলো, এই অনুষ্ঠান দুটিও পূর্বাঞ্চলীয় বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে যুগপৎ প্রচারিত হবে কলকাতা-'ক'তে। সংবাদভাষ্যমূলক অনুষ্ঠানটির নাম রাখা হলো 'সংবাদ পরিক্রমা'। ঠিক হলো, ওই অনুষ্ঠানে ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। বলতে হবে দুদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তুলে ধরতে হবে দুদেশের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা। আমারই ওপর দায় বর্তাল সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ওই সংবাদভাষ্য রচনার।

লিখতাম। সপ্তাহে পাঁচদিন লিখতাম আমি। কিন্তু কী আশ্চর্য পরিবেশ! কেউ শুনতে রাজি নন ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর কথা, বন্ধুত্বের কথা। শত্রুতার কথা বলুন, পাকিস্তানের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার কথা বলুন– এসব কথা শুনব। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান এই দুদেশের মানুষের বন্ধুত্বের কথা বলুন, ঐতিহ্যের কথা বলুন, ভাষাগত মিলের কথা বলুন, আত্মিক সম্পর্কের কথা বলুন– না, কেউ শুনতে রাজি নন এসব মিষ্টি কথা। অথচ দায় বর্তেছে এই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলারও। বলেছিও। দুদেশের মৈত্রীর কথা, দুদেশের মানুষে মানুষে বন্ধুত্বের কথা, পড়শিই যে আরশির মুখ– এসব কথা। তখন পরিক্রমায় লেখকের নাম থাকত অঘোষিত। যিনি পড়তেন, তাঁর নামও বলা হতো না। তবে তখন সংবাদ বিভাগে পাঠক বলতে ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের নামও প্রচারিত হতো না। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনেই শ্রোতারা তাঁদের চিনে ফেলতেন। চুটিয়ে চিঠিপত্র আসত শ্রোতাদের কাছ থেকে। কখনোবা দেবদুলালের নামে, কখনো দেবাংশুর নামে, আবার কখনোবা বার্তা বিভাগের নামে। প্রায় সব চিঠিই ভর্ৎসনামূলক। কত যে গালাগালি খেয়েছি শ্রোতাদের কাছ থেকে। হতাশা গ্রাস করতে চাইত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখলাম, ধীরে ধীরে অবস্থাটা পালটে যেতে লাগল। জনমতের জোয়ার বইতে লাগল উলটো খাতে। শত্রুতার রুক্ষ কথায় মন ভেজে না, মন ভেজে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর নরম আর্দ্র কথায়। মানুষ যত কঠিনই হোক না কেন, বুকের গভীরে প্রেম ও ভালোবাসার একফালি সবুজ জমি থেকেই যায়। পরিক্রমায় শ্রোতারা তাঁদের মনের কথা শুনতে পেলেন। ভর্ৎসনার বদলে শ্রোতাদের প্রশংসাসূচক কিছু চিঠিপত্র আসতে লাগল আমাদের দপ্তরে। এবার একটু বলতে হয় আমার নিজের কথা। নিজের ঢাক নিজে পেটানোর জন্য নয়, সংবাদ পরিক্রমাকে বুঝতে এবং মূল্যায়ন করতে।

আমার কথা

আমি বাংলাদেশের ছেলে। জন্ম সিরাজগঞ্জে। তবে আমার বড়ো হওয়াটা পাবনা শহরে। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে চলে আসি কলকাতায়। বাকি পড়াশোনা, স্কুল-কলেজ শিক্ষকতা এবং সংবাদপত্রে হাতেখড়ি– সবই এই কলকাতায়। '৫৮ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ আইয়ুব খানের স্বৈরাচারের দশক শুরু হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে আমার যাতায়াত ছিল। নিজের চোখে দেখেছি ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠতে, দেখেছি মুসলিম লীগের পতন, দেখেছি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর 'আওয়ামী লীগ' হওয়া। দেখেছি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি। দেখেছি গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে তছনছ করে সামরিক শাসনের আবির্ভাব। এককথায়– পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবোধের স্ফুরণের মুহূর্তগুলোর আমিও ছিলাম অন্যতম সাক্ষী। সেসময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই হয় আমার পিতৃবন্ধু, না হয় আমার নিজের বন্ধু। আমি ছিলাম একটু ভীতু প্রকৃতির। এ-দল সে-দল থেকে থাকতাম একটু দূরে দূরে। তবুও পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হওয়ার গতিপথটি চিনতে পেরেছিলাম সেই প্রথম প্রহরেই। এ ব্যাপারটা খুবই কাজে লেগেছিল। অবিনয়ের অপরাধ নেবেন না, এই প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের ফলেই সংবাদ পরিক্রমা হয়ে উঠেছিল এমন একটা জানালা, যার খিল খুললেই দেখা যেত– এপারে যে বাংলাদেশ, ওপারেও সেই বাংলা। তখন তো বিধিনিষেধের ডোরে আমরা বাঁধা। দুদেশের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। চিঠি পাঠাতে হতো ভিনদেশের ডাকব্যবস্থার মাধ্যমে। বাংলাদেশের ভেতরে কী ঘটছে না ঘটছে, তা জানার সুযোগ ছিল না। লিখতাম। এসব কথাই লিখতাম 'পরিক্রমা'তে। বাংলাদেশের বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের জন্য মন-কেমন-করা কথা। আর এই মন-কেমন-করা কথার মধ্যেই মনের কথা খুঁজে পেলেন এ দেশের মানুষ।

একদিনের একটা পরিক্রমার কথা মনে পড়ছে। ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে কিছুদিন আগেই। তবুও শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকত একটা সবুজ রঙের ট্রেন। ওই ট্রেনটাই আসত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। আমার নিজেরই একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই ট্রেনটির সঙ্গে। কথার লড়াই চলছে তখন ভারত-পাকিস্তানের আকাশে-বাতাসে। এরই মধ্যে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে এসেছি পাবনায় বাবার কাছে। ইচ্ছে ছিল, নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাবনায় গিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আসব। তারিখটা মনে নেই– সেপ্টেম্বরের একদিন। হঠাৎ বাবার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম– অ্যাটেন্ড শিয়ালদহ স্টেশন...। নির্দিষ্ট দিনে স্টেশনে গেলাম। যথারীতি পূর্ব পাকিস্তান থেকে সবুজ রঙের ট্রেনটা এসে দাঁড়াল। স্ত্রী-পুত্র-বোন নামল ট্রেন থেকে। ওদের কাছ থেকে জানলাম, আমার কয়েকজন মুসলিম বন্ধু গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিল যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারত-পাকিস্তান লড়াই বাধবে। আর পাকিস্তানে যেসব ভারতীয় নাগরিক ছিলেন, তাঁদের গ্রেফতার বা অন্তরিন করা হবে। ওরা তাই তড়িঘড়ি করে আমার স্ত্রী-পুত্র ও বোনকে দর্শনা পর্যন্ত এসে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছে। দর্শনা হলো বাংলাদেশের সীমান্ত স্টেশন। এসব কথাবার্তা শুনতে শুনতে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পৌঁছলাম আর তখনই মাইক্রোফোনে ঘোষণা করা হলো যে, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ট্রেন চলাচল ওইদিন থেকেই বন্ধ রইল। রাতে রেডিওতে খবর শুনলাম, ভারত-পাকিস্তান লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

এককথায়– পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবোধের স্ফুরণের মুহূর্তগুলোর আমিও ছিলাম অন্যতম সাক্ষী। সেসময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই হয় আমার পিতৃবন্ধু, না হয় আমার নিজের বন্ধু

যুদ্ধ শেষ হয়েছে একসময়। তাসখন্দ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা কাটল না। যাতায়াতের তো কথাই নেই। চিঠিপত্র লেখালেখি– সেও তো এক দুষ্কর ব্যাপার। আমাদের ঠিকানাটাই যেন হারিয়ে ফেললাম। বিদেশে বসবাসকারী পরিচিত কাউকে পূর্ব পাকিস্তানের ঠিকানা লেখা চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে হবে, তিনি আবার সেই চিঠি পুনরায় পোস্ট করবেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়। তখনও আমি আকাশবাণীতে যোগ দিইনি। পাবনায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে মা-বাবা ও অন্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের থেকে যাওয়ার উদ্বেগ আর আমার বাড়িতে না-যেতে পারার বেদনা– দুই মিলেমিশে মনটা কেমন ভারী হয়ে রয়েছে।

এই যে অবস্থা, এই অবস্থাটা তো আমার একার ছিল না, ছিল অধিকাংশ মানুষের। আকাশবাণীতে যোগ দিলাম ছেষট্টির ফেব্রুয়ারিতে। থাকতাম পাইকপাড়ার বাসায়। অনেকদিন আকাশবাণীফেরত শিয়ালদা হয়ে দমদম ছুঁয়ে বাড়ি পৌঁছতাম। তখনও সেই সবুজ গাড়িটা প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকত। কেমন যেন মলিন, ধূলিধূসর। সব গাড়ি যাচ্ছে-আসছে, ওই গাড়িটাই অনড়। সেসময় গিরিন চক্রবর্তীর একটি গান খুব চালু ছিল। যদ্দূর মনে পড়ছে, গানের লাইন ছিল এই রকম– 'শিয়ালদহ গোয়ালন্দ আজও আছে ভাই/আমি যাব

আমার বাড়ি সোজা রাস্তা নাই।' গাড়িটা দেখেই ওই গানটা মনে পড়ত। পুজোর কয়েকটা দিন আগে মহালয়া। আর মহালয়া মানেই তো বীরেন ভদ্র, বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক ও সহযোগী শিল্পীরা। ওঁদের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভোরের আকাশে ছড়িয়ে পড়তেই ছুটির মেজাজ এসে যেত। এবারও সেই ছুটির মেজাজ এলো; কিন্তু বাড়ি যাওয়া হবে না। পরিক্রমা লিখলাম– মহালয়া, ছুটির মেজাজ, সবুজ রেলগাড়ি আর গিরিন চক্রবর্তীর গানের পঙ্‌ক্তিগুলোর সূত্র ধরে। দেবু পড়ল। দেবুর পড়ার একটা মজা আছে। ও যখন স্ক্রিপ্ট পড়ে, তখন স্ক্রিপ্টটা অন্য কোনো লেখকের থাকে না। ওটা যেন পুরোপুরি ওর নিজের কথা হয়ে যায়। একটা আশ্চর্য একাত্মতা তৈরি হয়ে যায় স্ক্রিপ্টের ভাবনার সঙ্গে ওর কণ্ঠস্বরের। সেদিনও তা-ই ঘটল। দেবু পড়ছে, নিউজরুমে বসেই আমি শুনছি। ধীরে ধীরে মনটা যেন কেমন ভারী হয়ে উঠল। বেতার অনুষ্ঠানের এই এক মজা। ইথার তরঙ্গে ভেসে গেল, কোথায় পৌঁছল, আদৌ পৌঁছল কি না, সাড়া জাগল কি না– তার হদিস পাওয়া ভার।

পরের দিন সকালের শিফটে আমার আর দেবুর ডিউটি ছিল। সেদিনও সকালের খবর পড়া শেষ করে দেবু কেবল ওপরে উঠে এসেছে। ক্যান্টিনে চায়ের অর্ডার গেছে। এমন সময় ৩০-৩৫ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক এসে হাজির। উসকো-খুসকো চুল, চোখ দুটো লালচে। একটা অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে। ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন– আমি একটু দেবদুলালবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই। দেবু তখন ওর পুরু লেন্সের চশমা দিয়ে খবরের কাগজের হরফগুলোকে ধরার চেষ্টা করছে। আমি দেবুকে ডেকে বললাম, দেবু, ইনি তোকে খুঁজছেন। দেবু মুখ তুলতেই ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন, একটু কথা ছিল। যদি একটু বাইরে আসেন...। দেবু বারান্দায় গেল। আমি তখন চোখ রেখেছি খবরের কাগজের পাতায়। চার-পাঁচ মিনিট পরেই দেবু ঘরে ফিরে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে বলল– কী লিখেছিস রে কাল পরিক্রমায়? ভদ্রলোক কেঁদেকেটে একশা। বারবার দু-হাত ধরে বলছিলেন, আমার মনের কথা আপনি জানলেন কী করে? জানেন, এইবারই প্রথম পুজোর ছুটিতে বাড়িতে যেতে পারব না, মাকে দেখতে পাব না। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল সব পরিক্রমার ক্ষেত্রে। আমার কথা কেমন করে যেন সবার কথা হয়ে যেত।

পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যকামিতা, নিষ্ঠুর শোষণ ও সামরিক শাসন রুখতে ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমান তুলে ধরলেন তাঁর ছয় দফা দাবি, শুরু করলেন তাঁর স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন

মধ্যিখানে চর

এমনি করেই চলতে চলতে সংবাদ পরিক্রমা পা দিল সত্তরের দশকে। কত বিষয় নিয়েই না লেখা হয়েছে পরিক্রমা– রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য– হেন বিষয় নেই, যা স্থান পায়নি সংবাদ পরিক্রমার পাতায়। কিন্তু সত্তরের দশকে এসে তার নতুন চেহারা। 'সংবাদ পরিক্রমা' তখন কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামসঙ্গী। রাজনৈতিক পশ্চাৎপটটা একটু জেনে নেওয়া যাক এই সুযোগে।

১৯৬৫ সালেই আইয়ুব খান প্রবর্তিত বুনিয়াদি গণতন্ত্রের নির্বাচন হলো। এই বুনিয়াদি গণতন্ত্র ব্যাপারটা নির্বাচনি কারচুপির একটা সুসভ্য রূপ। পাকিস্তানের তো দুটি খণ্ড– পশ্চিম এবং পূর্ব। মাঝখানে হাজার যোজন ফারাক– মানসিকতায়, ভাষায়, রুচিতে। এই দুই খণ্ডের মধ্যে পূর্ব খণ্ডটি অখণ্ড হলেও পশ্চিম খণ্ডটি গোটা চার-পাঁচ প্রদেশের সমষ্টি। তা আইয়ুব খান নির্বাচনি স্বার্থ মাথায় রেখে প্রাদেশিক হিসাব ঘুচিয়ে দিয়ে 'ওয়ান ইউনিট' ব্যবস্থা চালু করলেন। এই ব্যবস্থায় আমজনতা নির্বাচনি ভোট দিয়ে ইলেকটোরাল কলেজ গঠন করবেন। যদ্দূর মনে পড়ছে, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ছিল ৮০ হাজারের মতো। পশ্চিম পাকিস্তানেও এর কাছাকাছি। এরাই হলো বুনিয়াদি গণতন্ত্রী এবং এরাই হলো প্রেসিডেন্টের নির্বাচকমণ্ডলী। আইয়ুব খান নির্বাচনে দাঁড়ালেন, আর সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের প্রার্থী হলেন কায়েদ-ই-আজমের ভগিনী ফাতেমা জিন্নাহ। এই মুষ্টিমেয় নির্বাচকমণ্ডলীকে টাকা দিয়ে ভয় দেখিয়ে কিনে নেওয়া তো খুব কঠিন ব্যাপার নয়। হলোও তাই। ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হলেন। আইয়ুব খান আবার প্রেসিডেন্ট হলেন। পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের আন্দোলন কিন্তু ভেঙে গেল না। সিকান্দর আবু জাফর কবিতা লিখলেন– 'জনতার সংগ্রাম চলবেই।' কবিতা গান হলো, স্লোগান হলো, ছড়িয়ে পড়ল বাংলার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলা

পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যকামিতা, নিষ্ঠুর শোষণ ও সামরিক শাসন রুখতে ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমান তুলে ধরলেন তাঁর ছয় দফা দাবি, শুরু করলেন তাঁর স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন। ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাঁদের দেশকে বলতে শুরু করেছেন পূর্ব বাংলা। ওদিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের তুঘলকি কাণ্ডেরও যেন শেষ নেই। তিনি ফতোয়া দিলেন– বাংলাও নয়, উর্দুও নয়, বাংলা এবং উর্দুকে মিলিয়ে একটি মিলিজুলি জবান তৈরি করে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। তাঁর দেশের দু-খণ্ডের ঐক্য সুদৃঢ় করতে। আরবি হরফে বাংলা লেখার মতো এ প্রয়াসও ব্যর্থ হলো। রবীন্দ্রনাথও নতুন করে আক্রান্ত হলেন '৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর। রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হলো। প্রতিবাদের ঝড় উঠল। পূর্ব বাংলার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন– 'বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনাকে যেমন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় না, তেমনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে পৃথক করা সম্ভব নয়।'

এই যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে!

শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবি যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, পূর্ব বাংলার মানুষ যখন সেই দাবির সমর্থনে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে এক মিথ্যা মামলা সাজালেন। সামরিক ও অসামরিক কিছু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বলা হলো, এরা পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য ভারতের সঙ্গে চক্রান্ত করেছে। প্রথমদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকায় শেখ মুজিবের নাম ছিল না। পরে ওই নামটি ঢুকিয়ে দিয়ে শেখ মুজিবকেও গ্রেফতার করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবিসহ মোট ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে গঠন করলেন ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রব, সিরাজুল ইসলাম, নূরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখের নেতৃত্বে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। ছাত্র-জনতা ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলো। এত মানুষ রাস্তায় যে, সৈন্যদের রাইফেল তুলে ধরার জায়গাটুকুও নেই। উনসত্তরে উঁকি দিল বায়ান্নর মুখ। উদ্বেলিত জনস্রোতে ভেসে গেল মিথ্যা ও সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ২৩ ফেব্রুয়ারি রুদ্ধ কারার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি তাঁকে সংবর্ধনা জানাল। তাঁকে অভিহিত করা হলো 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে। এই সময়েই শোনা যেতে লাগল 'জয় বাংলা' স্লোগান। ঘরে ঘরে গীত হলো 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' এই যৌবন জলতরঙ্গে খড়কুটোর মতো ভেসে গেলেন আইয়ুব খান।

পূর্ব বাংলা থেকে বাংলাদেশ

আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে– ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে জানালেন, তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারকে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া। বাতিল করা হলো সংবিধান। বাংলাদেশের

মানুষ তখন থেকে বলতে শুরু করলেন, সংবিধান যখন নেই, তখন পূর্ব পাকিস্তান নামটাও নেই। কাজেই এখন থেকে 'আমার দেশ তোমার দেশ– বাংলাদেশ।'

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা

নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর হলো এই নির্বাচন। ১২ নভেম্বর শতাব্দীর প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হলো বাংলাদেশ। সেই ঘূর্ণির তাণ্ডবে নিহত হলেন লাখ লাখ মানুষ। ধূলিসাৎ হলো কয়েক লাখ বাড়িঘর। উপকূলবর্তী এলাকাগুলো হয়ে উঠল এক বিস্তীর্ণ গোরস্থান। শামসুর রাহমান লিখলেন– 'কাঁদো বাংলাদেশ কাঁদো।' কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন তুললেন, 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়।' ত্রাণকার্যে শৈথিল্য দেখালেন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ। ভারত সরকার বিমানে পাঠাল ত্রাণসামগ্রী, পাঠাল ওষুধপত্র। সিকান্দর আবু জাফর ততদিনে তাঁর কবিতায় সরাসরি বলে দিয়েছেন, 'এবার তুমি বাংলা ছাড়ো।' শেখ মুজিব বললেন, 'শৈথিল্য না দেখালে হাজার হাজার মানুষকে বাঁচানো যেত।' মওলানা ভাসানী বললেন– 'পাকিস্তানের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের কর্তৃত্বের আর কোনো অধিকার নেই।'

এই পটভূমিতে ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন হলো। আর সেই নির্বাচনে জাতীয় সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাদেশিক পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ, অনুমোদিত হলো শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবি।

এবার ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে একটু অন্য কথা বলি। বলি সংবাদ পরিক্রমার কথা। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, পরিক্রমার কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে এত কথা বলা কেন? হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে। কারণ, পরিক্রমা সেই মুহূর্তে ইতিহাসের কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির প্রতিটি দিক তাতে প্রতিফলিত হতো। রেডিও পাকিস্তান পাকিস্তানিদের কথা বলত। কিন্তু বাংলাদেশের বঙ্গ ভাষাভাষী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার মুখপত্র হয়ে ওঠে এই পরিক্রমা। কারণ আমরাও যে বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, বিশ্বাস করি উদার মানবিকতার আদর্শে। এই পরিক্রমা রচনা করেছিল এপারের সঙ্গে ওপারের এক আশ্চর্য সেতুবন্ধ।

আরও একটা রেনেসাঁস

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু বলতে গেলে আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বলে মনে করি। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন, যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলন– এর সূচনা হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। যে মুহূর্তে বাংলা ভাষা আক্রান্ত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই শুরু হলো বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। পাকিস্তানের খোয়াব গেল মুছে। নতুন করে চেনা শুরু হলো বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে। আর ঠিক সেজন্যই সে দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলেছে। একটা কথা অনেক সময়েই ভাবি– দেশভাগের নানা অসুবিধার আমরা সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের অনেকেরই পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা নানারকম সামাজিক ব্যাধির কারণ হয়েছে। পুরোনো মূল্যবোধগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও যেটুকু যা অবশিষ্ট ছিল, তা-ও ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি অন্য একটা চিত্রও আছে। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে বাংলাদেশে যেন আরেকটা রেনেসাঁস হয়ে গেল। 'আ মরি বাংলা ভাষা'কে ঘিরে অসংখ্য নতুন বই লেখা হলো, নতুন নতুন কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখা হলো। গবেষণার ধারা বয়ে চলল নতুন নতুন খাতে। সবমিলিয়ে বলা যেতে পারে যে, ওপার বাংলায় বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটল। এপারেই হোক, ওপারেই হোক– মোদ্দাকথা এটাই যে, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাটি স্ফীত ও বহুমুখী হলো।

দেশভাগের এই সুফলটি সংস্কৃতিসেবী হিসেবে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু এটা তো আলাদা প্রসঙ্গ। আমি যেটা বলতে চাইছি তা হলো এই– বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের খুঁটিনাটি বিষয়েও চটজলদি প্রভাব পড়েছে সে দেশের কবিতায়, সে দেশের গল্প-উপন্যাসে, সে দেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যে। নানাভাবে ওইসব রচনা আমার হাতে এসে পৌঁছত। এর কিছু কিছু অংশ, বিশেষ করে কবিতার অংশ সংবাদ পরিক্রমায় ব্যবহার করা হতো। এদেশের কবি-সাহিত্যিকরা তো ছিলেনই। যে সময়ের কথা বলছি, সেসময় শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কাজী সব্যসাচী– এরকম আরও দু-চারজন কবিতা আবৃত্তিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু অবিনয়ের অপরাধ নেবেন না, রেডিওতে, বিশেষ করে সংবাদ পরিক্রমায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম বসু, তরুণ চক্রবর্তীর কণ্ঠে কবিতাংশ উচ্চারিত হতে হতে স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে আবৃত্তি পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আগে বিচিত্রানুষ্ঠানে এক-আধজন কবিতা পড়তেন। কিন্তু এখন কবিতা নিজেই হয়ে ওঠল একটি অনুষ্ঠান। টিকিট কেটে শ্রোতারা যোগ দিতে লাগলেন আবৃত্তির অনুষ্ঠানে। বেরিয়ে এলেন প্রদীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, নীলাদ্রিশেখর বসুর মতো আরও অনেক আবৃত্তিকার। বিভিন্ন জায়গায় আবৃত্তির ক্লাসও হতে থাকল। কী! একটু বেশি দাবি করে ফেললাম কি? বোধহয় না। একুশে ফেব্রুয়ারিকেও এ বঙ্গের মানুষের চেতনায় জাগ্রত করেছিল এই সংবাদ পরিক্রমাই– প্রতিবছর এই দিনটিকে স্মরণ করে।

আরও একটি বাঁক

ইতিহাসের আরেকটি মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। আশ্চর্য সেই নির্বাচন। প্রাদেশিক সভায় এবং জাতীয় সভায় শেখ মুজিবুরের আওয়ামী লীগ পেল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, ছয় দফার ভিত্তিতেই সংবিধান রচনা করা হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও বললেন, মুজিবই হবেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু বলতে গেলে আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বলে মনে করি। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন, যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলন– এর সূচনা হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে

ঘূর্ণিঝড়ের জন্য যেসব আসনে নির্বাচন স্থগিত ছিল, সেগুলোতেও জিতল আওয়ামী লীগ। জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান একবার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আরেকবার পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। কখনো ঢাকায়, কখনোবা করাচিতে এই আলোচনা চলতে থাকল।

একাত্তরের ৩০ জানুয়ারি একটি ভারতীয় বিমানকে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হলো লাহোরে। ঢাকা থেকে লাহোরে উড়ে গিয়ে ভুট্টো আন্তর্জাতিক আচরণবিধি লঙ্ঘন করে বিমান ছিনতাইকারীদের অভিনন্দন জানালেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও ২ ফেব্রুয়ারি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওই বিমান ধ্বংস করা হলো। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ আবার শুরু করলেন ভারতবিরোধী প্রচারণা।

বাতাসে বারুদের গন্ধ

১৯৭১-এর ৩ ফেব্রুয়ারি। ভারত তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দিল। ওদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া-ভুট্টোর শলা-পরামর্শ চলতেই থাকল। একসময় শেখ মুজিব জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকতে বিলম্ব হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। ওদিকে ভুট্টো জানালেন দুই প্রদেশের দুটি দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, জাতীয় সভার অধিবেশন ৩ মার্চ ঢাকায় বসবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো জানালেন, ছয় দফা সূত্র তাঁর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, তিনি জাতীয় সভার অধিবেশনের আগেই সব নেতার সঙ্গে ছয় দফা সূত্র নিয়ে কথা বলতে রাজি আছেন।

২২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর অসামরিক মন্ত্রিপরিষদ বরখাস্ত করলেন। মার্শাল ল' প্রশাসক ও প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচনের রায় বানচাল করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে। ১ মার্চ জাতীয় সভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হলো। ঢাকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হাঙ্গামা ঘটতে থাকল। সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষও ঘটল। সেন্সরশিপ আরোপ করা হলো। কারফিউ জারি করা হলো। ২ মার্চ থেকে শুরু হলো আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১০ মার্চ সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন। শেখ মুজিব সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। অসহযোগ আন্দোলন চলতেই লাগল।

৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার মারফত জানালেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় সভার অধিবেশন বসবে। ওইদিনই জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হলো।

আর সেই কণ্ঠস্বর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঘোষণা করল– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই প্রথম স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম, এক নয়া ইতিহাসের সম্মুখীন হতে চলেছে উপমহাদেশের মানুষ

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

বলেছি আগেই, সেসময় দুদেশের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের খবর এসে পৌঁছতে লাগল ইতস্তত ও বিক্ষিপ্তভাবে। কোন খবর কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা-ও তো বোঝার উপায় নেই। তবুও নিয়মিতভাবে মনিটর করা হতো রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। মার্চের গোড়া থেকে এই বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের ধারাও যেন একটু বদলে গেল। কিছু কিছু গান প্রচারিত হতো, যা দেশাত্মবোধক; কিন্তু পাকিস্তানি ধ্যানধারণার সঙ্গে মেলে না।

তারিখটা এখনো মনে আছে। ৮ মার্চ, সকাল ৮টা। কান রয়েছে ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের দিকে। ভেসে এলো এক ঘোষকের কণ্ঠস্বর। গতকাল অর্থাৎ ৭ মার্চ রমনা ময়দান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ভাষণ সরাসরি প্রচার করার কথা ছিল; কিন্তু প্রচার করা যায়নি। আজ সকাল সাড়ে ৮টায় রেকর্ড করা সেই ভাষণ প্রচারিত হবে। চমকে উঠলাম। এ কী ব্যাপার! শেখ মুজিব তো বিরোধী পক্ষের নেতা, তাঁর ভাষণ রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত হবে, অন্য কোনো সময় নয়– এমন একসময়, যখন বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক শাসন চলছে। বাসা থেকে বেরিয়ে আকাশবাণী কলকাতার নিউজরুমে একটা ফোন করলাম। সহকারী বার্তা সম্পাদক বিভূতি দাশ ছিলেন তখন ডিউটিতে। তাঁকে অনুরোধ করলাম, ওই ভাষণ 'অব দ্য এয়ার' রেকর্ড করতে। ফোন করেই বাড়ি ফিরে এলাম। নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলো রেকর্ড করা সেই ভাষণ। ভাষণ তো নয়, একটা মুক্তিকামী দেশের কণ্ঠস্বর। আর সেই কণ্ঠস্বর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঘোষণা করল– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই প্রথম স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম, এক নয়া ইতিহাসের সম্মুখীন হতে চলেছে উপমহাদেশের মানুষ। দুপুর ১২টা নাগাদ অফিসে পৌঁছতেই বিভূতিদা জড়িয়ে ধরলেন। ওই ভাষণ নিয়ে তখন হইচই চলছে– একে কপি করে দাও, তাকে কপি করে দাও– এই সব।

৮ মার্চ তো ওই ভাষণ ঢাকা থেকে রিলে করা হলো। মওলানা ভাসানীও দাবি জানালেন, পূর্ব বাংলাকে স্বাধীনতা দেওয়া হোক। ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা করার জন্য। একদিকে আলোচনা চলতে লাগল, অন্যদিকে সেনাবাহিনী অসামরিক ব্যক্তিদের ওপর গুলি চালাল জয়দেবপুরে। ভুট্টোও এলেন ঢাকায়। সেই সময় খবর আসতে থাকল যে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা আনা হচ্ছে ঢাকায়।

২৩ মার্চ– পাকিস্তান দিবসে শেখ মুজিবের নির্দেশে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হলো।

অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন

২৫ মার্চ, ১৯৭১। দুপুর থেকেই বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে বারুদের গন্ধ। দেড়টা নাগাদ ঢাকায় খবর পৌঁছল চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ ঘটেছে। নিহত হয়েছেন বহু মানুষ। সৈয়দপুরে এমনই সংঘর্ষে কুড়িজন নিহত ও শতাধিক আহত হলেন। রংপুরে কারফিউ জারি করে ডেপুটি কমিশনারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলো। ঢাকায় তখন চাপা উত্তেজনা। বিকেলের দিকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যেতে শুরু করল– যখন ঢাকার রাজপথে সামরিক বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়িগুলো একটি-দুটি করে বেরিয়ে পড়তে শুরু করল। সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বিশেষ বেতার ভাষণে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও চক্রান্তের অভিযোগ আনলেন। শেখ মুজিব তাঁর অনুগামী নেতৃবৃন্দকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে 'প্রতিরোধের দুর্গ' গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন। রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে এলো ছাত্র-জনতা, তৈরি করা হলো ব্যারিকেড। ঘড়িতে তখন রাত ১১টা। ভুখা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি বাহিনী। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, স্টেনগান প্রভৃতি অতি আধুনিক অস্ত্র থেকে অবিরত গোলাগুলি বর্ষিত হতে থাকল নিরস্ত্র একটি জনপদের ওপর। আক্রান্ত হলো পুলিশ লাইন, ছাত্রদের হোস্টেল, অধ্যাপকদের কোয়ার্টারস, বুদ্ধিজীবীদের বাড়িঘর, মন্দির-মসজিদ, সংবাদপত্রের অফিস, আক্রান্ত হলো শহর, আক্রান্ত হলো গ্রাম। এককথায়– যা কিছু বাংলার, যা কিছু বাঙালির।

এখন যেভাবে লিখছি, তত বিশদভাবে তখনও তো খবর এসে পৌঁছায়নি। সংবাদের সব সূত্রগুলোকে ছিন্ন করে দিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী। মানবতার বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সুসভ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ফিরে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। গণহত্যার খবর গোপন রাখতে বিদেশি সাংবাদিকদের বিমানবন্দি করে ঢাকা থেকে ফেরত পাঠানো হলো। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের ভেতরে এক গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে এক বিবৃতি প্রচার করে জানানো হলো যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্য ও স্বীকৃতিদানের আবেদন জানিয়েছেন।

২৫ মার্চ যদি হয়ে থাকে কালদিন, তবে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ তারিখটি বাংলাদেশে সোনার জলে লেখা একটি দিন– স্বাধীনতা দিবস।

চট্টগ্রামে মুক্তাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র থেকেও ২৭ মার্চ বিদ্রোহী পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর জিয়াউর রহমানও শেখ মুজিবের ঘোষণার সূত্র ধরেই হানাদার বাহিনীদের বিরুদ্ধে পালটা আঘাত হানার আহ্বান জানালেন।

বোঝা গেল, শেখ মুজিবের নির্দেশমতো স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

প্রথম খবর

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া কিছু টুকরো খবরের ভিত্তিতে ২৬ মার্চ সকালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলো ছোট্ট এক খবর– পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আর এর সঙ্গে বাজানো হলো 'চল চল চল/ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটির যন্ত্রসংগীতে নিবদ্ধ সুর। স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে বলব, সম্ভবত গৌরী ঘোষ পড়েছিলেন এই সংবাদকণিকা। না, এর আগে বা এর পরে আর কখনো আকাশবাণী থেকে এভাবে প্রচারিত হয়নি কোনো খবর।

দিন এগোচ্ছে, বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে ছিটেফোঁটা করে খবর আসছে বাংলাদেশের গণহত্যার। সংবাদ লিখছি, পরিক্রমাও লিখছি। কিন্তু লিখতে বসে চোখ ফেটে জল আসছে। গলার কাছে একটা আবেগ জমাট বেঁধে আছে। আরও অনেকের মতো আমারও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব রয়েছেন বাংলাদেশে। তাঁদের কোনো খবর পাচ্ছি না। কিন্তু এটা তো শুধু আমার একার অবস্থা নয়। অসংখ্য মানুষের এই অবস্থা। ধীরে ধীরে আমার ব্যক্তিসত্তা যেন মুছে গেল। আমিও সেই অসংখ্য মানুষের একজন হয়ে গেলাম। হয়ে গেলাম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একজন শব্দসৈনিক। পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ে আমার কথা সবার কথা হতে দেখেছিলাম; কিন্তু এখন দেখলাম, সবার কথাই আমার কথা হয়ে যাচ্ছে।

এই তো বাংলাদেশ

দিন গড়িয়েছে আরও অনেক। বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছিল, এর রূপ হয়েছে আরও স্পষ্ট। আমার কাজ ছিল নিউজ ডেস্কে, তবু সময় ও সুযোগ মতো 'সংবাদ বিচিত্রা'র প্রযোজক উপেন তরফদারের সঙ্গে বারবার ছুটে গিয়েছি সীমান্ত অঞ্চলে। সংগ্রহ করেছি সেই গণহত্যার খবর। উপেন তরফদার দিনের পর দিন রেকর্ড করেছেন হানাদার বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত মানুষের কথা, আর মুক্তিপিয়াসী মানুষের সুদৃঢ় প্রত্যয়ের কথা। এমনই একদিন পরিচয় ঘটল ছোট্ট মেয়ে আয়েশার সঙ্গে। পৃথিবীতে যত রকমের লাঞ্ছনা ও অবমাননা আছে, তার সবকটিই সহ্য করতে হয়েছে ওই কিশোরী কন্যাকে। অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে মেয়েটি। আর সেই কান্নাভেজা গলাতেই সে গেয়ে উঠেছে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' –এই তো বাংলাদেশ, এই তো বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। লিকলিকে বেতের ডগার মতো, মাথা নোয়ায়; কিন্তু ভেঙে পড়ে না, আবার খাড়া হয়ে ওঠে।

একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত

যোগাযোগব্যবস্থা অপ্রতুল, খবর যাচাই করার কোনো উপায় নেই। একটা অস্পষ্টতার আবরণ চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এরই মধ্যে পরিক্রমা লিখছি। একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রায় প্রত্যেক দিন। সংশয় দেখা দিচ্ছে মনে– কি, ঠিক লিখছি তো? ধরতে পারছি তো ইতিহাসের ইঙ্গিত?

২৭ মার্চ দিল্লির সংসদে সদস্যদের উদ্বেগের ভাগীদার হয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের ঘটনাবলি সম্পর্কে জানালেন। বঙ্গানুবাদ থেকে লিখছি: 'আমরা আশা করেছিলাম, পাকিস্তানের নির্বাচন প্রতিবেশী দেশে একটা নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে– যার ফলে আমরা আরও ঘনিষ্ঠতর হয়ে নিজেদের জনগণের আরও সেবা করে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারব, তা হয়নি।

পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার একটা অপূর্ব সুযোগ হারিয়ে গেছে। হৃদয়বিদারকভাবে এবং দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই সেই সুযোগ হারিয়ে গেছে। এ সম্পর্কে বলার মতো যথেষ্ট শক্ত ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। এই পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব আমরা ঘটনাবলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি।'

বুঝতে পারলাম, ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। আমাদের পরিক্রমায় তারই প্রতিফলন ঘটতে থাকল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতররূপে।

দুই বেতারের লড়াই

দিন যায়। গণহত্যার শিকার হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশের এখান-সেখান থেকে আশ্রয় ও নিরাপত্তার সন্ধানে ভারতে চলে আসতে শুরু করলেন। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের গণহত্যা এবং মুক্তিসংগ্রামের কিছু কিছু টাটকা খবর এসে পৌঁছতে শুরু করল। রেডিও পাকিস্তান ঝিঁঝিপোকার মতো একটানা বলে চলেছে, পূর্ব পাকিস্তানে সবকিছুই স্বাভাবিক, গণহত্যার খবর মিথ্যে। আর আমরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের কাছ থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সংবাদ ও সংবাদ পরিক্রমায় হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন তুলে ধরতে লাগলাম।

একেকটা দিন আসছে আর বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার খবর পৌঁছাচ্ছে। এমনি করেই খবর এলো অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রমুখের নিহত হওয়ার খবর। এমনি করেই একদিন খবর এলো কবি বেগম সুফিয়া কামালও নিহত হয়েছেন। সংবাদে সে খবর প্রচার করাও হলো। তখন আকাশবাণীতে পাকিস্তানি বেতার মনিটর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিমলা থেকে শংকর দাশগুপ্ত এসেছেন এই মনিটরিং ইউনিটে ভারপ্রাপ্ত অফিসার হয়ে। আকাশবাণীর এই মনিটরিং ইউনিটটি ছিল স্টুডিও চত্বরে। স্টুডিও একতলায় আর আমাদের নিউজরুম ছিল দোতলায়। যে দিন বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হলো, এর পরদিন রাত ৯টা নাগাদ শংকর হাঁপাতে হাঁপাতে নিচ থেকে উপরে উঠে এলো। আমার সঙ্গে দেখা হতেই চাপা গলায় বলল– একেবারে বেইজ্জতি কাণ্ড। কাল আমরা বলেছি বেগম সুফিয়া কামাল নিহত হয়েছেন আর আজ ঢাকা থেকে একটু আগে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচার করা হলো। চল শুনবি। ছুটে গেলাম নিচে। টেপটা প্লেব্যাক করে শুনলাম ৩০-৪০ সেকেন্ডের একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। একজন বললেন– বেগম সুফিয়া কামাল, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে খবরে বলা হয়েছে যে, আপনি না কি নিহত হয়েছেন। তা এ সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন? বেগম সুফিয়া কামাল জবাব দিলেন– দেখছেন তো আমি মারা যাইনি। –ব্যস এইটুকুই অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠানটিই ওরা কিছুক্ষণ অন্তর বেশ কয়েকবার প্রচার করল। উদ্দেশ্য স্পষ্ট– আকাশবাণীর খবর যে মিথ্যে, তা প্রমাণ করা। রাগে লজ্জায় প্রচণ্ড রকম আলোড়িত হলাম। অত রাতে এই প্রচারের কোনো জবাব দেওয়া গেল না। রাতের বুলেটিন শেষ করে যখন বাড়ি এসে পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় ১২টা। মাথায় আগুন জ্বলছে,

দিন এগোচ্ছে, বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে ছিটেফোঁটা করে খবর আসছে বাংলাদেশের গণহত্যার। সংবাদ লিখছি, পরিক্রমাও লিখছি। কিন্তু লিখতে বসে চোখ ফেটে জল আসছে

খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল। গিন্নিকে বলে এক কাপ কফি খেয়ে দুই প্যাকেট সিগারেট সামনে রেখে ওই রাতেই বসে গেলাম জবাবি পরিক্রমা লিখতে। অনেক কাটাছেঁড়ার পর লেখা যখন শেষ হলো, তখন প্রায় রাত তিনটে। কোনো কপি রাখিনি; কিন্তু এখনো মনে আছে পরিক্রমাটা। তখন চলছে মিনি সাইজের যুগ। এখানে-ওখানে বেরোচ্ছে মিনি পত্রিকা, মিনি গল্প, মিনি কবিতা ইত্যাদি। আমিও এই জায়গাটি থেকেই শুরু করলাম। অভিনন্দন জানালাম রেডিও পাকিস্তানকে চল্লিশ সেকেন্ডর এই মিনি সাক্ষাৎকার প্রচারের জন্য। ধন্যবাদ জানালাম, বেগম সুফিয়া কামাল যে মারা যাননি– এই তথ্যটি উপস্থাপন করে সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের মনের উদ্বেগ লাঘব করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্ষোভও প্রকাশ করলাম, বেগম সুফিয়া কামালের টাটকা কোনো কবিতা প্রচার করা হলো না বলে। বেগম সুফিয়া কামাল এবং বাংলাদেশের অন্য কবি-সাহিত্যিকরা তখন মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে গল্প-কবিতা লিখে চলেছেন। অপ্রকাশিত সেসব কবিতার কিছু কিছু সীমান্তের এপারেও চলে আসছিল। এসব কথা জানানোর পর রেডিও পাকিস্তানকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, বেগম সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎকার প্রচার করে তারা যেমন আমাদের উদ্বেগ লাঘব করেছেন, তেমনি আশা করব, অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সাক্ষাৎকারও তেমনি করে প্রচার করা হবে। পরের দিন রাত ১০টায় এই সংবাদ পরিক্রমা প্রচারিত হলো। তার পরে যে কী হলো, আর তো কিছু জানার উপায় নেই।

কিন্তু দিন দশ-বারো পরে একটি ঘটনা ঘটল। নিউজরুমে বসে কাজ করছি, হঠাৎ দ্বীপেশ ভৌমিক, আমাদের বার্তা সম্পাদক আমাকে ডেকে

পাঠালেন। ভৌমিকের ঘরে গিয়ে দেখি, এক প্রৌঢ় বসে আছেন। আমি ঢুকতেই ভৌমিক বলে উঠলেন, ইনিই প্রণবেশ সেন। ওই পরিক্রমাটি এঁরই লেখা। ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমার নাম সৈয়দ আলী আহসান। আপনার ওই পরিক্রমা আমাদের যে কী বাঁচান বাঁচিয়েছে। রেডিও পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার আমার ও অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন। ওই সাক্ষাৎকারে আমাদের বলতে হতো যে, আকাশবাণী দিনের পর দিন বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যুর মতো বাংলাদেশের গণহত্যা ও মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে মিথ্যা তথা প্রচার করে চলেছে। কিন্তু আপনার এই পরিক্রমা প্রচারিত হওয়ার পর ওরা ওই কর্মসূচি বাতিল করে। কারণ ওরা ততক্ষণে বুঝতে পারে, একটি মিথ্যা দিয়ে শত শত সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। চিত্রপরিচালক সুভাষ দত্তও এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। কিছুদিন পর রেডিও পাকিস্তানের কয়েকজন কর্মী যখন এপারে চলে এলেন, তখন তাঁদের কাছে শুনেছিলাম যে, বেতারের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার, নাম সম্ভবত ব্রিগেডিয়ার সালে, ঢাকা বেতারের সব কর্মীকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– তোমরা আকাশবাণী শোন? তোমাদের ওই দেবদুলালের মতো লিখতে হবে! সত্যি একটা বেতার অনুষ্ঠান জনগণকে যে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, ওই সময়েই তার প্রমাণ পেয়েছিলাম।

> কিছুক্ষণ সুর ভেঁজে টেবিলে তবলার বোল বাজিয়ে অংশু গেয়ে উঠল– 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রণি...'

শোনো একটি মুজিবরের থেকে...

তখন তো এদেশে সবার মনে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নিয়ে গল্প লেখা হচ্ছে, নাটক লেখা হচ্ছে, প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, লেখা হচ্ছে কবিতা, লেখা হচ্ছে নতুন নতুন গান। বাংলা সাহিত্যের পশ্চিমখণ্ডে ততদিনে একটি নতুন উপশাখা সংযোজিত হয়ে গেছে, যাকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম শাখা।

একটা গানের কথা মনে পড়ছে, এই গানটি প্রথম প্রচারিত হয়েছে রেডিওতে, রেকর্ড হয় তার পরে। লোকসংগীতশিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরী, অংশুমান রায় ও গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার থাকতেন গড়িয়া অঞ্চলে। একটা চায়ের দোকানে ওঁদের আড্ডা বসত। সেদিনও বসেছে। কথার পিঠে কথা জমছে। কিন্তু গৌরীদা কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক। একসময় পকেট থেকে একচিলতে কাগজ বের করে কী একটা লিখতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝেই কথা ছুড়ছিলেন আড্ডাটাকে তেজি রাখতে। কিছুক্ষণ বাদে গৌরীদা, অংশু আর দীনেনকে বললেন, দেখ তো গানটা চলবে কি না। পড়া শেষ হতেই লাফিয়ে উঠল অংশু। বলল– গৌরীদা, এটা আপনি কাউকে দিতে পারবেন না। গানটায় সুর দেব আমি, গাইবও আমি। কিছুক্ষণ সুর ভেঁজে টেবিলে তবলার বোল বাজিয়ে অংশু গেয়ে উঠল– 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রণি...।'

এর কদিন পর দেবুদের বাড়িতে আড্ডা জমেছে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী কামরুল হাসানের সঙ্গে। উপেন তরফদারও সেখানে হাজির তাঁর টেপরেকর্ডারসমেত। গিয়েছিল কামরুল ভাইয়ের সাক্ষাৎকার নিতে। এমন সময় অংশু এসে পৌঁছল পূর্ণদাস রোডের ওই বাড়িতে। কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। অংশু সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল– 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে...।' টেবিলে তাল ঠুকতে থাকল দীনেন। উপেনের টেপরেকর্ডারও চালু হয়ে গেছে ততক্ষণে। ওই আড্ডার শেষে উপেন ও অংশু চলে এলো রেডিওতে। আমাকেও ডেকে নিল উপেন। তিনজনে বসলাম নিউজরিলের কক্ষে। গানটা বারদুয়েক শোনা হলো। ঠিক হলো এই গানটা আমরা এখনই প্রচার করব না। প্রচার করব একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। আরও ঠিক হলো গানটির সঙ্গে যখন 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' কথাটা ফিরে আসবে, তখন ওই ইন্টারলুডে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের কিছু কিছু অংশ ইনসার্ট করা হবে। গানটা সযত্নে নিউজরিলের লকারে রেখে দেওয়া হলো।

চলো মুজিবনগর

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একপর্যায়ে এলো ১২ এপ্রিল। গঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। শেখ মুজিবুর রহমান হলেন রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান হলেন ত্রাণমন্ত্রী। এর পরের দিন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণে বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

তারিখটা মনে আছে ১৬ এপ্রিল। রাতে নিউজরুমে কাজ করছি, বুলেটিন শেষ হলো, এবার ঘরে ফেরার পালা। প্রস্তুত হচ্ছি। হঠাৎ বার্তা সম্পাদক দ্বীপেশ ভৌমিক ডেকে বললেন– আপনি আর উপেন আজ রাতে বাড়ি ফিরবেন না। কেন? পরে বলব। সবাই চলে যাওয়ার পর তিনি জানালেন, গাড়ি প্রস্তুত রয়েছে, রাত তিনটেয় প্রেস ক্লাবে যেতে হবে। সেখানে বিএসএফের পিআরও সমর বসু থাকবেন। সমর বসু যা বলবেন, তা-ই করতে হবে। বাড়িতে না ফেরার খবরটা দিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছে গেলাম প্রেস ক্লাবে। গিয়ে দেখি, একের পর এক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে দেশি-বিদেশি বহু সাংবাদিকের ভিড়। সমরদাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। এই মাঝরাতে তলব? সমরদা উত্তর না দিয়ে প্রায় না চেনার ভান করে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। একটু অবাক হলাম তাঁর ব্যবহারে। সমরদা আমাদের বহু পরিচিত। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি থামার শব্দ। সমরদা এগিয়ে গিয়ে দুজনকে স্বাগত জানিয়ে আনলেন ঘরের ভেতরে। যদ্দূর মনে পড়ছে, তাঁদের একজন ছিলেন যশোরের জেলা প্রশাসক। তিনি সমবেতভাবে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বললেন, বাংলাদেশ সরকার আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আপনারা ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে বাংলাদেশ যেতে পারেন। কথা শেষ। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গাড়িতে চাপলেন। গাড়ি ছুটল হুহু করে। আমরাও তাঁর পিছু নিলাম। প্রচণ্ড গতিতে গাড়িগুলো এগিয়ে চলেছে। এক ফাঁকে আমাদের ড্রাইভার ভবতোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি– আমরা কি তা জানি? ভবতোষবাবুকে বললাম, কোনো কিছু জানার দরকার নেই, শুধু এই গাড়িগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালান। রাতের নৈঃশব্দ্যকে খান খান করে দিয়ে গাড়ি ছুটছে। স্পিডোমিটারের কাঁটা ৮০-৯০-এর মাঝে থরথর করে কাঁপছে। অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করল। বোঝা গেল, আমরা কৃষ্ণনগরে এসে পড়েছি। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে এবার আমাদের এগোনোর পালা। বেশ কয়েক কিলোমিটার এগোনোর পর গাড়িগুলো থামল। বলা হলো, এবার হেঁটে একটু এগিয়ে যেতে হবে। কত কী যে ভাবনা চলছে মাথায়, কী ঘটতে পারে তা নিয়ে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পৌঁছানো গেল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে। ওই গ্রামের নাম তখন মুজিবনগর। বিশাল এক আম্রকুঞ্জে বেশ কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন। আনাগোনা করছেন এমন কিছু কিছু মানুষ, যাঁদের হাতে রাইফেল, এলএমজি প্রভৃতি। বাংলাদেশের পতাকা চারিদিকে পতপত করে উড়ছে। জানা গেল, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীরা সেখানে শপথ নেবেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেক অনেক বছর আগে পলাশীর এক আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। সেই পলাশী থেকেই কিছু দক্ষিণে আরেক আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো।

১৭ এপ্রিল বেলা ১১টা। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এলেন। 'জয় বাংলা' আর 'জয় মুজিব' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল অনুষ্ঠানস্থল। সশস্ত্র আনসার দল উপরাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানাল। এরপর সবাই আসীন হলেন মঞ্চে। অনুষ্ঠান শুরু হলো 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি দিয়ে।

আওয়ামী লীগের চিফ হুইপ ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন। বাংলাদেশের পটভূমি বিশ্লেষণ করে ওই ঘোষণাপত্রে বলা হলো– 'সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যে ম্যান্ডেট দিয়াছেন, আমরা সেই বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা একটি গণপরিষদে গঠিত হইয়া পারস্পরিক আলোচনা করিয়া বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার বলবৎ রাখিবার জন্য বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করিতেছি এবং তদ্দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।...

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।'

এরপর অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে বললেন– 'পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হলো, তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তা মুছে দিতে পারবে না। এখন যুদ্ধ এসে গিয়েছে। এই যুদ্ধ স্বাধীনতার অস্তিত্বের যুদ্ধ। পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালির অস্তিত্বের যুদ্ধ। হাটেবাজারে নদীনালায় আমাদের সৈনিকরা লড়েছেন, লড়ছেন আর লড়বেন। তাঁরা এই দেশের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক বেড়াজাল ভেঙে জয়লাভ করবেন। আমরা পরাজিত হওয়ার জন্য যুদ্ধে নামিনি।'

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বললেন, 'পাকিস্তানের জনগণের বহু কষ্টার্জিত বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ে অতীতের পাকিস্তান দেশের প্রতিরক্ষার জন্য বহু অর্থমূল্য দিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরসম্ভার সংগ্রহ করেছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা, সেই অস্ত্র এখন নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।'

তিনি বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর কাছে পুনরায় কূটনৈতিক স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে বললেন, 'পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য মানবসন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে।' পরে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, পূর্ব বাংলার কতটা অঞ্চল তাঁদের অধিকারে? তাজউদ্দীনের জবাব– 'সবটাই, কয়েকটা সামরিক ঘাঁটি বাদে।' তিনি জানান যে, কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং কর্নেল আবদুর রবকে চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষ হলো। অর্থমন্ত্রী মনসুর আলীর সঙ্গে একটু আলাদাভাবে দেখা করলাম। তিনি আমার পিতৃবন্ধু। পাবনা-সিরাজগঞ্জের মানুষ। মনসুর কাকার সঙ্গে আমাদের প্রায় পারিবারিক সম্পর্ক। তাঁর কাছেই প্রথম খবর পেলাম আমার বাবা-মায়ের।

এর পরেই কলকাতা সংবাদ শিরোনামে চলে এলো। দিল্লির দুই পাকিস্তানি কূটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন আগেই, এবার কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করলেন এবং পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনকে রূপান্তরিত করলেন বাংলাদেশ মিশনে। আমার মনে আছে, এই দুটি ঘটনা একটি 'সংবাদ পরিক্রমা' এবং 'সংবাদ বিচিত্রা'য় 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে' গানটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তুমুল হইচই পড়ে যায় বাংলাদেশে। দাবানলের মতো গানটি ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্টিয়া অঞ্চলে একদল মুক্তিসংগ্রামী এসে এই গানটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। বলেন, তাঁদের যখন হতাশায় ভেঙে পড়ার উপক্রম, তখন এই গানটিই মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে 'সংবাদ পরিক্রমা'র মতো এই গানটির অবদানও অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের মুক্তির পর বাংলাদেশ সরকার এরই স্বীকৃতিতে পরিক্রমা লেখক প্রণবেশ সেন, পরিক্রমা পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শোনো একটি মুজিবরের' গানটির শিল্পী অংশুমান রায় এবং গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে 'বঙ্গবন্ধু' স্বর্ণপদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। ভারত সরকার দেবুকে সম্মানিত করে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে। একটি দেশের বেতারের অন্য একটি দেশের মুক্তিসংগ্রামে এভাবে সহায়ক হওয়ার ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা নেই।

২৫ মে চালু হলো স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার মুজিবনগর থেকে। তখন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যখন যেখানে, সেটিই হতো মুজিবনগর। কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে ছিল এই স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের স্টুডিও। আকাশবাণী পেল আরেক সংগ্রামের সঙ্গী। এই দুই বেতারই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অমানবিকতার বিরুদ্ধে। লড়েছে গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে।

দুই বেতারের কর্মী ও শিল্পীদের মধ্যেও গড়ে উঠল সখ্য। আকাশবাণীর নিউজরুমের পেছনে– বিধানসভার দিকে যে ছোট্ট একফালি বারান্দা ছিল, প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে সেখানে আমাদের আড্ডা জমত, আসতেন সৈয়দ হাসান ইমাম, কামাল লোহানী, শহীদুল ইসলাম, আসরাফ-উল-আলম, আমিনুল হক বাদশা, গাজীউল হক, আলমগীর কবীর, অজিত রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, আপেল মাহমুদ, এমআর আখতার মুকুল এবং আরও অনেকে। এদের সঙ্গে কথা বলেও বাংলাদেশের ভেতরকার অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি।

যদ্দূর মনে পড়ছে, এই মে মাসের গোড়ার দিকেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে লাগল সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' পত্রিকা। ওই পত্রিকায়ও পাওয়া যেত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের তথ্যনিষ্ঠ চিত্ররূপ।

এত রক্ত মধ্যযুগও দেখেনি কখনো

তারিখটা ঠিক মনে নেই। ডায়েরির পাতায় একটা পরিক্রমার খসড়া দেখতে পাচ্ছি। লেখাটা শুরু হয়েছিল এইভাবে– 'ওরা আসছেন। আসছেন তো আসছেনই। শহর থেকে, গ্রাম থেকে, নদীনালা-খালবিল পেরিয়ে, অরণ্য-পর্বত ডিঙিয়ে। ওরা আসছেন নৌকোয়, গাড়িতে, পালকিতে, পায়ে হেঁটে, কোলে-কাঁধে চেপে। ওরা আসছেন নাৎসি জার্মানদের কবল থেকে পালিয়ে আসা ইহুদিদের মতো। ওরা আসছেন ইসরাইল অধিকৃত প্যালেস্টাইন থেকে হটিয়ে দেওয়া আরবদের মতো। ওরা আসছেন ভিয়েতনামি শরণার্থীদের মতো। কিন্তু না, কোনো শরণার্থী সমাগমের সঙ্গেই তুলনা হয় না বাংলাদেশ থেকে চলে আসা এইসব শরণার্থীর। আর এই শরণার্থীরা শিকার হয়েছিলেন নৃশংসতম এক নারকীয় অভিযানের। এদের কেউ কেউ আহত, কেউ কেউ সর্বস্ব খোয়ানো, কেউ কেউ স্বজন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। কেউ কেউ অপুষ্টিতে এবং অসুস্থতায় ভুগছেন। সবাই প্রায় আতঙ্কগ্রস্ত। মানবিক মর্যাদার এতটুকু অবশেষও তাঁরা দেখতে পাননি, এতদিন যাঁদের ভাই বলে ভেবে এসেছেন, সেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে।'

> তিনি বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর কাছে পুনরায় কূটনৈতিক স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে বললেন, 'পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য মানবসন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে'

একজন জার্মান সাংবাদিক এই বিশাল শরণার্থীশিবিরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'এ তো ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এক ভয়ংকর আক্রমণ। এক-দুই নয়, হাজার-হাজার নয়, লক্ষ-লক্ষ নিরস্ত্র সৈন্য পাঠাল তারা সীমান্তের ওপার থেকে। এদের বিরুদ্ধে তো অস্ত্র দিয়ে লড়াই করা চলে না, স্নেহ দিয়ে, মানবিকতা দিয়ে এবং মমতা দিয়ে এদের গ্রহণ করতে হয়। এক-একজন শরণার্থী নিপীড়ন, নির্যাতন ও অত্যাচারের এক-একটি করুণ কাহিনি। আবার এদের মধ্যেই দেখেছি প্রগাঢ় দেশপ্রেম এবং মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা।'

পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না; কিন্তু দরজা খোলা ছিল সীমান্ত এবং মনের। ফলে যে যেখানে পেরেছেন, আশ্রয় নিয়েছেন। ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসামসহ

পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, অন্য সব রাজ্যেও তিল ঠাঁই আর নাইরে। ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়। হিংসা ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের প্ররোচনাও রয়েছে দাঙ্গা বাধানোর। এই সময় সহায়-সম্বলহীন পুষ্টিহীন রোগজীর্ণ আহত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায় বহন করা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

নিউজ পত্রিকায় টনি ক্লিফটন লিখেছেন– 'যে কেউ ক্যাম্প বা হাসপাতালে গেলে বিশ্বাস করবে যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে কোন রকম অত্যাচার করতে সক্ষম। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এমন বহু শিশুকে আমি দেখেছি বেত মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছে। চোখের সামনে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে, কিংবা নিজের মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার দেখে একেবারে মূক হয়ে গেছেন এমন লোকও আমি দেখেছি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানে শত শত মাইলাই ও লিডিসেস অনুষ্ঠিত হয়েছে।'

শরণার্থীশিবিরগুলো দেখে এইসব অভিজ্ঞতার কথা দিনের পর দিন লেখেছি 'সংবাদ পরিক্রমা'য়। এ তো যাঁদের দেখেছি তাঁদের কথা। যাঁদের দেখিনি, যাঁরা বাংলাদেশের ভেতরে হানাদার বাহিনীর হাতেই নিহত হয়েছেন, তাড়া খেয়ে এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন, বহু শ্রমে এবং স্বপ্নে গড়ে তোলা এক চিলতে বাড়িতে যাঁরা শবদেহ হয়ে পড়ে থেকেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা বলব কেমন করে? সীমান্তের এপার থেকে তো তাঁদের দেখা যায় না। তবু যেটুকু দেখেছি, যেটুকু শুনেছি, তা থেকে মনে হয় মধ্যযুগও এত রক্ত দেখেনি কখনো। খোজাডাঙা শিবির থেকে

পরিক্রমায় লিখতাম, বিশ্বের এই বৃহত্তম ত্রাণ অভিযানের একথা-সেকথা। আর সব কথার শেষ কথা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি কবিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তি– 'আমি তোর জন্ম-সহোদর'

আকাশবাণীতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ইত্তেফাকের সাংবাদিক আবেদ খান। তাঁর কাছেও শুনেছি বাংলাদেশের ভেতরের মর্মান্তিক অবস্থা।

আগত শরণার্থীদের একটা মোটা অংশেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছিল সীমান্ত এলাকায়। এই শরণার্থীদের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে এসেছিলেন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, ব্রিটিশ এমপি ব্রুস ডগলাসম্যান, আর্থার বটলমি, এসেছেন রাষ্ট্রসংঘের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিশনার প্রিন্স সদরউদ্দিন আগা খান এবং আরও অনেকে। তাঁরা নিন্দা করেছেন পাকিস্তানের অত্যাচারের, প্রশংসা করেছেন ভারতীয় ত্রাণ প্রয়াসের। বহু বিদেশি সাংবাদিকও এসেছেন। এঁদের কথা নিয়ে, এঁদের অনুভব নিয়েও পরিক্রমা লিখেছি একের পর এক।

আমি তোর জন্ম-সহোদর

বারবার গেছি এই শিবিরগুলোতে, লক্ষ করেছি মানবিক চেতনার এক আশ্চর্য প্রকাশ। এসব অঞ্চলে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের অনেকের গায়েই ছিল দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন। ভারত-পাকিস্তানের ইতিহাস– সে তো অবিশ্বাসের ইতিহাস, সন্দেহ-বিদ্বেষ ও দাঙ্গার ইতিহাস। অথচ সবাই এক লহমায় সেই পূর্ব ইতিহাস মুছে ফেলে বুকের দরজা খুলে দিয়ে, ধর্মের বেড়াকে টপকে গিয়ে আগত শরণার্থীদের আলিঙ্গন করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, শুশ্রূষা দিয়েছেন। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, বৌদ্ধ নয়, খ্রিষ্টান নয়, এপার-ওপার নয়– সবার পরিচয় এক– মানুষ নামধারী একদল ভুখা নেকড়ের হাতে আক্রান্ত আরেকদল মানুষ এসেছেন একটু আশ্রয় পেতে। একেকজন শরণার্থী যেন একেকটি কাহিনি। সেই কাহিনি কখনো শৌর্যের, কখনো বীর্যের, কখনো চোখের জলের। কখনো অত্যাচার সহ্য করার অপরিসীম ক্ষমতার।

ভারতের সাধ্য ছিল সীমিত। ত্রাণ সাহায্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি মিলেছে যতটা, সহায়তা মেলেনি ততটা। ভারতীয় অর্থনীতি বিপর্যয়ের কিনারায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তবু এই শরণার্থী পুনর্বাসন এ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। ভারতের ছাত্র-জনতা, শিল্পী-বুদ্ধিজীবী, শ্রম ও কৃষিজীবী মানুষ– যে যেমন করে পেরেছেন এই পুনর্বাসন প্রয়াসে শামিল হয়েছেন অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, মমতা দিয়ে। যা ছিল পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের লড়াই, তা-ই এই অভূতপূর্ব শরণার্থী সমাগমের ফলে হয়ে দাঁড়াল ভারতের সমস্যা। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, সর্দার স্মরণ সিং, ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ ও অন্য নেতৃবৃন্দ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে গিয়ে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালি কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করেছেন, সমস্যার রাজনৈতিক ও মানবিক সমাধানের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করার কথা বলেছেন।

এসব ঘটনা, এসব কাহিনি, এসব প্রয়াসের বৃত্তান্ত দিনের পর দিন পরিক্রমায় তুলে ধরেছি। আশ্চর্য ছিল সেই সময়টা, যখন ভারত সরকার, ভারতীয় জনগণ এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা অভিন্ন বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছিল। আকাশবাণী হয়ে উঠেছিল মুক্তিপ্রেমী, গণতন্ত্রপ্রেমী এবং অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। পরিক্রমায় লিখতাম, বিশ্বের এই বৃহত্তম ত্রাণ অভিযানের একথা-সেকথা। আর সব কথার শেষ কথা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি কবিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তি– 'আমি তোর জন্ম-সহোদর।'

লড়াইয়ের মুখোমুখি আমরা

উত্তেজনায় উদ্দীপনায় শপথে অঙ্গীকারে কেটে গেল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের আট মাস। শুরু হলো নভেম্বর। তখনও জানা নেই কীভাবে কোন লগ্নে বাংলাদেশের মুক্তি হবে। দিনের পর দিন কাটছে এক অপরিসীম প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে, মুক্তিসংগ্রামীদের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে।

সেদিন ছিল তেসরা ডিসেম্বর। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন কলকাতায়। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁর সভা হবে বিকেলে। সকাল থেকেই কলকাতা এক স্লোগান-নগরী। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনো স্থান নেই, যেখান থেকে মিছিল করে মানুষ আসেননি ওই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য। এঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে নানা স্লোগান। কখনো 'ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ', কখনো, 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ', কখনো আবার 'বাংলাদেশের মুক্তি চাই/ভারত-বাংলাদেশ ভাই-ভাই।' সবার মনেই জল্পনাকল্পনা চলছে– কী বলবেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশকে কি কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, না কি বলবেন আর কিছু? ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড তখন জনসমুদ্র। প্রধানমন্ত্রী এলেন নির্দিষ্ট সময়েই। ভাষণ শুরু করলেন– সেই ভাষণে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন যেমন পুনর্যোজিত হলো, তেমনি পাকিস্তানের উদ্দেশে বলা হলো, 'আমরা যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।' মন ভরল না শ্রোতাদের। তাঁরা যে শুনতে চান, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত সাফল্যের কথা। বাংলাদেশকে ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের কথা। প্রধানমন্ত্রীও কেমন যেন খানিকটা আচমকাই তাঁর ভাষণ সংক্ষিপ্ত ও শেষ করলেন।

ফিরে এলেন রাজভবনে। যদ্দূর মনে পড়ছে, সেদিন তাঁর কলকাতায় থাকার কথা ছিল; কিন্তু সভা থেকে ফিরে রাজভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি সাংবাদিকদের জানালেন যে, তিনি তক্ষুনি দিল্লি ফিরে যাচ্ছেন। কারণ পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। আসলে এটাই ছিল পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেক। ভারত পালটা আক্রমণ চালাল। পশ্চিম ও পূর্ব দুই খণ্ডই হয়ে উঠল রণাঙ্গন।

দিল্লিতে ফিরে গিয়ে রাতে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার ঠিক আগেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত বেতার-ভাষণে বললেন– দেশ ও জনগণের একটা বিরাট বিপদের মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে কথা বলছি। কয়েক ঘণ্টা আগে তেসরা ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৫টার পরই পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনী আকস্মিকভাবে অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রায় আমাদের বিমানঘাঁটির ওপর আক্রমণ

হেনেছে। তাদের স্থলবাহিনী সোলাই মানকি, ক্ষেমকারান, পুঞ্চ ও অন্যান্য সেক্টরে আমাদের অবস্থানের ওপর শেল নিক্ষেপ করেছে। ...আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ...দেশকে যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই।

এই লেখা যখন লিখছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা নতুন করে গজিয়ে উঠছে মনের ভেতর, সেদিনের সেই রাতের উত্তেজনা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর ওই ভাষণের একটু পরেই ভাষণটির বঙ্গানুবাদ প্রচার করা হবে। রাতের ট্রান্সমিশন কিছুক্ষণের জন্য এক্সটেন্ড করা হলো। বার্তা বিভাগের সবাই তখন চলে গেছেন। রয়েছি আমি, বিভূতিদা আর দেবু। রেকর্ড করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা। সেই রেকর্ড একটু একটু শুনে আমি তা অনুবাদ করে বলছি, বিভূতিদা চটপট করে তা লিখছেন, তাও সঙ্গে সঙ্গে সেই পৃষ্ঠাটি চলে যাচ্ছে স্টুডিওতে দেবুর কাছে। থরথর করে কাঁপছি ভয়ে, উত্তেজনায়। ভয়– এত তাড়াতাড়ি অনুবাদ করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায়। কিন্তু না, তা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেবুর কণ্ঠে ইথার তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই ভাষণের বঙ্গানুবাদ। দেবুর পড়া শেষ হলো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কারও যেন চলাফেরার শক্তি নেই। মাথা ঝিমঝিম করছে। বাড়ি ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ঘুমোতে পারিনি।

পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর বিকেলে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিল। ভেবেছিল, হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের শক্তিকে ভোঁতা করে দেবে। কিন্তু সজাগ ভারতীয় বাহিনীর পালটা আঘাতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরিক্রমা সেই সময় যেন এলএমজির গুলি। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংশয় নেই, কোনো অস্পষ্টতা নেই। নির্ভুল লক্ষ্যে বর্ষিত হচ্ছে শত্রুকে লক্ষ্য করে।

জয় দিকে দিকে

যুদ্ধ হয়ে উঠল জোরালো। মুক্তিবাহিনী ততদিনে হয়ে উঠেছে সুসংগঠিত ও শানিত। জয় করছে এক-একটি ক্ষেত্র। তাদের অপূর্ব বীরত্বগাথা ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। বাংলাদেশের ভেতরে এতদিন যারা পাকিস্তানি হামলায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে তাঁরাও তেজি হয়ে উঠলেন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলোতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকল বাংলাদেশের অসামরিক প্রশাসন। অন্যদিকে ভারতীয় বাহিনীর লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিগুলোকে ঘিরে রেখে, কম সংখ্যক হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করা। প্রথম রাতেই বাজিমাত করল ভারতীয় বিমানবাহিনী। মিগের পরাক্রমে সাবাড় হয়ে গেল পাকিস্তানের স্যাবর জেটগুলো। বাংলাদেশের আকাশ হলো শত্রুমুক্ত। ভারতীয় নৌবাহিনী আক্রমণ চালাল চট্টগ্রাম, চালনা, কক্সবাজার এবং চাঁদপুরের ওপর। বন্দর বিধ্বস্ত হলো। স্তব্ধ হলো পাকিস্তানের রণতরির আনাগোনা এবং সেই সঙ্গে তাদের পালানোর পথ।

সেদিন ৬ ডিসেম্বর। নিউজরুমে ডিউটি করছি আমি আর দেবু। সকালে বুলেটিনগুলোর প্রচার সবে শেষ হয়েছে। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে গল্প করছি নিজেদের মধ্যে। বেলা তখন সাড়ে ১০টা। টেলিপ্রিন্টারে চোখ পড়তেই দেখি, খবর এসেছে লোকসভার অধিবেশনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সদস্যদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন–

'নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণ এবং ভারতবাসী আজ একই লক্ষ্যের, একই পথের পথিক ...

আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, একই আদর্শ ও ত্যাগে অনুপ্রাণিত ভারত ও বাংলাদেশের সরকার এবং জনসাধারণ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রসংহতি বজায় রাখা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সমান অধিকার এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা উপকারের ভিত্তিতে এক দৃঢ় মধুর সম্পর্ক গঠন করবে। এইভাবে একত্রে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে আমরা সৎ প্রতিবেশী হয়ে বাস করার জন্য এমন এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরব, যাতে এই অঞ্চলে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং প্রগতি চিরস্থায়ী হয়।

বাংলাদেশের প্রতি আমাদের শুভকামনা জানাই।'

প্রথমে ফ্ল্যাশ, তার পরে বিশদবিবরণ। সংবাদ সংস্থার টেলিপ্রিন্টারে খবরটা এলো এই পর্যায়ে। ফ্ল্যাশ দেখেই ছোট্ট একটা নিউজ করে দেবুকে দিলাম খবরটা পড়তে। তখন তো আমাদের বুলেটিনের সময় ছিল না। কোনো একজন বিশিষ্ট শিল্পীর খেয়াল পরিবেশিত হচ্ছিল। পরবর্তী বুলেটিন দিল্লি থেকে, তাও আধঘণ্টা পরে। কিন্তু এতক্ষণ চেপে রাখব কী করে, এই খবরটা? দেবু ছুটল স্টুডিওতে। শিল্পীর অনুষ্ঠান সাময়িক বিরতি ঘটিয়ে ভারতের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার খবরটা প্রচার করা হলো। বুলেটিন শেষ হতেই ফোন করলাম বাংলাদেশ বেতারে। বন্ধু কামাল লোহানীকে জানালাম এই খবর। একটু থতমত খেয়ে কামাল হো হো করে উল্লাসে ফেটে পড়ল। ওর সেই হাসিটা আজও কানে বাজছে।

যাই হোক, খবরটা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহর তোলপাড়। উপেন তরফদার ছুটে এলো। আমি আর ও গেলাম সার্কুলার রোডে, যেখানে থাকতেন বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্বাগত প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর।

সেদিনও রাতে পরিক্রমা লিখেছিলাম আমিই। আর সেই পরিক্রমার প্রথম লাইনটি ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি– 'এদেশ আমার গর্ব/এ মাটি আমার কাছে সোনা।'

যৌথ কমান্ড গঠন

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর গঠন করা হলো ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর এক যৌথ কমান্ড। ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি জগজিৎ সিং অরোরা হলেন এই কমান্ডের প্রধান। এই যৌথ কমান্ডের নেতৃত্বে ইস্টার্ন কমান্ডের জওয়ানরা এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা লড়াইকে নিয়ে গেলেন

থরথর করে কাঁপছি ভয়ে, উত্তেজনায়। ভয়– এত তাড়াতাড়ি অনুবাদ করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায়। কিন্তু না, তা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেবুর কণ্ঠে ইথার তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই ভাষণের বঙ্গানুবাদ

বাংলাদেশের গভীরে। এরপর থেকে প্রতিদিনের ইতিহাস জয়ের ইতিহাস। সর্বত্রই অভূতপূর্বভাবে অভিনন্দিত হলেন যৌথ বাহিনীর জওয়ান ও অফিসাররা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কুচক্রীদের চক্রান্ত তখনও কিন্তু চলছে। পাকিস্তানি বাহিনীর ধারণা ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতকে চিহ্নিত করতে চাইলেন আক্রমণকারী হিসেবে। কিন্তু মার্কিন জনমত প্রতিধ্বনিত হলো সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির কণ্ঠে। তিনি বললেন: The war did not begin last week with military border crossings or last month with the escalation of artillery crossfire. This war began on the bloody night of March 25 with the brutal suppression by the Pakistan Army of the results of free election.

তবু ভবি ভুলল না। প্রেসিডেন্ট নিক্সন সপ্তম নৌবহরকে নির্দেশ দিলেন বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যেতে।

ওদিকে দিনের পর দিন যৌথ কমান্ডের জয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে। এই জয় কিন্তু সহজে আসেনি। বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করতে হানাদার বাহিনী 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করে নদীবহুল ওই দেশটির বিভিন্ন সেতু ভেঙে রেখেছিল। চলতে চলতে সেসব সেতু সারিয়ে নিতে হয়েছে জওয়ানদের। বাংলাদেশের বিরাট বিরাট নদী যে বাধার সৃষ্টি করেছিল, তা অতিক্রম করা হয়েছে ছত্রীসেনাদের সাহায্যে। কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে সৈন্য ও সমরাস্ত্রবোঝাই ভারী ভারী যানবাহন।

যৌথ কমান্ডের জওয়ানরা সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলায় পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যান্টনমেন্টগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের রসদে টান পড়ে। আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের সামনে গত্যন্তর ছিল না।

জেনোসাইড থেকে এলিটোসাইড

১৪ ডিসেম্বর সকালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী সাভারে পৌঁছে যায়। মুক্তিপ্রেমী মানুষের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে সিক্ত হন তাঁরা। এখন শুধু প্রতীক্ষা– কখন আসবে সেই নবজীবনের মুহূর্ত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ আকাশবাণীর মাধ্যমে সতর্ক করে দিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে। বললেন– আমি জানতে পেরেছি যে, বর্তমানে তোমরা বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে সমবেত হচ্ছ। তোমাদের আশা– হয়তো তোমরা পালাতে পারবে বা তোমাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সমুদ্রপথে তোমাদের পালানোর পথ আমি রুদ্ধ করে দিয়েছি, সেই জন্য নৌবাহিনীকে আমি নিয়োগ করেছি।

আমার এই পরামর্শ শুনে যদি তোমরা আমার সৈন্যবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ না করো বা পালাতে চেষ্টা করো, তা হলে নিশ্চিত মৃত্যু তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আত্মসমর্পণ করলে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী তোমাদের প্রতি মর্যাদা সহকারে ব্যবহার করা হবে।

বুড়িগঙ্গার তীর। শীতের আকাশ তখন সূর্যাস্তের রঙে রাঙা। ঘড়িতে তখন চারটে কুড়ি। ঢাকার রেসকোর্স ময়দান প্রত্যক্ষ করল এক ঐতিহাসিক দৃশ্য।

ভারতীয় বাহিনী চতুর্দিক দিয়ে তোমাদের ঘিরে ফেলেছে। তোমাদের বিমানবাহিনী এখন নিশ্চিহ্ন। সুতরাং তাদের কাছ থেকে যেমন কোনো সাহায্য লাভের আশা নেই, বাইরের কোনো বিমানবাহিনীর কাছ থেকে সাহায্য লাভের আশা নেই, বাইরের কোনো নৌবাহিনীর কাছ থেকে সহায্য লাভও সেই রকম দুরাশা। চট্টগ্রাম, চালনা ও মোংলা বন্দরগুলোও অবরুদ্ধ। সমুদ্রপথও তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারবে না। তোমাদের ভাগ্যও এখন তোমাদের বিরুদ্ধে। মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য স্বাধীনতাসংগ্রামী সংগঠনগুলো তোমাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের ওপর তোমরা যে নিষ্ঠুর বর্বর অত্যাচার করেছ, এর প্রতিশোধ নিতে তারা দৃঢ়বদ্ধ। এখন তোমাদের একমাত্র পথ হলো, অগ্রসরমান ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করা। মিথ্যা জীবন হারিয়ে লাভ কী? তোমরা কি দেশে ফিরে যেতে, স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হতে চাও না? তা হলে আর মিথ্যা দেরি কেন?

একজন সৈনিকের কাছে অস্ত্র তুলে দিতে লজ্জা নেই। আমি তোমাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আত্মসমর্পণ করলে তোমাদের সঙ্গে সৈনিকের মতোই ব্যবহার করা হবে। সময় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আত্মসমর্পণ করো, অন্যথায় তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

ততক্ষণে এদিকে-ওদিকে বিচ্ছিন্নভাবে হানাদারদের এক-একটি দল আত্মসমর্পণ করতে লাগল। এই আত্মসমর্পণের মুখেও পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্র তার ঘাতক রূপটিকে ছাড়তে পারল না। এতদিন ধরে চলছিল জেনোসাইড, পরাজয়ের অব্যবহিত আগেই তারা শুরু করল এলিটোসাইড– বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা অভিযান।

প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা

১৫ ডিসেম্বর সারা দেশ অপেক্ষা করছে পাকিস্তানবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরটুকু জানার জন্য। সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল– তবু সেই খবরটি পৌঁছল না। ওই ১৫ ডিসেম্বর রাতের পরিক্রমায় লিখলাম–

... বাংলাদেশে আমাদের সংগ্রামী বন্ধুরা, আজ এই রাতে তোমাদের জানাই ভারতের কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামী অভিনন্দন, লাখো লাখো সেলাম। কারণ আমি জানি, এই রাত ভোর হবে, পুবের আকাশে উঠবে নতুন সূর্য, আর ওই সূর্যকে ছিনিয়ে আনছ তোমরা– আমার সংগ্রামী ভাইয়েরা। আমি জানি ঢাকা মুক্ত হয়েছে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম গণতন্ত্রের রাজধানীরূপে। ইতিহাসের এই পরম ও অনিবার্য সত্যকে আমি এখনো ঘোষণা করতে পারছি না। কিন্তু এ-ও জানি, এ সত্যকে পৌঁছে দেবই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে– আজ নয়, কাল।

সূর্যাস্তে সূর্যোদয়

সেই কাল এলো– এলো ১৬ ডিসেম্বর। জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলেন। জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং, ব্রিগেডিয়ার ক্লে এবং টাইগার সিদ্দিকী ঢাকায় জেনারেল নিয়াজির সদর দপ্তরে গিয়ে চূড়ান্ত করলেন আত্মসমর্পণের পদ্ধতিপ্রকরণ।

দুপুরে ইস্টার্ন কমান্ডের মেজর জেনারেল জ্যাকব আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে ঢাকা রওয়ানা হলেন।

এর কিছু পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা, এয়ার মার্শাল দেওয়ান, ভাইস এডমিরাল কৃষ্ণান এবং মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকারকে নিয়ে ঢাকায় পৌঁছলেন।

বুড়িগঙ্গার তীর। শীতের আকাশ তখন সূর্যাস্তের রঙে রাঙা। ঘড়িতে তখন চারটে কুড়ি। ঢাকার রেসকোর্স ময়দান প্রত্যক্ষ করল এক ঐতিহাসিক দৃশ্য।

এগিয়ে এলেন বিজয়ী ও পরাজিত বাহিনীর নায়করা। স্বাক্ষরিত হলো ইনস্ট্রুমেন্ট অব সারেন্ডার। সেই দলিলে স্বাক্ষর দিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেল নিয়াজি এবং যৌথ কমান্ডের জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

বুড়িগঙ্গার তীরে সূর্য তখন অস্ত যেতে চলেছে। মুক্ত বাংলায়, স্বাধীন বাংলায় নতুন করে উঠবে বলে। প্রায় ওই সময়েই দিল্লিতে লোকসভায় সদস্যদের কানফাটানো করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন– ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী। লোকসভা এবং সমগ্র জাতি এই ঐতিহাসিক ঘটনায় আনন্দিত হবেন। জয়োৎসবের এই শুভ মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই সে দেশের সাহসী ও সংগ্রামী যুবকদের।

আমাদের লক্ষ্য ছিল সীমাবদ্ধ। তা হলো, সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে বাংলাদেশকে ও তাঁদের মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করা এবং আমাদের দেশ আক্রমণে বাধা দেওয়া। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একমুহূর্তও বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক বাহিনী থাকবে না। আমাদের আশা এই যে, নতুন জাতির এই সন্ধিক্ষণে এই নতুন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ন্যায্য স্থান গ্রহণ করে বাংলাদেশকে শান্তি, প্রগতি ও ঐশ্বর্যের পথে চালিত করবেন। এখন সময় এসেছে যখন তাঁরা সবাই একত্রে সোনার বাংলায় তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্ন দেখতে পারবেন। তাঁদের জন্য আমাদের শুভকামনা রইল।

হুমায়ুন আজাদ তাঁর ১৬ ডিসেম্বরের স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন–

'সন্ধ্যায় ইন্দিরার ভাষণ শুনে লাফিয়ে উঠলাম। ফিরে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা, স্বদেশ, বর্ণমালা, কবিতা।'

কিন্তু আমি কী লিখব এই ১৬ ডিসেম্বরের রাতে? আমি তো ঢাকায় নেই, রয়েছি কলকাতায়। কলকাতা তখন আক্ষরিক অর্থেই আনন্দনগরী। কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বিজয় দিবসের বিজয়োল্লাস। বিভিন্ন সূত্রে, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যেসব বিবরণ আসছে তাতেও তো মন ভরছে না। তবুও লিখতেই হবে। রাত ১০টায় প্রচার করতেই হবে 'সংবাদ পরিক্রমা'। লিখলাম– অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণকে আমি ভোঁতা করে দিয়েছি, স্বৈরতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গটা আমি ভেঙেচুরে চুরমার

করে দিয়েছি, প্রয়োজন হলে এক নদী রক্ত দেবার অঙ্গীকার ছিল, তা-ও পূরণ করেছি। আমি এক রণক্লান্ত সৈনিক– স্বাধীনতার সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনবার পর মুক্ত, আমি স্বাধীন।...

সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প

সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প একাত্তরের সংবাদ পরিক্রমার নটে গাছটি এখানেই মুড়োল। কিন্তু শেষ হলো না আকাশবাণীর কথা। সংবাদ পরিক্রমা লেখেছি আমি– তার কথাই বলা হলো। কিন্তু আরও কত অনুষ্ঠান হয়েছে। কবিতা সিংহের 'বঙ্গ আমার জননী আমার', দিলীপ সেনগুপ্তের 'রেডিও কার্টুন', সংগীত বিভাগ, নাটক বিভাগ, কথিকা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, যুববাণী– সব বিভাগই তো সেদিন ছিল বাংলাদেশময়। সব বিভাগই ছিল সেদিন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংগ্রামী সঙ্গী। হয়তো আর কেউ কোনোদিন লিখবেন এইসব বিভাগের কথা, আকাশবাণীর সামগ্রিক অবদানের কথা। আমি আমার পরিক্রমার কথাই শুধু বলেছি। প্রায় প্রত্যেক দিন একটি করে পরিক্রমা– ভাবুন তো সংখ্যাটা কী বিরাট! আর এই বিরাট সংখ্যক পরিক্রমার বেশির ভাগটাই গেছে হারিয়ে। পুনরাবৃত্তির ভয়ে কপিও রাখিনি। তবে বলতে পারি, এই রচনায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের যে রূপরেখাটি অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, তারই এক-একটি মুহূর্ত ছিল এই পরিক্রমার বিষয়বস্তু। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিক্রমার ভাষা বদলেছে। আঙ্গিকও বদলেছে, অপরিবর্তিত থেকেছে শুধু উচ্চারিত সত্য। এখান-সেখান থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সামান্য কিছু পরিক্রমা ও তার খসড়া সংগ্রহ করতে পেরেছি। সংযোজনা পর্বে সন্নিবেশিত করেছি সেই পরিক্রমাগুলো। সবই প্রায় একাত্তরের মার্চ-এপ্রিলের। আর কয়েকটি পেয়েছি একেবারে শেষদিকের– ডিসেম্বর মাসের। মিলিয়ে পড়লে হয়তো দেখা যাবে, পরিক্রমার এপার-ওপার কীভাবে এক কণ্ঠ হয়ে কথা বলছে।

পরিক্রমা-পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন– 'সংবাদ পরিক্রমার অধিকাংশ স্ক্রিপ্ট লিখতেন প্রণবেশ সেন। পূর্ব বাংলার নাড়ি নক্ষত্রের সঙ্গে ওঁর গভীর-নিবিড় পরিচয় ছিল, সেখানেই ছিল ওঁর আদি নিবাস। প্রণবেশের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভকাল কেটেছে পূর্ব বাংলার পাবনায় ওঁর নিজেদের বাড়িতে এবং হয়তো-বা আর কোথাও কোথাও। ওঁকে প্রশ্ন করে পূর্ব বাংলার মাটি ও মানুষ সম্পর্কে অনেক খবরাখবর প্রায়ই জেনে নিতাম ওঁর লেখা স্ক্রিপ্টের মহড়া দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে।

'এমনিভাবেই একটু একটু করে অজানা পূর্ব বাংলাকে মনে মনে জেনেছি, কল্পনায় গড়ে তুলেছি পূর্ব বাংলার মানসী মূর্তি। তারপর একদিন যখন সবিস্ময়ে দেখলাম, পূর্ব বাংলার যে মানুষ মাতৃভাষার মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে পিছপা হননি, তারাই মাতৃভূমির মুক্তির জীবনপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে কী অবর্ণনীয় আত্মত্যাগ ও অনন্যসাধারণ শৌর্যের বিনিময়ে ছিনিয়ে নিলেন দেশের স্বাধীনতা, তখন গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। স্বদেশের এত কাছে, সীমান্তের ওপারে আমারই মতো বাংলাদেশি মানুষ বন্ধনমুক্তির জন্য হাতিয়ার হাতে নিয়ে অকুতোভয়ে লড়াই করেছিলেন যখন, তখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগ কণ্ঠস্বরে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে লড়াই করার অসামর্থ্যকে ঢেকে দিতে চেয়েছিলাম। দীর্ঘ ৯ মাসের অরুন্তুদ যন্ত্রণার অবসানে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ– আমার দ্বিতীয় স্বদেশ।'

জন্মভূমি ও স্বদেশ আবিষ্কার– এই-ই তো 'একাত্তরের সংবাদ পরিক্রমা।'

সংযোজন: ১

আকাশবাণী সংবাদ পরিক্রমা/রাত ১০টা/৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

'এ দেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা'– এই কথা ঘোষণা করতে কতবার ভয়ে কেঁপেছি, দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি। ভেবেছি, এ শুধু কথার ফানুস, এর পেছনে সেই সত্য নেই, নিষ্ঠা নেই, যা কবিতার পঙ্‌ক্তিটিকে জীবন-সত্যে রূপায়িত করতে পারে।

বুকের মাঝখানটিতে কোথায় যেন একরাশ শ্যাওলা জমেছিল, দেখতে পাচ্ছিলাম না আমার নিজেকে কাকচক্ষুস্বচ্ছ সেই যে আমার হৃদয়কে, যা প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে, নিজেকে, বিশ্বমানবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মুক্তোর মতো দ্যুতিমান হয়ে ওঠে। ৬ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১০টা– কে জানত, আমার জন্যে, আপনার জন্যে, এ দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যে, এত বড় একটা গর্ব ইতিহাসের পক্ষপুট থেকে বেরিয়ে আসবে প্রকাশ্য দিবালোকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন, ভুল হলো, মানবসভ্যতার ইতিহাস যেন শ্রীমতি গান্ধীর কণ্ঠের মাধ্যমে জানিয়ে দিল: বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত স্বীকার করছে, বরণ করছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাকে। সেই মুহূর্তে চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, আমার ভয় ভীরুতা সংকোচ– মিথ্যা, আমার সবকিছু মেনে নেওয়ার, অন্যায়কে বরদাস্ত করবার প্রবণতা– মিথ্যা। সত্য– আমি আছি, আমি থাকব। প্রতিদিন, প্রতিমূহূর্তে, আমার জন্যে, তোমার জন্যে, সকল মানুষের জন্যে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমি বেঁচে থাকব। অসংখ্য ধন্যবাদ, কোটি কোটি ধন্যবাদ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি আমাদের সমস্ত রকমের অসম্মানের পর্দাটাকে ছিন্ন করে স্বাধীন সূর্যালোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কোটি কোটি হৃদয়ের ভাষাকে নিজের ঘোষণায় রূপ দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এক হিসেবে স্বীকৃতির ঐতিহ্য। ভারত স্বীকার করেছে মানুষই অমৃতের পুত্র; ভারত স্বীকার করেছে প্রতিটি মানুষের অধিকারকে; ভারত স্বীকার করেছে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সত্তায় ফুটে ওঠার পুষ্পিত হওয়ার অধিকারকে। বাংলাদেশের মানুষকে, তাঁদের মুক্তিসংগ্রামকে, স্বাধীনতার মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকারকে স্বীকার করে আমরা প্রমাণ করেছি, আমরা ঐতিহ্যচ্যুত ছিন্নমূল নই। আমরা দূর থেকে মানবিক মুক্তির কথার বেলুন ওড়াই না। আমরা সমৃদ্ধির স্বর্গে বাস করে, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কান্নার সুর নিয়ে বেহালা বাজাই না। আমরা গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে গণহত্যাকে প্রশ্রয় দিই না। আমরা মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম-সঙ্গী হই, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করি।

> সব বিভাগই ছিল সেদিন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংগ্রামী সঙ্গী। হয়তো আর কেউ কোনোদিন লিখবেন এইসব বিভাগের কথা, আকাশবাণীর সামগ্রিক অবদানের কথা

আমরা আমাদের স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাইনি, অর্জন করেছি, শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে তাকে জয় করেছি। আমরা জানি, স্বাধীনতা মানে বৃহত্তর কঠিন সংগ্রাম, স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা, স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার।

বাংলাদেশের স্বীকৃতি জানিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি– আমাদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় আমরা কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। যে আমেরিকা, কিউবা-সোভিয়েত সহযোগিতাকে নিজেদের সীমান্তের বিপদ ভেবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেয়, যে-আমেরিকা গণতন্ত্র বাঁচাবার নাম করে ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠায়, সেই আমেরিকা যখন পাকিস্তানের বর্বর আক্রমণের প্রকৃত তথ্য জেনেও আক্রান্তকে দোষারোপ করে, কিংবা যে-চীন আন্তর্জাতিক মুক্তি-সংগ্রামের নেতা সেজে, ঘরের কম্বোডিয়ার প্রিন্স, নরোদম সিহানুককে নিজের দেশের আশ্রয় দিয়ে তাঁর সরকারকে স্বীকৃতি জানায়, দেশের বিপ্লবের বাণী রফতানি করে, সেই চীনই যখন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মহান মুক্তিসংগ্রামকে ব্যঙ্গ করে, লক্ষ লক্ষ শহিদের প্রাণদানকে ঠাট্টা করে; ইয়াহিয়ার জঙ্গিশাহির সঙ্গে হাত মেলায়, তখন বলতে ইচ্ছে করে– ভাগ্যিস গোটা বিশ্ব আমেরিকা হয়নি, চীন হয়নি। তাই আশা জাগে, মানবসভ্যতা হয়তো শেষ পর্যন্ত অবিকৃতই থেকে যাবে।

শুনেছি, বাংলাদেশকে স্বীকৃত দেবার খবরে ক্ষিপ্ত করে চীন বলেছে, ভারত সম্প্রসারণবাদী, আমেরিকা বলেছে, ভারতকে দেয় সাহায্যের মোটা অংশ কেটে দিচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, সবিনয়ে বলছি: ঠিকই বলেছেন, আমরা সম্প্রসারণবাদী, তবে আমাদের লোভ সাম্রাজ্যের নয়, মানুষের মুক্তির সাম্রাজ্যের।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট নিক্সন, আপনাকেও বলছি, যদি ভেবে থাকেন, আপনার সাহায্য দিয়ে আপনি আমাদের স্বাধীনতাকে ক্রয় করবেন, তবে ভুল করেছেন। নিক্কন জেফারসনের দেশকে যদি আজ বোঝাতে হয়, টাকা দিয়ে জঙ্গিশাহিকে কেনা গেলেও স্বাধীনতাকে কেনা যায় না, তবে তার চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে! আমরা আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই, ভয় দেখিয়ে, লজেন্স দিয়ে কিছুদিন খোকাকে বশ করা গেলেও, সে যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তখন সে সঙ্গিধারী, স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে ওঠে, ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই-ই তার ধর্ম হয়। বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা নিজেকে, নিজের শক্তিকে জেনেছি। তাই আজ গলা ফাটিয়ে এ কথা বলবার যোগ্যতা অর্জন করেছি, শত্রুরা সব শোনো। এ দেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা।

বাংলাদেশে আমার সংগ্রামী বন্ধুরা– আজ এই রাতে তোমাদের জানাই কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামী অভিনন্দন, লাখো লাখো সেলাম। কারণ, আমি জানি– এই রাত ভোর হবে– পুবের আকাশে উঠবে নতুন সূর্য। আর সেই সূর্যকে ছিনিয়ে আনছ তোমরা– আমার সংগ্রামী ভাইরা

সংযোজন: ২

আকাশবাণী সংবাদ পরিক্রমা/রাত ১০টা/১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

বাংলাদেশে আমার সংগ্রামী বন্ধুরা– আজ এই রাতে তোমাদের জানাই কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামী অভিনন্দন, লাখো লাখো সেলাম। কারণ, আমি জানি– এই রাত ভোর হবে– পুবের আকাশে উঠবে নতুন সূর্য। আর সেই সূর্যকে ছিনিয়ে আনছ তোমরা– আমার সংগ্রামী ভাইরা। আমি জানি– ঢাকা মুক্ত হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম গণতন্ত্রের রাজধানীরূপে– ইতিহাসের এই পরম অনিবার্য সত্যকে আমি এখনো ঘোষণা করতে পারছি না, কিন্তু এও জানি, এই সত্যকে পৌঁছে দেবই– পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে– আজ নয়, কাল।

আমার সংগ্রামী বন্ধুরা, রণক্ষেত্রে তোমরা লড়ে চলেছ– আঘাতের পর আঘাত হানছ পৃথিবীর ঘৃণ্যতম, কুৎসিত স্বৈরতন্ত্রের দুর্গে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আজ তাকিয়ে রয়েছে তোমাদের দিকে– তোমাদের সাফল্য প্রত্যাশায়। এই রাতে, এই শীতে কাঁপন-লাগা রাতে, এই মুহূর্তে তোমরা কী করছ জানি না! হয়তো ঢাকায় প্রবেশ করছ, হয়তো শত্রুকে চরম আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। আমরা রণাঙ্গনে নেই, তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের সমস্ত মন পড়ে রয়েছে তোমাদের দিকে। আজ, আমাদের এক আশ্চর্য কোজাগরী স্বাধীনতা-সূর্যের প্রত্যাশায়, আজ আমি সারারাত দেশ-বিদেশের রেডিওর নব ঘুরিয়ে যাব। মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের পবিত্রতম মুহূর্তটি কখন আসে, কখন এলো– তা জানবার জন্য।

মুক্তিপাগল ভাইরা আমার– তোমাদের লড়াই, কঠিন লড়াই– অত্যন্ত কঠিন লড়াই। কারণ, তোমরা ধ্বংসের জন্য লড়ছ না– লড়ছ সৃষ্টির জন্য। তোমরা হত্যা করাবার জন্য লড়ছ না– লড়ছ হত্যাকারীর শানিত অস্ত্রটাকে ভোঁতা করে দেবার জন্য। তোমরা কারও স্বাধীনতা গ্রাস করবার জন্য লড়ছ না– তোমরা লড়ছ অপহৃত স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনবার জন্য। এ লড়াই একা তোমাদেরই লড়াই নয়, এ লড়াই বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের, প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের লড়াই। নাদির শা, হিটলার কিংবা আজকের শত্রু ইয়াহিয়া খানের লড়াই এ নয়– এ হলো মুক্তির লড়াই, মানবিকতার লড়াই। যদিও এই মুহূর্তে তোমাদের হাতের অস্ত্রগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ– শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করতে নির্ভুল লক্ষ্যে ধাবিত– তবুও বলব বন্ধু– এ লড়াইয়ে তোমার হাতিয়ার, তোমার সবচেয়ে বড় অস্ত্র– তোমার রাইফেল নয়, মর্টার নয়, শুভ্র মানবিক চেতনা।

সংগ্রামী বন্ধুরা আমার– তোমাদের বজ্রকঠিন আঘাতে, শত্রুর ব্যূহ ভেঙে চৌচির হয়ে পড়েছে– তোমরা ঢাকায় প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছ। কিন্তু কোন ঢাকা? আমি মনে করিয়ে দেব বন্ধু– তোমরা প্রবেশ করতে চলেছ, সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারের এবং তার পরে আরও লক্ষ লক্ষ নাম জানা, নাম না-জানা মানুষের বুকের রক্তে পবিত্র হয়ে ওঠা ঢাকায়। আজ মনে রেখো, কেন ওরা শহিদ হয়েছিল, কেন ওরা রক্ত দিয়েছিল? ওরা চেয়েছিল বাংলাকে সোনার বাংলা করতে– শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে। তোমাদের ওপর দায়িত্ব, ওদের রক্তের দাম শোধ করবার– ওদের বাংলা, বঙ্গবন্ধু মুজিবের বাংলাকে ফিরিয়ে আনবার, মুক্ত করবার। তাই বলছিলাম, শত্রু নিধন তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু মানুষ হত্যা নয়। একটি নিরপরাধ মানুষ, এদেশি হোক, বিদেশি হোক, তার গায়ে যেন আঘাত না লাগে। তোমরা ইয়াহিয়া বাহিনী নও– মুক্তিবাহিনী। অত্যাচার, লুণ্ঠন, নির্যাতন, জুলুম করতে নয়– এসব থেকে মানুষকে মুক্ত করতেই তোমরা অস্ত্র ধরেছ। যারা অপরাধ করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে– তাদেরও বিনা বিচারে হত্যা করবে না, সমর্পণ করবে তোমার কর্তৃপক্ষের কাছে। বিনা বিচারে হত্যা, বিচারের ভান করে হত্যা– এসব স্বৈরতন্ত্রে সাজে– তোমাদের নয়।

বন্ধুরা আমার– তোমরা যখন শত্রুকে শেষ আঘাত হানছ– সেই সময় জঙ্গিচক্রের দোসররা নতুন অজুহাত তৈরি করছে– সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে বানচাল করতে। সেই যারা গণতন্ত্রকে ধর্ষিত হতে দেখে মুখ বুজে ছিল, সেই যারা দশ লক্ষ মানুষকে মরতে দেখে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, যারা এক কোটি মানুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে দেখেও পাশ ফিরে শুয়েছিল– সেই তাদেরই অনেকে আজ অজুহাত সৃষ্টি করে সুযোগমতো ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ আমরা তাদের দেব না। বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় বাহিনীর অধ্যক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি বিদেশি নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখা হবে। মনে রাখবে বন্ধুরা, এ তোমাদেরই দায়িত্ব– তোমাদেরই রণকৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

ভাইরা আমার– আজ পরম গৌরবের মুহূর্ত সমাগত– সমাগত কঠিনতম দায়িত্ব পালনের মুহূর্ত। কঠিন সময়, মনুষ্যত্বের পরিচয়। বাংলার মানুষ, ভারতের মানুষ, সে পরিচয় উজ্জ্বল করে তুলতে কখনো ব্যর্থ হয়নি– ব্যর্থ হবে না– ব্যর্থ হতে পারে না। এই প্রত্যয় আবার ঘোষণা করছি এই রাতে– নতুন ভোরের প্রত্যাশায়।

সংযোজন: ৩

আকাশবাণী সংবাদ পরিক্রমা/রাত ১০টা/১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণকে আমি ভোঁতা করে দিয়েছি, স্বৈরতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গটা আমি ভেঙেচুরে চুরমার করে দিয়েছি, প্রয়োজন হলে এক নদী রক্ত দেবার অঙ্গীকার ছিল, তা-ও পূরণ করেছি। আমি এক রণক্লান্ত সৈনিক– স্বাধীনতার সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনবার পর মুক্ত, আমি স্বাধীন। আমি মানসচক্ষে ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে ছবি দেখছি– শহিদ মিনারটা পশুশক্তির দুঃসহ স্পর্ধার আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে; কিন্তু পলাশের কুঁড়িতে দেখো: সেই '৫২-র লাল আজও রয়ে গেছে অম্লান। আমি ছবি দেখছি– ছোট্ট ছেলে আজাদের বুকের 'রক্তে' ভেজা শার্টটা আজও কী করে যেন পতাকা হয়ে হাতে হাতে উড়ছে। আমি ছবি দেখছি– পল্টনের ময়দানের এখানে-ওখানে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মৃত মানুষের হাড়। ভালো করে তাকাও, দেখবে– আবার পল্টনের ময়দানে জনসমুদ্রের জোয়ার এসেছে, লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করে মানুষের মহিমাকে বড় করে তুলেছে। আমি ছবি দেখছি নির্বাচনোত্তর বিজয়োল্লাসের, আমি ছবি দেখছি– ৭ মার্চে ইতিহাসের কম্বু-কণ্ঠ ঘোষণা– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' অনেক পথ হেঁটেছি আমি, অনেক পথ।

অনেক সংগ্রামের যন্ত্রণাকে বুকে তুলে নিয়েছি আমি, অনেক যন্ত্রণা। আজ আমি রণক্লান্ত সৈনিক এক। ইন্দিরা-বঙ্গবন্ধুর ছবির সামনে দাঁড়াই, দর্পণে ছায়া পড়ে, চমকে উঠি কে এই দর্শক? আমি, না তুমি? তুমি, না আমি? আশ্চর্য আবিষ্কার। আমি তোর জন্ম-সহোদর।

আমি তোর জন্ম-সহোদর সংগ্রামের শান্তিতে হাসিতে কান্নায় রবীন্দ্র-নজরুলে এবং অ-আ-ক-খ বর্ণমালার বর্ণাঢ্য পতাকার নিচে– আমি তোর জন্ম-সহোদর। ঘরের দাওয়ায় লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ দেখার আকুল আকাঙ্ক্ষায়, পীরের দরগায় মঙ্গলার্থীর প্রদীপ জ্বালোনায় তুমি আছ, তাই আমি আছি, তাই তুমি আছ– এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার, তোমার আমার সকল মানুষের জন্য।

মানুষের জীবন, বিন্দু থেকে বৃত্তে উত্তরণ। এক আশ্চর্য বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো ঢাকার সেই রেসকোর্স ময়দানে। ৭ মার্চ এই রেসকোর্সে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন: 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব।' বছর ঘুরতে পারেনি। সেই রেসকোর্স ময়দানে ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি লিখেছেন জেনারেল অরোরাকে: 'আমি ও আমার সৈন্যবাহিনী একসঙ্গে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করছি।' কাঁধ থেকে সামরিক চিহ্ন খুলে নিলেন জেনারেল নিয়াজি, জেনারেল অরোরার কপালে কপাল ছোঁয়ালেন। আত্মসমর্পণ পর্ব শেষ হলো। বুড়িগঙ্গার তীরে তখন সূর্য ডুবছে নব অরুণোদয়ের অঙ্গীকার নিয়ে। সংগ্রাম শেষ হলো।

আমার সংগ্রাম ছিল তোমার জন্য, তোমার সংগ্রাম, তা-ও আমার জন্য। কেননা দুই সংগ্রামের একই প্রাণবিন্দু– স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। ৩৬৩ বছরের পুরোনো নগরী ঢাকা আজ সদ্যোজাত রাষ্ট্রের মুক্ত রাজধানী– একাল ও সেকালকে মিলিয়ে যে-চিরকালের মানবিকতা, তারই প্রতিষ্ঠাভূমি। তোমার সংগ্রাম শেষ, তাই আমারও সংগ্রাম শেষ হলো। সুতরাং আর যুদ্ধ নয়– এবার এ-পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করার লড়াই।

পূর্ব খণ্ডে তোমার আমার লড়াই শেষ হলো। আমি তাই ঘোষণা করেছি– একতরফাভাবে ঘোষণা করেছি: পশ্চিম খণ্ডেও লড়াই বন্ধ হোক, হোক যুদ্ধবিরতি। আমার লড়াই ভূখণ্ড অধিকারের লড়াই নয়, আমার লড়াই অপরের স্বাধীনতা অপহরণের লড়াই নয়, আমার লড়াই নয় সাম্রাজ্যবিস্তারের। পূর্ব খণ্ডে মানুষের বাঁচার লড়াইয়ে আমি শামিল হয়েছিলাম, আমি চেয়েছিলাম মানবিক মূল্যবোধকে, দরকার হলে নিজের জীবন দিয়েও রক্ষা করতে। শত্রু তাই আমাকে বরদাস্ত করতে পারেনি, আক্রমণ করেছিল। পশ্চিম খণ্ডে আমাকে তাই নামতে হয়েছিল প্রতিরোধসংগ্রামে। পূর্ব খণ্ডে সংগ্রাম শেষে তাই পশ্চিম খণ্ডে লড়াইয়ের আর কোনো দরকার রইল না। দরকার রইল না অপ্রয়োজনীয় অহেতুক রক্তপাতের। তাই, আর লড়াই নয়।

আমি স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের সংগ্রামী, আমি এ-যুগের শান্তিকামী বিশ্বমানবতার এক ক্ষুদ্র অংশ। আমার সঙ্গে তাই বিরোধ নেই পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের, যারা আমারই মতো স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতা– গণতন্ত্রের। কাজেই, আজ যুদ্ধবিরতি।

আজ যুদ্ধবিরতি– কিন্তু সেই সঙ্গে আর এক লড়াইয়ের সূত্রপাত। এ লড়াইয়েও আমি তুমি একই কাতারে দাঁড়িয়ে লড়ব, লড়ব সমৃদ্ধির জন্য, শান্তির জন্য। লড়ব আমার ভারতের জন্য– লড়ব তোমার সোনার বাংলার জন্য।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী (প্রয়াত), ভারত

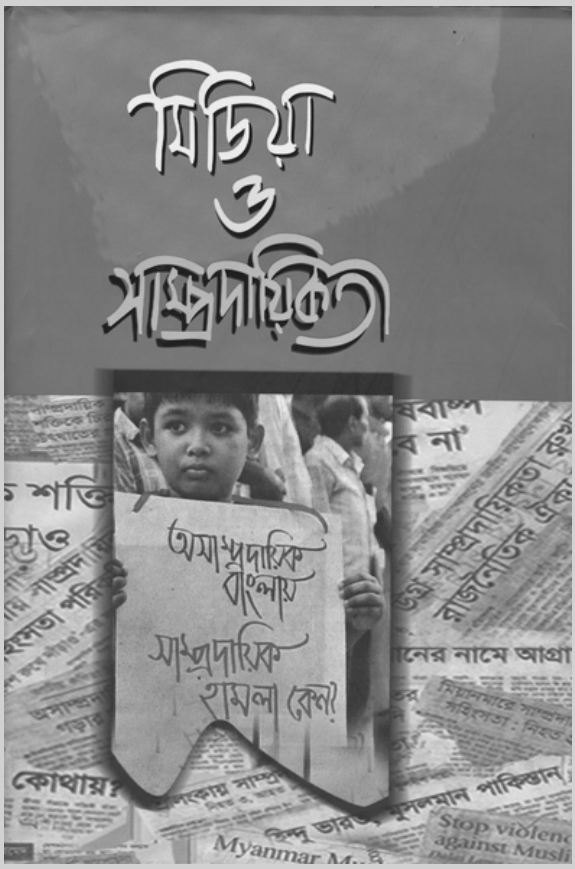

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ক্যাপ্টেন ডুগ্গাল

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ

মানস ঘোষ
অনুবাদঃ আকিল উজ জামান খান

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। এই দিনটিতে মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে যান সেই আগুনঝরা দিনগুলোর স্মৃতিপটে। নিজেদের ভূমিকার পাশাপাশি স্মরণ করেন দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেওয়া ভারতীয় সহযোদ্ধা, গার্ড রেজিমেন্টের এমভিসি এলবার্ট এক্কা অথবা মাহের রেজিমেন্টের ১৮ বছরের তরুণ আনুশ প্রাসাদের মতো অনেকের কথা।

লে. কর্নেল (অব.) সাজ্জাদ জহির (বীরপ্রতীক)-এর মতো অনেকেই আবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন যুদ্ধক্ষেত্রের সেসব বীর ভারতীয় সহযোদ্ধার কথা, ইতিহাস যাঁদের সেভাবে মনে রাখেনি। তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন এসএস ডুগ্গালের নাম। বিয়ের নির্ধারিত তারিখের মাত্র দুমাস আগে যিনি স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলেন শক্তিশালী পাকিস্তানি ঘাঁটি সিলেটের শমসেরনগর বিমানবন্দরে পরিচালিত এক বিপজ্জনক অভিযানে।

এই বিমানবন্দরটি নির্মিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে। বিমানবন্দরটির নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এলিট রেজিমেন্ট ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। বিমানবন্দর ঘিরে মোতায়েন করা হয় ভারী অস্ত্রশস্ত্র। এখান থেকে ছোড়া গোলা-গুলি সীমান্ত পেরিয়ে নিয়মিতভাবে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল ভারতীয় গ্রামগুলো, বাড়ছিল হতাহতের সংখ্যা।

লে. কর্নেল (অব.) সাজ্জাদের বর্ণনায় স্বাধীনতা যুদ্ধে অসম সাহসী ভারতীয়দের অবদান কেবল ক্যাপ্টেন ডুগ্গালের আত্মোৎসর্গেই শেষ নয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্তে রঞ্জিত পথে সিংহহৃদয় ভারতীয় অফিসারদের চূড়ান্ত ত্যাগকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। ক্যাপ্টেন ডুগ্গালের সাহস ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লে. কর্নেল (অব.) সাজ্জাদ বলেন, 'যেহেতু সামনেই ছিল তাঁর বিয়ে, তাই আমি তাঁকে এ ধরনের বিপজ্জনক অভিযানে অংশগ্রহণের বিষয়ে সতর্ক করে দেই। আমি তাঁকে আরও বলি, এই অভিযান থেকে তাঁর জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই

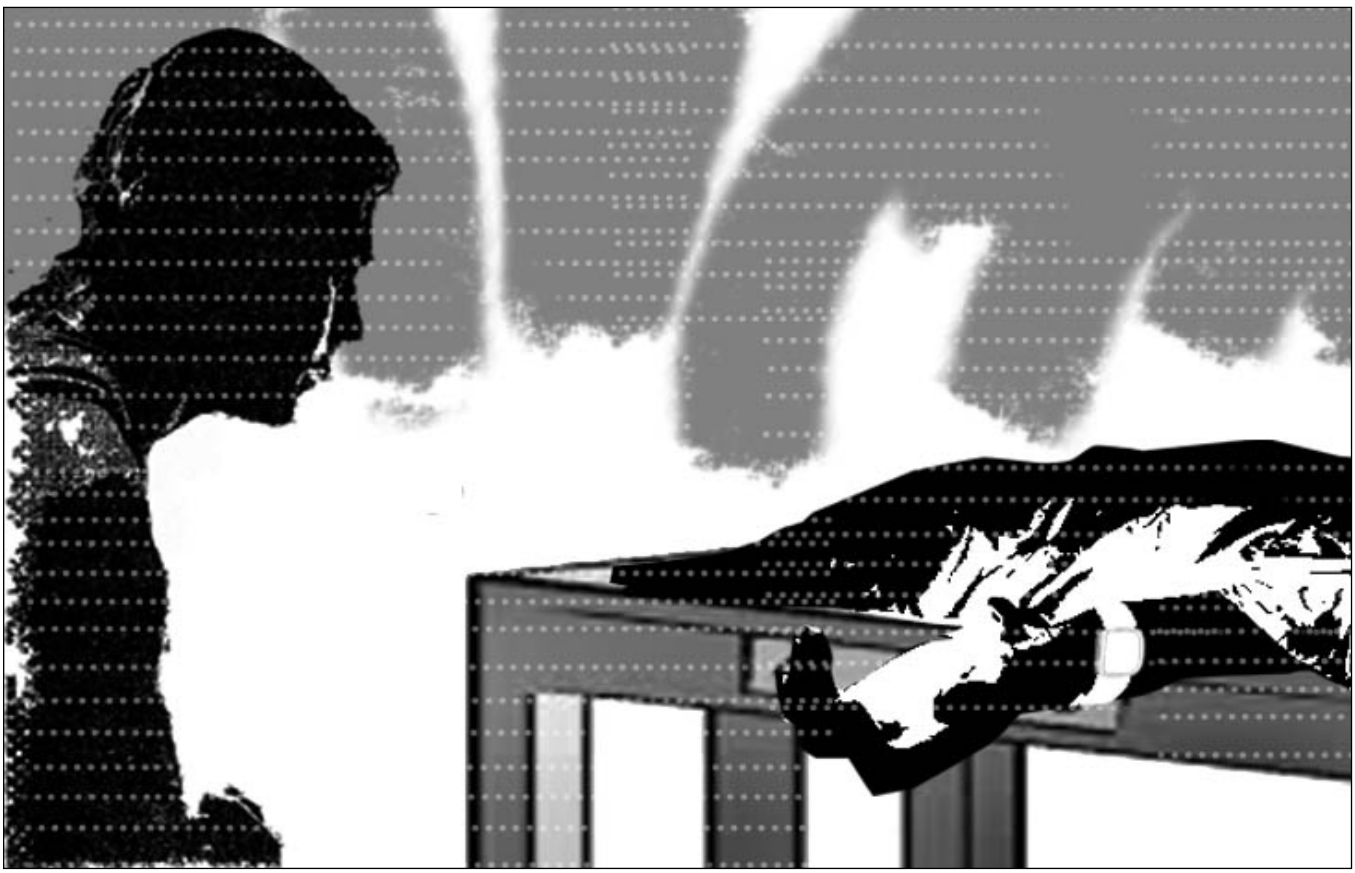

চলে। সে ছিল আমার ভাইয়ের মতো। ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় তাঁর বিয়েতে যোগদানের জন্য সে আমাকে অমৃতসরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি অনেকটা বাধ্য হয়েই তাঁকে সতর্ক করি। তাঁর নির্ভীক উত্তর ছিল, 'একজন সৈনিকের কাছে তাঁর দায়িত্ব সবার আগে।'

লে. কর্নেল সাজ্জাদ ছিলেন পাকিস্তানি প্যারাট্রুপার। ১৯৭১-এর আগস্টে তিনি পক্ষত্যাগ করে সাকারগার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। একজন লেফটেন্যান্ট হিসেবে তাঁকে সরাসরি সিলেট সংলগ্ন আসাম-ত্রিপুরা বর্ডারে কুকিতাল গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেখান থেকে শমসেরনগর বিমানবন্দরের দূরত্ব ছিল মাত্র ছয় কিলোমিটার। সাপ্লাই এবং রিইনফোর্সমেন্টের জন্য বিমানবন্দরটির গুরুত্ব বাড়ছিল ক্রমেই। বিমানবন্দরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কৌশলগত কারণেও। পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পতন ঘটাতে এটি দখল ছিল অনিবার্য। এছাড়া সেখানকার ভারী গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় গ্রামগুলোর আদিবাসীরা ভারতীয় সেনাধ্যক্ষদের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধও জানাচ্ছিলেন।

ক্যাপ্টেন ডুগ্গাল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কুকিতাল ক্যাম্পে লে. কর্নেল সাজ্জাদের সঙ্গে দেখা করে সাজ্জাদকে জানান, তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্থানীয় কমান্ডারের দায়িত্বে আছেন, যাঁরা নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করছিল। সাজ্জাদের ভাষায়, 'প্রথম দেখার পর থেকে আজ পর্যন্ত ডুগ্গাল হয়ে আছে আমার দেখা সবচেয়ে নায়কোচিত পুরুষ। প্রথম দেখাতেই সে আমার মন জয় করে নেয় তাঁর বিয়েতে আমাকে দাওয়াত করে। আমি তাঁকে বলি, ফেব্রুয়ারি এখনো অনেক দূর। কিন্তু তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, তাঁর বিয়ের নির্ধারিত সময়ের আগেই যুদ্ধ শেষ হবে। প্রথম দেখায় গড়ে ওঠা আমাদের ব্যক্তিগত বোঝাপড়া পরবর্তী সময়েও চমৎকার কাজে দিয়েছে।'

শমসেরনগর বিমানবন্দরে মোতায়েনকৃত ভারী অস্ত্রের গোলাগুলিতে ভারতীয় গ্রামগুলোয় হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভারতীয় কমান্ডাররা বাধ্য হয়ে ২৮ নভেম্বর রাতে শমসেরনগর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। ক্যাপ্টেন ডুগ্গাল স্বেচ্ছায় তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে পর্যবেক্ষক কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন, যাতে তিনি তাঁর আর্টিলারি রেজিমেন্টকে নিখুঁতভাবে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণের নির্দেশ দিতে পারেন।

'যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছিল রাতজুড়ে' আর আমি প্রার্থনা করছিলাম ডুগ্গালের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের। এই অভিযানে ভারতীয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় আমি ডুগ্গালের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি জিপ দিয়ে টেনে আনা ট্রেইলারে রক্ষিত ভারতীয় সেনাদের মরদেহ দেখতে এগিয়ে যাই। ট্রেইলারটি তারপলিনে ঢাকা ছিল। সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আমি দেখি, কব্জিতে দামি ঘড়ি জড়ানো একটি হাত বেরিয়ে আছে তারপলিনের ফাঁক দিয়ে। আমার হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল। ঘড়িটি যুদ্ধক্ষেত্রে, এমনকি গাঢ় আঁধারেও নিখুঁত সময় দিত বলে ডুগ্গালের কাছে তা ছিল খুবই প্রিয়। আমি তারপলিনের ফাঁক দিয়ে তাঁর রক্তসিক্ত দেহটি দেখি, যা শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। দৃশ্যটি আমাকে এতটাই আঘাত করে যে– আমি তখন জমে বরফ। কতক্ষণ আমি সেখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম, নিজেও জানি না।' ২৯ নভেম্বর রাতে এক বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে শমসেরনগর বিমানবন্দর দখল করা হয়।

এক বছর পর লে. কর্নেল (অব.) সাজ্জাদকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে অ্যাডভান্স কোর্সের জন্য পাঠানো হয় বিখ্যাত ডিওলালি আর্টিলারি ট্রেনিং সেন্টারে। তিনি প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ডিসটিংশন লাভ করেন। ভেঙে দেন আগের সব রেকর্ড। তার এই বিরল কৃতিত্ব সাদরে অভিনন্দিত হয় ফ্যাকাল্টি সদস্যদের দ্বারা। লে. কর্নেল সাজ্জাদ যখন পরিচালকের কাছে জানতে চান কার রেকর্ড তিনি ভেঙেছেন, পরিচালক তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে জানান, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেন্টারের নিয়ম ও ঐতিহ্যবিরোধী। সাজ্জাদের ভাষায়, 'যে কারণেই হোক, আমার মন বলছিল আমি ডুগ্গালের রেকর্ড ভেঙেছি। আমি জানতাম সে ছিল এই একাডেমির অন্যতম সেরা ছাত্র।' তাই আমি ডিরেক্টরকে বলি, 'স্যার, যদি সেটি না বলা যায়, আমি আপনাকে অনুরোধ করব আমার নম্বর কমিয়ে দিন, যাতে ডুগ্গালের রেকর্ড অক্ষুণ্ন থাকে। আমি তাঁর রেকর্ড ভাঙতে চাই না। আর এভাবেই আমি আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য বিনা দ্বিধায় জীবন উৎসর্গ করা আমার ভারতীয় ভাইটিকে ন্যূনতম সম্মান জানাতে চাই। ডিরেক্টরের আপত্তি সত্ত্বেও আমি চাচ্ছিলাম একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত অন্তত স্থাপিত হোক।'

মূল রচনা: সাংবাদিক, ভারত

অনুবাদক: সহ-সম্পাদক, পিআইবি

ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয় বাংলাদেশের জন্ম

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

২২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকার রমনায় এক বিশাল জনসভায় মুজিবুর বলেন, 'জয় আমাদের হবেই। আমরা ন্যায়ের পথে লড়াই করছি।' ওইদিন রাতে ঢাকায় প্রেসিডেন্টের ভবন থেকে প্রেস নোটে ঘোষণা করা হলো যে, ২৫ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন ডাকা হয়েছিল, তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হলো। দৌলতানা ও আবদুল ওয়ালি খান এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ঢাকায় যখন ওই অবস্থা চলছে, তখন ২২ মার্চ সন্ধ্যায় (১৯৭১) কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে একটি দৃশ্য দেখা গেল।

আমি রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। কলকাতার সংবাদজগৎ ঢাকার খবরের জন্য উৎকণ্ঠিত। এমন সময় দ্রুত একটি পুলিশের গাড়ির পেছনে বাংলা ভাষায় নম্বর প্লেটে 'ঢাকা...' লেখা একটি গাড়ি রাইটার্সের পোর্টিকোতে ঢুকল। গাড়ি থেকে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি নামার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোকেরা তাকে স্যালুট দিয়ে ভিআইপি লিফটে নিয়ে গেল। আমি ওই দীর্ঘকায় ব্যক্তিটিকে দেখে চিনতে পারলাম। তিনি ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত। একসময় রিপোর্টার ছিলেন United Press of India নামের একটি নিউজ এজেন্সিতে। আমাকে সেসময় সামান্য চিনতেন। আমি আবার সিঁড়ি বেয়ে রাইটার্সের দোতলায় চলে এলাম। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার সরাসরি চিফ সেক্রেটারি নির্মল সেনগুপ্তের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি চিফ সেক্রেটারির ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছি। কৈলাস সেনগুপ্তকে ঢাকার পরিস্থিতি কিছু জিজ্ঞাসা করতেই হবে। মিনিট পনেরো পর কৈলাস বাবু বেরিয়ে আসতেই আমি কোনো বাহুল্য না করেই তাকে বললাম, আমি তাকে চিনতে পেরেছি। তিনি একটু সময় ভ্রু কুঁচকে আমাকে দেখে বললেন, আমিও তোমাকে চিনেছি... তবে নাম ভুলে গিয়েছি। আমি সময় নষ্ট না করে প্রশ্ন করলাম, 'ঢাকার আলোচনা কি শেখ মুজিবের পক্ষে যাবে কিংবা রক্তক্ষয়ী পরিণতি?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'দ্বিতীয়টা... আর কোনো প্রশ্ন নয় এবং তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়নি বুঝলে...।' এই কথা শেষ হতে না হতেই চিফ সেক্রেটারি বেরিয়ে এসে ডেপুটি হাইকমিশনারকে নিয়ে দমদম বিমানঘাঁটিতে ছুটলেন। পরে জানতে পেরেছি, চিফ সেক্রেটারির দিল্লিগামী বিমানটি প্রায় ৪০ মিনিট দেরি হয়েছিল আকাশে উড়তে। পশ্চিম

বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে দিল্লিগামী বিমানে তুলে দিয়ে এলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম, দিল্লির পালাম বিমানঘাঁটি থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসাররা ডেপুটি হাইকমিশনার কৈলাস সেনগুপ্তকে সোজা নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাড়িতে। কৈলাস বাবু ঘরে ঢুকেই প্রথম দেখতে পেলেন জেনারেল মানেকশকে। পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের দুই সেক্রেটারি এবং গোয়েন্দা দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসাররাও গম্ভীর মুখে সেখানে উপস্থিত। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ওই অফিসারদের সামনেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ঢাকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে বলে তিনি জানান। ২৫ মার্চ (১৯৭১) নির্দিষ্ট করা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্থগিত করে দেওয়ার মধ্যে সামরিক তৎপরতার আশঙ্কার কথা কৈলাস বাবু ওই বৈঠকে জানিয়েছিলেন।

পরদিন ২৩ মার্চ সকালে দিল্লির বিমান দমদমে নামার আগেই আমি বিমানঘাঁটিতে গেলাম। আমার কেন মনে হয়েছিল, ডেপুটি হাইকমিশনার কৈলাস সেনগুপ্তকে এখনই ঢাকায় ফিরতে হবে। একটু পরেই চোখে পড়ল, পুলিশ প্রহরায় ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনার সেখানে দাঁড়িয়ে। আমার অনুমান ঠিক। দিল্লির বিমান থেকে যে যাত্রীটি প্রথম নেমে এলেন, তিনি সেই ডেপুটি হাইকমিশনার কৈলাস সেনগুপ্ত। বিমানের সিঁড়ির গোড়ায় আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, কী, রাতে ঘুমোতে যাওনি?' হাইকমিশনের গাড়ি এগিয়ে আসতেই তিনি গাড়িতে উঠতে উঠতে আমাকে জানালেন যে, সন্ধ্যার আগেই তিনি সীমান্ত পেরিয়ে যশোর হয়ে ঢাকায় পৌঁছতে চান। ওদিকে ২৩ মার্চ ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান রমনা রেসকোর্স ময়দানে পরিষ্কার ঘোষণা করলেন যে, তিনি কখনো 'ছয় দফা দাবি' থেকে সরে আসবেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিও ছাড়বেন না। কিন্তু পরিস্থিতি যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে তার ঘোষণা, 'তোমাদের সৈন্যেরা যদি আমার বাংলাদেশের মানুষের ওপর গুলি চালায়– যদি আমাদের মা-বোনেদের গায়ে হাত দেয়, তাহলে এই লড়াই হবে মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম...।' 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' কথাটি তিনি এই প্রথম উচ্চারণ করলেন। ২৪ মার্চ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা শহরে বিরাজ করছিল এক অসহনীয় স্তব্ধতা। বিকালে পুরানা পল্টনে সেই ঐতিহাসিক সভায় মুজিবের আগের দিনের রমনার ঘোষণা– '... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...।'

২৪ মার্চ মধ্যরাতের পর ২৫ মার্চ (১৯৭১) তারিখটি যখন ক্যালেন্ডারে এসে গেল, তখনকার ও পরবর্তী ইতিহাস এই উপমহাদেশের প্রতিটি মানুষের জানা। ২৮/২৯ মার্চ থেকে আমার দিন থেকে সন্ধ্যা কেটেছিল কখনো পূর্ব পাকিস্তানের চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও যশোরের সীমান্ত এলাকায়– যশোর-খুলনা থেকে যে যশোর রোড, আমার শৈশব থেকে চেনা!

এপ্রিলের ৩/৪ তারিখ (১৯৭১) আমি যশোর শহরের খুব কাছের একটি গ্রাম থেকে আমাদের বনগাঁ সীমান্তের দিকে ফিরে আসছি। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে এই অনুরোধ রেখেছিলেন যে, আমরা যারা সীমান্ত ঘুরে রিপোর্ট করছি, তারা যেন সন্ধ্যার আগেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় এলাকায় ফিরে আসি। ওইদিন আমি একাই ফিরে আসছি। তখনও দিনের আলো অনেকটাই আছে। এমন সময়ে আমার নজরে পড়ল, ধুতি পরা একজন দীর্ঘকায় পুরুষ ও তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা যশোর রোডের পাকা রাস্তা থেকে নেমে মাটির রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। আরেকটু এগিয়ে আসতেই মহাবিস্ময়ের সঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'ওমা! এ যে জয়প্রকাশ নারায়ণ দাঁড়িয়ে!' আমি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে জয়প্রকাশ ও প্রভাবতী দেবীকে প্রণাম করলাম। জয়প্রকাশ তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে বললেন, 'এই ছেলেটি কোহিমাতে অনেকদিন আমাদের সঙ্গে ছিল খবরের কাগজের রিপোর্টারের কাজে...।' এরপর জয়প্রকাশ প্রায় ১০ মিনিট আমাকে জেরা করলেন একজন পাক্কা রিপোর্টারের মতো। আমি বা অন্য রিপোর্টাররা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানি ভূখণ্ডের কতটা ভেতরে যেতে পারছি? যেখানে যেখানে যাচ্ছি, সেখানে শাসনব্যবস্থা আছে কি না? এবং তা না থাকলে কেমন অবস্থা চলছে? সাধারণ মানুষের কী প্রতিক্রিয়া? আমি যখন জয়প্রকাশের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহণের একটি বাস অন্তত শখানেক লোক নিয়ে গিয়ে ভারতীয় সীমান্তে কাস্টমস অফিসের সামনে এসে থামল। জয়প্রকাশ আমাকে প্রশ্ন করলেন, এভাবেই কি ওখানকার লোকেরা ভয়ে কিংবা অত্যাচারিত হয়ে চলে আসছে?' আমি জয়প্রকাশ ও প্রভাবতী দেবীকে বাসটির কাছে নিয়ে এলাম। ওঁরা দুজনেই মোটামুটি বাংলা কথাবার্তা বুঝতে পারেন। বাসটির মধ্যে মানুষের সঙ্গে কিছু হাঁস, মুরগি, ছাগল, পাঁঠা রয়েছে। এমনকি তিন-চারটি বড়ো গামলায় রান্না করা ভাত, তরকারি ও মাছের ঝোল পর্যন্ত রয়েছে। জয়প্রকাশ আমার মাধ্যমে ওদের কাছ থেকে জেনে নিলেন যে, পাশের গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি আক্রমণ চালিয়ে মারধর করছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এই খবর পেয়ে এই লোকেরা রান্না খাবার নিয়ে এভাবে পালিয়ে এসেছে! কয়েকদিন পরে জানতে পেরেছিলাম যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জয়প্রকাশ ও প্রভাবতী দেবী দুজনের সঙ্গেই দেখা করে তাঁদের বলেন, সীমান্ত এলাকায় এসে নিজের চোখে কিছু দেখে যান। জয়প্রকাশ পশ্চিম বাংলা, অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চলে শরণার্থীশিবিরে গিয়েছিল।

ওই সময়ে একদিন আমার চিফ রিপোর্টার (যুগান্তর পত্রিকা) সুধীন ঘোষ আমাকে দ্রুত কলকাতা ফিরতে বললেন। আমি কলকাতা ফিরে জানলাম, দিল্লি থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও ওদের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান Spotlight কর্মসূচিতে 'পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশের অভ্যুত্থান' শিরোনামে লেখা পাঠিয়ে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে। ১৫ এপ্রিল (১৯৭১) তারিখে দিল্লি থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও আমার লেখা এই Spotlight কথিকাটি প্রচার করল:

জয়প্রকাশ আমার মাধ্যমে ওদের কাছ থেকে জেনে নিলেন যে, পাশের গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি আক্রমণ চালিয়ে মারধর করছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এই খবর পেয়ে এই লোকেরা রান্না খাবার নিয়ে এভাবে পালিয়ে এসেছে!

-By Sukharanjan Sengupta
Correspondent, Jugantar (Calcutta)
The East Pakistan Rifles Havildar was walking beside me closely followed by his men carrying Light Machine Guns and Stens. It was a tiny village, Malancha, 3 miles West of Jessore town and about 19 miles inside Bangala Desh from the Indian border. Suddenly we heard a panic stricken cry of alarm and saw two young Bengali Muslim girls running away from the tube-well, from which they were drawing water. Bewildered, I looked at the Havildar. Then the Havildar in his Noakhali accent called them and told them that they were not those soldiers whom they considered enemy soldiers. The girls came back to the tubewell and smiled shyly. But the Havildar sighed heavily and could not speak for few moments. Later he explained why the girls raised such an alarm. It was a heart rending commentary on the torture bordering on animalism committed by the West Pakistani troops on the womenfolk and children of Jessore town and other areas of their aggression. He put it in these words, 'West Pakistani troops can kill us, because we are fighting a war. But why they torture and

kill the women and girls? Even the wives and daughters of high Bengali Muslim officials have been raped and killed. I cannot describe the vulgarity the West Pakistani troops have used in killing them. The world may or may not support our cause. But why the conscience of the world has kept silent on the barbarism committed on the womenfolk and children?' He paused a little and continued 'Who can tell what the future holds for us. But it is certain that we will not be able to live with these people any more. I was a paid soldier serving East Pakistan Rifles. But now I am fighting for an ideology, for independence. I have become a revolutionary.'

But why this war of Independence was forced on the people of East Bengal? In Yahya's own words to Time correspondent, Dan Coggin in December, 1969, 'The people of East Pakistan did not have their full share in the decision-making process. They are fully justified in being dissatisfied.' As early as in 1954, Fazlul Huq, the then Chief Minister, first wanted the rightful place of East Bengal in the body politic of Pakistan and a voice in the decision making process. In an interview with the New York Time correspondent, Huq Sahib spelled out East Bengal autonomy. When this interview was published, Karachi considered it 'an act of treason', and Fazlul Huq was dismissed from office and was placed under house arrest. Times rolled on, East Bengal was silently simmering with discontent. By then Fazlul Huq was dead. So was Huseyn Shaheed Suhrawardy, who few days before his tragic death at a Beirut Hotel, told an East Bengali journalist that for the restoration of democracy and right of the people of East Bengal, he was prepared to go to prison. But he could not lead a movement at this age. He was then 73. Since then the mantle fell on his God son Sheikh Mujibur Rahman who was his General Secretary in the party, that is, Awami League.'

> ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি যশোর ক্যান্টনমেন্ট ভারতীয় বাহিনী দখল করে নিলে ৮ ডিসেম্বর বিদেশি সাংবাদিকদের একটি বড়ো দলের সঙ্গে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছলাম সকালেই

General Yahya Khan admitted 'The rightful discontent of the people of East Bengal. But to remove this, he forced the war of Independence on the people of East Bengal. Under his instruction the West Pakistani troops struck at the people of East Bengal on 25th March midnight. Under the smokescreen of talks for settlement in Dacca that Yahya's army that brought large number of West Pakistani troops in East Bengal Army Headquarters, also passed orders for disarming the East Pakistan Riflesmen, composed mainly of Bengali Musalmans and their armoury and for taking over of their ammunition stores. Detachments of the East Pakistan Rifles posted at the border areas were asked to send mortars and other heavy weapons to the cantonments. They were also asked to keep minimum amount of fire power with them. Members and officers of 1 East Bengal Regiment based at Jessore Cantonment were ordered to go on leave. On 25th March night, the St. Col. belonging to this Regiment, refused to go on leave and was placed under arrest. Some of his men got this information and immediately they stormed the armoury and the ammunition stores. While coming out of the Cantonment they were attacked by West Pakistani troops. 'We were caught napping', a soldier belonging to that regiment told me in his forward base near Jhikargacha, 8 miles West of Jessore town. 'But' he continued, 'we are fighting a full scale war with small arms!'

In the morning of 4th April, I slipped into Benapole, the East Bengal border village. There at the East Pakistan Rifles Head quarters, I was waiting for my contact man. After waiting for a few hours, I was called in a room and was informed by a Khaki clad Liberation force volunteer that my contact man while coming out from Jessore town early in the morning by a jeep was fired upon at a point called Polerhat on the Jessore Road. He escaped the bullets but the car was hit. So I will have to wait for an alternative transport. The transport I got ultimately was a post office coloured open jeep. The jeep took me to Jhikargacha, an important business centre for raw jute. There I was introduced to a very important member of the Awami League. He in his mid forties, handsome and always smiling. He briefed me on the latest situation in this vital sector. He called some East Pakistan Rifles men and introduced me to them. He advised them to take me to forward positions where my safety is ensured. This time I was led into a jeep which really was in a war mood. I was flanked by at least 8 men in full battle dress carrying light machine guns and other automatic weapons. I was driven to Chachra village, hardly one and half miles West of Jessore town, where liberation forces men took up their forward positions. During my one hour stay I heard the sounds of shell fire and felt the vibration. But two days later these positions were directly hit by heavy mortar and machine gun fire by Pakistani troops and my visit had to be halted at village Malancha.

On last Thursday morning, Pakistani troops made outflank moves from their Cantonment at Jessore. Crossing a local river Mukteswari they advanced upto Malancha and started heavy machine gunning. After machine gunning, the Pakistani troops set fire to the huts of 17 villages including Malancha. That day I could not proceed beyond Laugani level crossing gate on the Jessore Road. I was sitting over a railway slipper flanked by six East Pakistan Rifles Havildar. They were

grave. Then we noticed the rush of large number of people from the burning villages. They were mostly women and children trekking towards safer places of Indian border areas. They were carrying household articles including goats, ducks and chickens. Many of them were in tears. Children were separated from their mothers and husbands from their wives. I came forward to talk to them. I could hardly check my tears when I heard a girl of five or six years waiting for her lost mother and was constantly consoled by another elderly woman that her mother was ahead of them! Going back to the Riflemen, I questioned them about the future of the war. 'Future is uncertain' commented one of them and he continued 'we are not commanders. We are soldiers. How can we win against such a powerful enemy without any big assistance form any country? But we will have to fight, because there is no alternative left to us.' That is the real point. Whether any country gives them any assistance or not, the people of East Bengal will have to continue their fight.

১৫ এপ্রিল (১৯৭১) সন্ধ্যায় অল ইন্ডিয়া রেডিও মর্যাদাপূর্ণ Spotlight অনুষ্ঠানে আমার ওই লেখাটি প্রচার করেই বিরত থাকেনি– পরের দিন অল ইন্ডিয়া রেডিও 'External Services' অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিকভাবেও প্রচার করেছিল। ওই সময় 'দিল্লিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় বাঙালি সাংবাদিক ছিলেন 'আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকাগোষ্ঠীর ব্যুরো চিফ রণজিৎ রায়। তিনি ওই অনুষ্ঠানটি শুনে পরের দিনই আমাকে একটি চিঠি লেখেন অভিনন্দন জানিয়ে।

২৫ এপ্রিল দিল্লির সবচেয়ে নামকরা সুপরিচিত মহিলা সাংবাদিক ও সমালোচক Times of India পত্রিকায় তার Sight and Sound কলামে 'বাংলাদেশ' সম্পর্কে আমার ওই কথিকার উল্লেখ করে লিখলেন:

It is embarassing for this writer to say this about professional colleagues, but I met a wide range of newspapermen in Calcutta who remarked that AIR's tendency has been to choose commentators, who rely on such methods. This was most notable during the recent elections wrote one Calcutta newspaper which has so far enjoyed virtual monopoly of broadcast commentaries, particulary for Spotlight. It was therefore refreshing to find that what I consider the best commentator on Bangla Desh for the week under review came not only from another paper but from a Bengali paper, Jugantar. Mr. Sukharanjan Sengupta seems born with a Badshah Khan's visit to India, when he produced Spotlight script which can only be described as outstanding in three aspects; involved content, style and comment. Similarly in his commentary on Bangla Desh Mr. Sengupta had a rare combination of human compassion, descriptive power and skilled political comment which would have made the script stand out on any international network. I am surprised that AIR took almost two years to rediscover Mr. Sengupta and one can only hope that the External Services of All India Radio also make use of him, because his literary ability and sophisticated style makes him something of a rarity on the Indian broadcasting scene.

Amita Malik

অমিতা মালিক তার এই লেখায় আমার আগেকার একটি Spotlight অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন, যেটি ছিল সীমান্ত গান্ধী (খান আবদুল গাফ্ফার খান) সম্পর্কে। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর গান্ধীজির শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি উপলক্ষ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত আবেদনে রাজি হয়ে সীমান্ত গান্ধী তার স্বেচ্ছা নির্বাসন আফগানিস্তান থেকে দিল্লি আসেন। ওটি ছিল তার দেশভাগের পর প্রথম ভারতে আসা। এখানে সীমান্ত গান্ধী সম্পর্কে আমার দীর্ঘ Spotlight কথিকাটি উদ্ধৃত করলাম না। তবে Times of India পত্রিকায় অমিতা মালিকের সমালোচনাটির উদ্ধৃতির আবেগ সংবরণ করতে পারলাম না। সেসময় তিনি ওই পত্রিকার Sight and Sound কলামে (অক্টোবর ৫, ১৯৬৯) লিখেছিলেন:

The arrival of Badshah Khan was heralded the evening before by one of the finest Spotlight heard in a long while. This was a script by Sukharanjan Sengupta of Jugantar in Calcutta and aptly titled 'the Servant of God'. It is not every newspaperman who can write a good radio script- Frank Moraes, Chanchal Sarkar, G.S. Bhargava, Niranjan Majumdar and perhaps two or three more (I am here referring only to scripts in English). Mr. Sengupta certainly is a front rank radio writer too. His tribute, in beautifully fluid language was a happy combination of anecdote, emotion shorn of false sentimentality and careful documentation which allowed for the fact that might be a new generation of listeners who might not even have heard of Badshah Khan. This is the first time I have heard a script by Mr. Sengupta and one trusts it will not be the last. I am sorry to add a critical post-script, but although the ghost reader of the script had a good voice and a semblance of style he was woefully ignorant of the pronunciation of basic terms like Khudai Khidmatgar. The producer should have checked up on all this and not let those inaccuracies through.

> রাত সাড়ে ৮টা-৯টা নাগাদ চাঁদপুর স্টিমার ঘাটে পৌঁছলাম। সেখান থেকে মধ্যরাতের পর মালটানা একটা বড়ো স্টিমারে আমরা ঢাকার পথে নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা হলাম। চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত অনেকটা পথই মেঘনার জলরাশির উজান পাড়ি

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অল ইন্ডিয়া রেডিওর এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান সর্বদাই ইংরেজি খবরের কাগজের সাংবাদিকদের দিয়ে করানো হতো।

বলতে গেলে ঢাকায় ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেফতারের আগে শেখ মুজিবুর রহমানের "... এই সংগ্রাম 'মুক্তির' সংগ্রাম, এই সংগ্রাম 'স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঘোষণার পরপরই ২৬ ও ২৭ মার্চ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরপর দুটি বৈঠকে 'প্রয়োজনে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে' যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের 'স্বাধীনতা' অর্থাৎ 'বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের' প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি যশোর ক্যান্টনমেন্ট ভারতীয় বাহিনী দখল করে নিলে ৮ ডিসেম্বর বিদেশি সাংবাদিকদের একটি বড়ো দলের সঙ্গে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছলাম সকালেই। সেখানে ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল দলবীর সিং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বিদেশি সাংবাদিকদের লক্ষ করে বলেছিলেন: 'We not only sacrifice ourselves to protect our own freedom but also to achieve freedom to others...'. যুদ্ধের

গতি তীব্রতর হতেই যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ আমাকে যে কোনো রাস্তায় এবং যে কোনোভাবে ঢাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। এদিকে যুদ্ধের জন্য ভারত সরকার পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে সবরকম যাত্রীবাহী বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় খবরের কাগজের রিপোর্টারদের চলাফেরায় খুবই অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর কেবল দিনে একবার কলকাতা-গৌহাটি (এখন গুয়াহাটি) ফ্লাইট চালু হলে ওইদিন সকালে আমি আমার ফটোগ্রাফার-সহকর্মী গণেশ সিংহকে নিয়ে অসমের পথে পাড়ি দিলাম। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম যে, আগরতলা হয়ে কুমিল্লা দিয়েই তখন সেই মুহূর্তে একমাত্র সহজ ও নিরাপদ পথ হলো ঢাকা পৌঁছানোর। পরদিন ভোরে অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর শিলং থেকে একটি প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম করিমগঞ্জ শহরে। রাতে করিমগঞ্জ থেকে অন্য একটি গাড়ি নিয়ে রওয়ানা দিলাম আগরতলার পথে। রাত শেষ হওয়ার আগেই পৌঁছে গেলাম আগরতলা শহরে। সেখানে চূড়ান্ত সামরিক তৎপরতা।

সামরিক কমান্ডের সঙ্গে কথা বলে কুমিল্লা শহরে পৌঁছানোর একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে সামরিক বাহিনীর ট্রাকে উঠে বসেছি। এমন সময় একজন অফিসার আমাকে জানালেন যে, এক্ষুনি দমদম থেকে ৩০-৩৫ জন বিদেশি ও ভারতীয় সাংবাদিকদের দল সামরিক বিমানে এসে পৌঁছবে। তাদেরও এই গাড়িতেই কুমিল্লা পৌঁছে দিতে হবে। অতঃপর আমি ও গণেশ ওই মুহূর্তে নিজেদের ভাগ্যের কাছেই সমর্পণ করলাম। আমাদের নিয়ে সামরিক ট্রাকটি আগরতলা বিমানঘাঁটির দিকে ছুটল। দমদম থেকে আসা সামরিক বিমান থেকে কলকাতা ও দিল্লির জনাদশেক বাঙালি ও ৩০ জনের মতো বিদেশি সাংবাদিক নামলেন। তাঁদের নিয়ে আমরা যখন কুমিল্লার পথে রওয়ানা হলাম, তখন আমাদের নির্দিষ্ট সময় থেকে দুই ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছে। আগরতলা থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগল কুমিল্লা শহরে পৌঁছতে। ওই পথ তখন সবটা আমাদের সামরিক বাহিনীর দখলে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে সামরিক বাহিনীর কমান্ড অফিসে যখন পৌঁছলাম, তখন বিকেল সাড়ে ৪টা। আমাদের সবারই আশা ছিল এই যে, ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগেই আমরা কুমিল্লা থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকা পৌঁছতে পারব। কিন্তু আমরা কুমিল্লায় বিকেল ৪টার মধ্যেও পৌঁছতে না পারায় ঊর্ধ্বতন সামরিক নির্দেশে আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত তিনটি হেলিকপ্টার কাউকে না নিয়েই ঢাকায় উড়ে গিয়েছে। আমার ও গণেশের চোখে তখন জল। কারণ আমরা যখন প্রথম কুমিল্লার পথ ধরেছিলাম, তা পরিবর্তন না হলে আমরা দুজনে অন্তত দুই ঘণ্টা আগেই কুমিল্লা পৌঁছতাম। উপমহাদেশের এই অঞ্চলে অর্থাৎ যশোর-খুলনা বাদে পূর্ববঙ্গে সূর্য যেমন প্রায় আধঘণ্টা আগে ওঠে, তেমন অস্তও যায় প্রায় আধঘণ্টা আগে। ফলে কুমিল্লা শহরে শীতের বিকেল ৫টার আগেই অন্ধকার নেমে এলো। আমরা কীভাবে কত তাড়াতাড়ি ঢাকা পৌঁছব, এই নিয়ে কুমিল্লায় আমাদের সামরিক কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর ঠিক হলো আমরা এখনই চাঁদপুরে রওয়ানা হব। ১৬ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৮টা-৯টা নাগাদ চাঁদপুর স্টিমার ঘাটে পৌঁছলাম। সেখান থেকে মধ্যরাতের পর মালটানা একটা বড়ো স্টিমারে আমরা ঢাকার পথে নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা হলাম। চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত অনেকটা পথই মেঘনার জলরাশির উজান পাড়ি। তার ওপর অতি ধীরগতির স্টিমার। ১৭ ডিসেম্বর বেলা প্রায় ৩টায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছলাম। নারায়ণগঞ্জ ঘাটটি মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ফলে স্টিমার থেকে নামতেই আমাদের ভারতীয় সাংবাদিকদের বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের সে কী উচ্ছ্বাস! মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে আমাদের চমৎকার দুটি বাসে তুলে দিলেন ঢাকার পথে। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকার পথে বাসটির ফুটবোর্ডে সারাক্ষণ বসে ঢাকা শহরে যখন ঢুকলাম, তখন অস্তগামী সূর্যের বাঁকা ছায়া ঢাকার পথে ছড়িয়ে পড়েছে। বাসটি রমনা মহিলা উদ্যানের পাশ দিয়ে যখন বাঁক নিল, সেসময় চোখে পড়ল উদ্যানের সাজানো জলাশয়ে লাল গোলাপ ফুলের ছড়াছড়ি। বোধহয় ঠিক ওই মুহূর্তে ওটাই ছিল ঢাকার জীবন প্রতীক! কেবল রক্ত আর লাল।

রমনা মহিলা উদ্যানের পরে একটা বাঁক নিয়ে বাসটি যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সে জায়গাটি হলো ঢাকা এয়ারপোর্টের রাস্তা বরাবর হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টাল, যেটি সেই সময়ে ঢাকার একমাত্র 'ফাইভ স্টার' হোটেল। বাস থেকে আমরা নেমেই দেখি, ১০-১২ তলা সেই বিরাট হোটেলের শীর্ষে রাষ্ট্রসংঘের এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রসের পতাকা উড়ছে। হোটেলটির বাইরে তখন যেটুকু চোখে পড়ল তা হলো, আমাদের সৈন্যবাহিনীর গোটাপাঁচেক ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি। হোটেলের প্রবেশপথে আমাদের সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে ঢাকার রাষ্ট্রসংঘ অফিসেরও কয়েকজন কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে। দিল্লিতে প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে Work correspondent হিসেবে আমাদের যে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল, সেটি প্রত্যেক রিপোর্টারের কাছ থেকে ওই অফিসাররা যাচাই করে নিলেন। আগেই বলেছি, ৪০-৪২ জন রিপোর্টারের মধ্যে মাত্র ১০-১২ জন ছিলাম ভারতীয় রিপোর্টার। বাকিরা সবাই আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের। রাষ্ট্রসংঘের অফিসাররাই আমাদের হোটেলের রিসিপশনে নিয়ে এলেন। তখন বুঝতে পারলাম যে, এই এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে 'যুদ্ধনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রসংঘের এখতিয়ারে। হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের রুম বণ্টন করে দিলেন। আমি ও আমার ফটোগ্রাফার-সহকর্মী গণেশের জন্য সাত তলার একটি ঘর বরাদ্দ হলো। আমি ও গণেশ লিফটে উঠতে যাব– এ সময়ে বরুণ সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা) তার অননুকরণীয় সম্বোধনে আমাকে হাত দিয়ে ডাকল। বরুণ আমার চেয়ে ১৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) সন্ধ্যায় ঢাকা পৌঁছে গিয়েছিল। ঢাকা পৌঁছানোর পথ নির্বাচনে বরুণের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। বরুণ শিলং থেকে তুরা হয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে টাঙ্গাইল পৌঁছেছিল। টাঙ্গাইল থেকে সে সরাসরি ঢাকার সড়কপথ ধরেছিল। সেক্ষেত্রে আমি আগরতলা হয়ে কুমিল্লা-চাঁদপুর ঘুরে মেঘনা অতিক্রম করে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছেছিলাম। ফলে আমার সময়টা বেশি লেগে গেল। আমার হিসাব ছিল, আমি কুমিল্লা থেকে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার পেয়ে যাব। কুমিল্লায় সময় মতো পৌঁছতে পারলে আমি বরুণের আগেই ঢাকা পৌঁছতে পারতাম।

> আমি পড়ি কি মরি এভাবে দৌড়ে যখন ঘটনাস্থলে হাজির, তখন পাকিস্তানের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আন্তর্জাতিক প্রথা অনুযায়ী তার ইউনিফর্মের সামরিক ব্যাজ ও সব প্রতীকচিহ্ন ছিঁড়ে আমাদের বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে তুলে দিচ্ছেন

বরুণ লিফটে ওঠার আগে আমার রুম নম্বরটা জেনে নিয়ে বলল, 'রাত ৮টায় তোমার ঘরে যাব।' গত দুদিনের প্রচণ্ড ক্লান্তি-উত্তেজনা সব মিলিয়েও আমি তখন টগবগ করে ফুটছি। হোটেলে ঢোকার মুখেই সামরিক বাহিনীর অফিসাররা আমাদের ভারতীয় রিপোর্টারদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, আমরা সন্ধ্যার পরে যেন ঢাকা শহরের পথে না বের হই। ফলে হোটেলের রুমে দাঁড়িয়ে পর্দাগুলো সরিয়ে ঢাকা শহরের যতটা চোখে আসে দেখে নিলাম। ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে সেই সময়ে আমিই বোধহয় একমাত্র রিপোর্টার যে, দেশভাগের আগে এবং দেশভাগের পরে তিনবার ঢাকা এসেছিলাম। রাত ৮টা নাগাদ বরুণ যথারীতি আমার ঘরে ঢুকল। আমি তখন বরুণকে সরাসরি একটা প্রশ্ন করেছিলাম– মিত্রবাহিনীর কাছে প্রায় ৯০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণ চোখে দেখা যে কোনো ভারতীয় রিপোর্টারের পক্ষে গৌরবের। তুমি সেই গৌরবের অধিকারী। আজ চাঁদপুর থেকে স্টিমারে আসার সময় একজন রিপোর্টার ট্রানজিস্টারে 'ভয়েস অব আমেরিকা' ধরতে পেরেছিল। সেখানে তোমার নাম করে আনন্দবাজার পত্রিকায় আজ সকালে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে, এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছিল। কিন্তু আমার একটা কৌতূহল– তুমি কি আত্মসমর্পণের পুরোটাই দেখতে পেয়েছিলে? বরুণ একটা প্রাণখোলা হাসি দিয়ে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুমি ধরলে কী করে? আমি

যখন রমনা রেসকোর্সে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান একেবারে শেষলগ্নে। আমি পড়ি কি মরি এভাবে দৌড়ে যখন ঘটনাস্থলে হাজির, তখন পাকিস্তানের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আন্তর্জাতিক প্রথা অনুযায়ী তার ইউনিফর্মের সামরিক ব্যাজ ও সব প্রতীকচিহ্ন ছিঁড়ে আমাদের বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে তুলে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষ। তখন অফিসাররা সবাই গাড়ি করে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে। আমি কারও একটা গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম। এয়ারপোর্টে নেমে আমি সরাসরি লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম আমাকে খবর পাঠানোর জন্য। সবচেয়ে কাছের যে কোনো ভারতীয় শহরে পৌঁছে দিন। জেনারেল অরোরা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, Don't Worry. I shall make arrangements. জেনারেল একজন অফিসারকে ডাকলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আগরতলায় কোনো হেলিকপ্টার যাবে? তার পাইলটকে ডেকে নিয়ে এসো। পাইলট অফিসার জেনারেল অরোরাকে এক লম্বা স্যালুট দিয়ে দাঁড়াতেই অরোরা আমাকে দেখিয়ে তাকে হিন্দিতে বললেন, একে চিনে রাখো, এর নাম জেনে নাও, একে এখন আগরতলা নিয়ে যাবে এবং কাল সকালে আবার ঢাকায় পৌঁছে দেবে। সুখরঞ্জন, আমি এই সহৃদয়তা ও উপকার ভুলতে পারব না। আমি আগরতলা থেকে 'ঢাকা ডেটলাইন'-এ সংবাদ পাঠিয়েছি। আমার টেলিফোন যখন আমার পত্রিকা অফিসে রিপোর্টারদের টেবিলে পৌঁছল, আমি আগরতলায় বসে বুঝতে পারছিলাম, সারা অফিস আমার টেলিফোনের কাছে জড়ো হয়েছে। সে যে কত বড়ো মুহূর্ত...।'

রাতে আমরা নিচে একই সঙ্গে ডাইনিং রুমে খেতে গেলাম। ১০-১২ ঘণ্টা বলতে গেলে কিছুই খাওয়া হয়নি। পেট জ্বলছে। আমরা টেবিলে বসতেই ওয়েটাররা বড়ো এক ডেলা ভাত ও এক টুকরো মাংস-ঝোল বলতে গেলে নেই, প্লেটে করে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পাতে হাত দিলাম। ভাত এবং মাংসের টুকরো শেষ হওয়ার পরে ভাবছিলাম, আরও কিছু আসবে। কিন্তু বরুণ ধাক্কা দিয়ে বলল– ওঠো, আর কিছু পাবে না। রেশনিং চলছে। ঢাকা শহরের দোকানপাট, হাটবাজার সব বন্ধ। এত বড়ো হোটেলে হাজারখানেক লোক রয়েছে। তার মধ্যে সব পাকিস্তানি অসামরিক অফিসার ও তাদের পরিবারের লোকেরা। হোটেলের মজুত ভাঁড়ার কমে আসছে। রাতে ঘরে বসে আমি ঢাকা পৌঁছানোর ঘটনা লিখতে বসলাম। গণেশ তার খাটে ঘুমোচ্ছে। আমি ঘণ্টাদুয়েক লেখার পর ভাবছি– লিখলাম তো; কিন্তু খবর যাবে কীভাবে! এই ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আজানের শব্দে আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল। আমার শৈশব, আমার কৈশোরের যে দিনগুলো, যে বছরগুলো পূর্ব বাংলার জেলা ও মহকুমা শহরে কেটেছে, সেই স্মৃতি বারংবার ভেসে উঠল। আমি পর্দা টেনে ভোরের ঢাকা শহরের রূপ দেখতে লাগলাম। শীতের কুয়াশায় ঢাকা শহর তখন আচ্ছন্ন। বলতে গেলে ১৮ ডিসেম্বর (১৯৭১) ওই দিনটি থেকেই আমার পরবর্তী প্রায় দুই বছরের ঢাকায় রিপোর্টার জীবনের শুরু।

সকালে আমার প্রথম কাজ ছিল কলকাতায় সংবাদ পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা আছে কি না দেখা। হোটেলে আমাদের সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। তাদের কাছে গিয়ে আমাদের রিপোর্টারদের এই সমস্যার সুরাহার কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি না জানতে চাইলাম। আমাকে একজন অফিসার আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, আমার মতো আরও অনেক রিপোর্টার বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদদাতারা গত রাত থেকেই এই বিষয় নিয়ে তাঁদের কাছে এসেছিলেন। সুতরাং আজ দুপুরের মধ্যে এ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হবে। দুপুরে আমাদের সব রিপোর্টারের রুমে রুমে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, যারা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কুরিয়ার ব্যবস্থায় সংবাদ পাঠাতে চান, তারা বেলা ১টার মধ্যে হোটেলের নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট অফিসারের কাছে সংবাদের প্যাকেটগুলো যেন জমা দিয়ে যান। এই ব্যবস্থা প্রায় ৩০ ডিসেম্বর অবধি চলেছিল। পরবর্তী কয়েকটা দিন আমার মন খুব উথালপাথাল করছিল এই ভেবে যে, আমার শৈশব, আমার কৈশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভের সময় পর্যন্ত পূর্ব বাংলার যে মানুষগুলোকে দেখেছিলাম, তারা কতটা বদলেছে? কতটা এগিয়েছে? এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের মেয়েদের ছোটোবেলায় যেভাবে দেখেছি, তারা কি সেরকমই আছেন? কিংবা তারা লেখাপড়া শিখে অনেক এগিয়েছেন? বলতে গেলে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজ নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্যের যে মানসিকতা তৈরি করেছিলেন, ১৯০৫ এবং এর পরবর্তী সময়কালে তাদের সে আশা, সে আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয়বারের বঙ্গবিভাগ আর সেই সঙ্গে স্বাধীনতা তা কতটা পূরণ করতে পেরেছে?

১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যার কিছু আগে একটা খবর পেলাম ছাত্রলীগের (আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন) কিছু নেতাকর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওল্ড ক্যাম্পাসে এক সভায় মিলিত হচ্ছে। 'বাংলাদেশ' জন্ম নেওয়ার পর বলতে গেলে রাজনৈতিক কর্মীদের ওটাই প্রথম সমাবেশ। ২৫ মার্চের (১৯৭১) পর ঢাকা শহর ও জেলাগুলোতে ছাত্রলীগের ছেলেমেয়েরা কার্যত গুপ্ত সংগঠন পরিচালনা করছিল। সেদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে ছাত্রলীগের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সন্ধ্যার পর আমাদের সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সাংবাদিকদের বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তবু আমি খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওল্ড ক্যাম্পাসের দিকে রওয়ানা দিলাম। ৭০-৭৫ জন ছেলেমেয়ে, সবার বয়স বাইশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। বলতে গেলে প্রত্যেকেই সশস্ত্র। এমনকি কারও কাঁধে স্টেনগান ও মারাত্মক কার্বাইন। আমি একটু ভয়ই পেলাম। সভা বাইরেই শুরু হলো, আমি পরিচয় দিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। বেশ খানিকটা উত্তেজিত কথাবার্তা সভার মধ্যে চলছিল। হঠাৎ আমার নজরে এলো তখনকার বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছাত্রনেতা আবদুর রব সেখানে দাঁড়িয়ে। আবদুর রবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আগরতলায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে। এমনকি ১৬ ডিসেম্বর আগরতলা থেকে কুমিল্লার পথে রওয়ানা দেওয়ার আগে আমি যে বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য উঠেছিলাম, সেটাই ছিল রবের আস্তানা। আমি, রব ও আমার সহকর্মী গণেশকে ওই বাড়ির গৃহকর্ত্রী একটা বড়ো থালায় আলুসেদ্ধ আর ভাত মেখে দিয়েছিলেন। আমরা তিনজন একসঙ্গে একই থালা থেকে ভাত খেয়ে দ্রুত কুমিল্লার পথে ছুটেছিলাম। আবদুর রব কুমিল্লা থেকে আমাদের সামরিক বাহিনীর একজনের সঙ্গে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গিয়েছিল। রব সভায় আমাকে দেখতে পেয়ে কাঁধে ঝোলানো স্টেনগানসহ আমায় জড়িয়ে ধরল এবং তার অন্যতম সহযোদ্ধা শাজাহান সিরাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। শাজাহান সিরাজের গায়ের রং বেশ ময়লা; কিন্তু অসাধারণ সুন্দর। সিরাজও আমাকে আলিঙ্গন করল। সভায় দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে, শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসবেন কবে এবং তিনি আদৌ ফিরবেন কি না, তিনি জীবিত না মৃত– এটাই ছিল আলোচনার মূল বিষয়।

২৫ মার্চের (১৯৭১) পর ঢাকা শহর ও জেলাগুলোতে ছাত্রলীগের ছেলেমেয়েরা কার্যত গুপ্ত সংগঠন পরিচালনা করছিল। সেদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে ছাত্রলীগের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

কোনো একজন ছাত্রনেতা, তার নাম আমি এখন আর মনে করতে পারছি না, তিনি সভায় উদ্বিগ্ন চিত্তে একটা প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নটি হলো, 'আমরা কি শেষ পর্যন্ত ভারত এবং ভারতীয় হিন্দুদের আধিপত্যের অধীনে চলে যাচ্ছি?' এই প্রশ্নে সভার মধ্যে খুব শোরগোল উঠল। রব খুব উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ প্রশ্ন করার সময় এখনো আসেনি– এখন আমাদের হাজার হাজার মুক্তিবাহিনীর কর্মীর হাত থেকে হিন্দুদের ভাতের গন্ধ শুকিয়ে যায়নি। রবের এই মন্তব্যের পর কিছুক্ষণ সভায় স্তব্ধতা এলো, এরপরে রব আবার বলল, আমরা কারও আধিপত্যের অধীনে যাওয়ার জন্য এই যুদ্ধ করিনি।' তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঢাকার রাজপথে অন্ধকার নেমেছে। ওল্ড ক্যাম্পাসে লো ভোল্টেজের বিদ্যুতের আলো টিমটিম করে

জ্বলছে। আমি ভাবছিলাম, যদি রিকশা না পাই, তাহলে হোটেলে ফিরব কী করে? এই সময় রব এগিয়ে এসে আমায় বলল, 'তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার।' এই বলে সিরাজকে ইশারা করল। সিরাজ তখন একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। রবের ইশারায় মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়েই সিরাজ আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সিরাজ কোনো ভূমিকা না করেই আমায় বলল, 'চলেন, আপনারে জায়গা মতো পৌঁছাইয়া দিই।' সিরাজের এই কথা শুনে মেয়েটিও বলল, 'তা হইলে আমিও তোমাদের লগে যাই।' সিরাজ তখন মেয়েটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। এমএ পড়ে, ছাত্রলীগের কর্মী। মেয়েটির নাম খুব বড়ো। বয়স ২৫-২৬ হবে। ভালো দেখতে। আমি বললাম, অত বড়ো নাম আমি মনে রাখতে পারব না। আমি আপনাকে 'খুকি' বলেই ডাকব। মেয়েটি হেসে উঠে বলল, "তা হইলে তো তুমি কইতে হইব, খুকি ডাইক্যা 'আপনি' কওয়া যাইবে না।" আমিও তাতে রাজি হলাম। ওরা আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালের দিকে। মিনিট পনেরো-কুড়ি সময় লাগল সেখানে পৌঁছতে। হাঁটতে হাঁটতে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, সিরাজ ও খুকি খুব অন্তরঙ্গ এবং সে সিরাজের বাগদত্তা। আমাকে হোটেলের গেটে পৌঁছে দিয়ে সিরাজ যখন বিদায় নিচ্ছিল, আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা কি এভাবেই ফিরবে, কোনো অসুবিধে হবে না?' সিরাজ একটু হেসে আমার দুটো হাত তার কোমরে বুলিয়ে দিল। সেখানে তার দুটি মারণাস্ত্র রয়েছে। ওরা আমাকে 'আদাব' জানিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে সিরাজ আমার হোটেলের রুমের নম্বরটা জেনে নিল।

২০ কিংবা ২১ ডিসেম্বর আমরা সকালে জানতে পারলাম যে, আজ দুপুরের দিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরছেন এবং তাঁরাই বাংলাদেশের নতুন প্রশাসনের নেতৃত্ব দেবেন

২০ কিংবা ২১ ডিসেম্বর আমরা সকালে জানতে পারলাম যে, আজ দুপুরের দিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরছেন এবং তাঁরাই বাংলাদেশের নতুন প্রশাসনের নেতৃত্ব দেবেন। বিকেলে খবর পেলাম, সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। এই অনুষ্ঠানটি হবে আগেকার গভর্নরের বাসভবনের একটি হলঘরে। এই ভবনটির কিছু কিছু অংশ ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে ভেঙে গিয়েছে। কারণ এখানে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্নর ডা. এএম মালেক বাস করছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ভারতীয় সাংবাদিকরা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। আমাদের রিপোর্টারদের অনেকেই 'অলিভগ্রিন' অর্থাৎ সৈন্যদের পোশাকের মতো শার্ট-প্যান্ট পরা ছিলেন।

শপথ অনুষ্ঠান যখন চলছে, তখন হঠাৎ আমার নজরে এলো কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে বিখ্যাত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী বসে আছেন। ছাত্রজীবনে সুখময়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু এখন তো অনেকটা দূরত্ব। আমাকে চিনতে পারবে কি না বলা মুশকিল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে একজন উর্দি পরা পিয়ন একটা ছোট্ট চিরকুট আমার হাতে দিল। তাতে আমার ডাক নামে সম্বোধন করা সুখময়ের উক্তি, 'চলে যাবে না।' আমি চিরকুটটি পকেটে রেখে দিলাম। রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ পাঁচ-ছয়জন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হলে আমাদের চায়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী এগিয়ে এসে আমায় বলল, আমি একদমই চিনতে পারছিলাম না তোমার এই শার্ট-প্যান্ট পরা দেখে। চা খাওয়ার পরে তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। অন্যান্য রিপোর্টার ও অতিথি স্থান ত্যাগ করার পর সুখময় ও আমি একটা লম্বা করিডর দিয়ে এগিয়ে খানিকটা নির্জন জায়গায় দাঁড়ালাম। সেখানকার একটা অংশ আমাদের বিমানবাহিনীর রকেট হামলায় ভেঙে গিয়েছে। সুখময় আমার কাছে জানতে চাইল, আমি কবে ঢাকায় ঢুকেছি? এসে কী কী দেখেছি? পাকিস্তানি আমলের কোনো নেতা বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কি না!

এখনকার প্রজন্মের বাঙালিরা নিশ্চয়ই জানেন না যে, সুখময়ের বাবা সোমনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ঢাকা হাইকোর্টের প্রথম হিন্দু বিচারপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব সুখময়ের বাবাকে চট্টগ্রামের জেলা জজের পদ থেকে হাইকোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত করেছিলেন। সেই সময় বিশেষ করে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত সুখময় মাঝেমধ্যে ঢাকায় বাবা-মায়ের কাছে আসত। আমি সুখময়কে বললাম, তোমার বাবার পুরোনো সহকর্মী ও আইনজগতের লোকজন তো কেউ কেউ নিশ্চয়ই ঢাকায় রয়েছেন। তুমি সরকারিভাবে না হোক, ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকে তাদের সঙ্গে একবার কথা বলতেই তো পার, তোমার বাবার খুব খাতিরের লোক ছিলেন সেই সময়কার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ঢাকাতেই রয়েছেন। সুখময় সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে জানতে চাইল, আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি কি না? এখানে একটা মজার কথা বলা যেতে পারে। সুখময় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বিএ ও এমএতে ফার্স্টক্লাস পাওয়ার পর যখন ঢাকায় ওর বাবার (সোমনাথ চক্রবর্তী) কাছে গিয়েছিলেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সুখময়কে তার বাড়িতে ডিনার খাইয়েছিলেন এবং বাবা-মায়ের উপস্থিতিতে আতাউর রহমান সাহেব সুখময়কে 'পাকিস্তানের নাগরিকত্ব' গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সুখময় তাতে রাজি হলে পাকিস্তান সরকার তাকে অর্থাৎ সুখময় চক্রবর্তীকে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ বা হার্ভার্ডে পড়ার সব খরচ বহন করবে। কিন্তু সুখময় হেসে জবাব দিয়েছিল যে, সেটা সম্ভব নয়। আমি সুখময়কে খানিকটা প্রগল্‌ভভাবে বলেছিলাম, সেসব কথা মনে পড়ে মানিক'– সুখময়ের ডাকনাম মানিক। এ কথা বলে সুখময়ের গাল টিপে দিয়েছিলাম। সুখময় হেসে আমায় বলেছিল, 'তুমি একেবারেই বদলাওনি। সেই একই রকম রয়ে গেলে!' গভর্নরের বাড়ি থেকে আমি সুখময়ের সঙ্গেই হোটেলে ফিরে এলাম। পরের দিন সকালে সুখময় ওর ঘরে আমাকে ব্রেকফাস্ট খাইয়েছিল। সুখময়কে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যেই ঢাকা পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারাটা কেমন এবং সেই মুহূর্তে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির কতটা প্রয়োজন, বাংলাদেশের পক্ষে তা যাচাই করার জন্য।

আমার দুটো ব্যাপারে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। এর মধ্যে প্রথম হলো, লেখার কাগজের অভাব; কারণ ঢাকায় তখনও দোকানপাট বন্ধ। দ্বিতীয়টা হলো, আমি আমার জামাকাপড় সবই আগরতলায় ফেলে রেখে বলতে গেলে একবস্ত্রে ঢাকায় এসেছি। সেটা একটা মস্ত বড়ো অসুবিধা, যার ফলে অলিভগ্রিন পোশাক পরে সব জায়গায় যাওয়া একটু বেমানান। লেখার কাগজ বা খাতা কোথাও পাওয়া যায় কি না, এজন্য একদিন দুপুরনাগাদ হোটেলের গেটের কাছে অপেক্ষমাণ একটা রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করছিলাম। হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালের গেটের কাছে সবসময়ই কিছু না কিছু লোক দাঁড়িয়ে থাকত। আমি যখন রিকশাওয়ালাকে কাগজের দোকানের কথা জিগ্যেস করছিলাম, ওই দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মধ্যে সেটা কারও কানে গিয়েছিল। প্রায় আমারই কাছাকাছি বয়সের এক ভদ্রলোক, খুব সুন্দর দেখতে, তিনি এগিয়ে এসে আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি কলকাতার কোন কাগজের রিপোর্টার? আমার উত্তর পেয়ে তিনি তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রমহিলাকে ডেকে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করালেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী এবং স্ত্রীও বেশ সুশ্রী। ওই ভদ্রলোক আমার হোটেলের ঘরের নম্বরটা জেনে

নিলেন। বললেন ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে তিনি শখানেক পাতার খাতা জোগাড় করে দেবেন। পাওয়ার আগেই আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম আর হোটেলের ঘরে ফিরে গেলাম।

ঘণ্টাদুয়েক পরে রিসিপশন থেকে আমায় জানাল, মোস্তাফা জামান আব্বাসী বলে এক ভদ্রলোক আমার ঘরে আসতে চাইছেন। আমি সম্মতি দিলাম, সেই ভদ্রলোক আমার ঘরে এলেন দুখানা মলাটহীন খাতা নিয়ে। বোঝা গেল, অন্য কারও লেখাপড়ার কাগজ তিনি আমার জন্য নিয়ে এসেছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং আমার এখানে আরেকদিন আসার জন্য অনুরোধ করলাম। এই কাগজ পাওয়ার ফলে আমার সংকট অনেকটাই মিটল। এদিকে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। হোটেলে খানিকটা সাজগোজ হচ্ছে। কারণ তখন বাংলাদেশে একটা নতুন সরকার প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছে। ঢাকা শহর অনেকটা ধীরে হলেও স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। সম্ভবত ২৩ কি ২৪ ডিসেম্বর সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ মোস্তাফা জামান আব্বাসী সস্ত্রীক আমার ঘরে এলেন। আমাকে ও আমার সহকর্মী গণেশকে তাঁদের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় খেতে নিমন্ত্রণ করার জন্য। আমি আব্বাসীকে বললাম, ভাই আমি খুব বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাচ্ছি, অন্তত তৈরি পাজামা-পাঞ্জাবির দোকান খুলছে কি না? এই সময় আব্বাসীর স্ত্রী আর আব্বাসী দুজনে নিজেই কয়েকটা লোকের নাম উচ্চারণ করলেন। যদি ওখানে ওদের ব্যবহৃত রেডিমেড কিছু পাওয়া যায়। আব্বাসীর স্ত্রী আমাকে এবং তাঁর স্বামীকে পিঠে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াতে বললেন। মেয়েদের একটা আলাদা দৃষ্টি থাকে। তিনি আমাদের দুজনের উচ্চতা এবং দেহে আমরা দুজন কতটা কমবেশি চওড়া, এটা তিনি অনুমান করে নিলেন। অর্থাৎ তাঁর চোখের এই মাপ দিয়ে তিনি আমার জন্য রেডিমেড কিছু সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। ঠিক পরের দিন সকালে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী আমার ঘরে এলেন একজোড়া পাজামা, একজোড়া পাঞ্জাবি নিয়ে। পাঞ্জাবি দুটো একটু বড়ো; কিন্তু পাজামা দুটো মোটামুটি আমার মাপেই আছে। আমি এর দাম জিগ্যেস করলাম। আব্বাসীর বাচনভঙ্গিতে কোনো বাঙাল উচ্চারণ ছিল না; কিন্তু ওঁর স্ত্রী 'বাঙাল' সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তিনি কোন জেলার লোক, সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি যখন পয়সার কথা তুললাম, তখন আব্বাসীর স্ত্রী কপালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই আল্লাহ কিথা কন, বইনে দিচ্ছে পয়সা লাগে কি না!' 'কিথা কন' শব্দটা শুনে আমি বুঝতে পারলাম এই ভদ্রমহিলা শ্রীহট্ট জেলার।

আসমা ও আব্বাসী স্বামী-স্ত্রী দুজনে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের পুরানা পল্টনের বাড়িতে খেতে যাওয়ার জন্য। ঠিক হলো পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা পুরানা পল্টনে যাব। চলে যাওয়ার সময় আব্বাসী আমাদের বললেন, আপনারা আমার বাবাকে চিনবেন, বোধহয় দেখেও থাকবেন। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চাইলাম। আব্বাসী জানালেন, ওঁর বাবার নাম আব্বাসউদ্দিন। আমার সহকর্মী গণেশ এতক্ষণ অনেকটা নিস্পৃহ; কিন্তু আব্বাসউদ্দিনের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার বাবার বন্ধু। আব্বাসউদ্দিন ও সাইগল আমাদের বাড়িতে যেতেন। গণেশ পেশায় ফটোগ্রাফার হলেও গানবাজনা ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ আব্বাসউদ্দিনের একটা গানের লাইন গেয়ে উঠল। কিছুক্ষণ গণেশ, আসমা ও আব্বাসী তিনজনেই আব্বাসউদ্দিনের একটা গান একসঙ্গে গাইলেন। আগেই বলেছি, শীতের দিনে ঢাকায় বিকেল ৫টা বাজতেই অন্ধকার হয়ে আসে। পরের দিন আমরা সন্ধ্যার দিকে আব্বাসউদ্দিনের বাড়িতে গেলাম। পূর্ব বাংলার মফস্বল শহরগুলোর প্রায় সব জায়গাতেই ঘরবাড়ির একটা একই রকম ধরন আছে। ঢাকাও তার ব্যতিক্রম নয়। বাড়িটির চারপাশে বাঁশের ও টিনের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দরজায় কড়া নাড়তেই আসমা খিল খুলে দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করে নিলেন। বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে আমি যতটা বিস্মিত হয়েছি, এর চেয়ে বেশি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। সরু পাড়ের একখানা সাদা শাড়ি পরা এক বর্ষীয়সী মহিলা একটি তুলসীগাছের গোড়ায় জল ঢালছেন। লাল সিমেন্টে প্রায় কোমরসমান উঁচু মঞ্চে বেশ একটি বড়ো তুলসীগাছ। আমি একটা ছোট্ট ঘরের মাটির বারান্দায় বসে পড়লাম, তখনও ওই মহিলা ঘটি উপুড় করে জল ঢালছেন। আমি মাটিতে বসে পড়ায় আসমা হা হা করে দুখানা আসন নিয়ে ছুটে এলেন। আমি আসন ছাড়াই মাটিতে বসে রইলাম। তুলসীগাছের গোড়ায় জল ঢালার পরে ওই মহিলা এগিয়ে আসতেই আমি তাঁকে প্রথম নমস্কার করলাম। তিনি বিনা দ্বিধায় আমার হাত দুটো জড়িয়ে, পরে আসমাকে বললেন, 'ওই বারান্দায় একটা মাদুর পাতো। আমার স্বামী আব্বাসউদ্দিন সাহেব মাটির বারান্দায় মাদুরে বসতে এবং শুতে খুব ভালোবাসতেন।' বাড়িটিতে দুখানা আলাদা দালান আছে আর একটা টিনের চালের মাটির মেঝের বাড়ি, যেখানে আমি বসে আছি। আব্বাসউদ্দিন সাহেব দেশভাগের পরে এই বাড়িটাই তার পরিচিত একটি হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে কিনেছিলেন। বাড়ির উঠোনে একটা নিমগাছ, একটা বড়ো বেলগাছ ও তুলসীমঞ্চ সেই সময় থেকেই রয়েছে। আব্বাসউদ্দিন ও তার ছেলেমেয়েরা যথাযথভাবে অন্য দুটি গাছের সঙ্গে তুলসীগাছেরও পরিচর্যা করে চলেছেন। আমি আব্বাসউদ্দিনের স্ত্রীকে জানালাম যে, আমি আব্বাসউদ্দিন সাহেবকে একবারই ১৯৫৪ সালে কলকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে গান গাইতে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে তাঁর গায়িকা কন্যা ফেরদৌসীও ছিলেন। ফেরদৌসী তখন ফ্রক পরে, ১৩-১৪ বছর বয়স। পরবর্তীকালে ফেরদৌসী বাংলা গানের সঙ্গে এই উপমহাদেশের ক্লাসিক্যাল গানের জগতে খুবই নাম করেছেন। সেদিন ঢাকায় আব্বাসউদ্দিনের বাড়িতে আমাদের একটি চমৎকার সন্ধ্যা কেটেছিল। কেবল তা-ই নয়, ঢাকায় ওই প্রথম আমি একটি মুসলমান পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আসমা ও আব্বাসীর চার-পাঁচ বছরের একটি মেয়েকে তখনই ভালো গান গাইতে এবং ঢাকার টিভিতে তাকে প্রায়ই শিশুমহলে গান গাইতে দেখা যেত। পরবর্তীকালে শুনেছি, সে খুব বড়ো গায়িকা হয়েছে।

ঢাকায় আমার এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে প্রায় উত্তেজনার মধ্যে। এখন ঢাকা শহর ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। যদিও শেখ মুজিবুর রহমানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত খবর ছিল না। তবে তিনি জীবিত এটা মোটামুটি জানা। এই সময়ের ভেতরে সম্ভবত ১৮ কিংবা ১৯ ডিসেম্বর আমি ও গণেশ মুজিবুর রহমানের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন এই উপমহাদেশের তৎকালীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ। বেগম মুজিবুর রহমান তাঁদের ধানমন্ডির বাড়িতে থাকতেন না, তাঁদের নিজের বাড়ির পাশে তিনি তাঁর এক বোনের বাড়িতে থাকতেন। ওই বাড়িতেই একাত্তরের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে হাসিনা তাঁর প্রথম সন্তানের মা হন। আমরা দুজনে যখন তোফায়েলের সঙ্গে বাড়ির বসার ঘরে পৌঁছলাম, তখন হাসিনা তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়ে জানালার বেদিতে বসে ছিলেন। হাসিনার তখন ২৩-২৪ বছর বয়স, বেগম মুজিবের কয়েকখানা ছবি তুলল গণেশ, এরপরে বেগমসাহেবা একখানা ট্রেতে দুই গ্লাস খাওয়ার জল নিয়ে এলেন। বেগম যখন খাওয়ার জল ট্রে করে আনছিলেন, হাসিনা তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে বেদি থেকে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে চিৎকার করে মাকে বললেন, 'মেহমানদের খালি পানি দিলা!' –এই কথা বলে হাসিনা এক হাত দিয়ে মা'কে নিরস্ত করলেন। ভেতরে মা-মেয়ের কথা হচ্ছে। মা বলছেন, 'কী করুম, ঘরে তো আস্ত বাতাসা, বিস্কুট কিছুই নাই। যা আছে সব ভাঙা, গুঁড়া গুঁড়া।' মেয়ের জবাব, 'ওই ভাঙাগুলোই দাও। খালি পানি দিও না।' খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের কথা। হাসিনার মনের এই স্নিগ্ধ ছবি আমার মনে চিরদিনের জন্য গাঁথা হয়ে আছে।

ঢাকায় আমার এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে প্রায় উত্তেজনার মধ্যে। এখন ঢাকা শহর ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। যদিও শেখ মুজিবুর রহমানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত খবর ছিল না। তবে তিনি জীবিত এটা মোটামুটি জানা

এই সময় আর একদিন আমার ঢাকা জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু কামাল লোহানী এক ঘন কুয়াশার ভোরে হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালে আমার রুমে চলে এলো। কামাল লোহানী কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিউজ এডিটর ছিল। কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। কামাল পাবনার

ছেলে, কলকাতা আকাশবাণীর খুব পরিচিত সাংবাদিক প্রণবেশ সেনের সহপাঠী। শৈশব ও কৈশোরে তারা পাবনা শহরে একসঙ্গে পড়াশোনা করত। কামাল গল্প লেখে, কবিতা লেখে, অভিনয় জানে, নাট্যনির্দেশক এবং একসময়ে পূর্ব বাংলার বিখ্যাত 'বেহুলা' ছবিতে নৃত্যনির্দেশকও ছিল। কামাল আমার রুমে ঢুকেই বলল, 'চলো, একটা বাড়িতে তোমারে নিয়ে যাব।' আমি বললাম, এত ভোরে! কামাল জবাব দিল, 'সেটা আমার বিবেচ্য।' আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। ঘন কুয়াশায় তখনও ভালো করে পথ দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা হেঁটে একটা রিকশা পাওয়া গেল। যে বাড়ির সামনে আমরা রিকশা থেকে নামলাম, সেটি একটি ছোটো দোতলা বাড়ি। কিন্তু বাড়ির লনটি খুবই সুন্দর। রিকশা থেকে নেমেই দেখতে পেলাম এক বৃদ্ধ দম্পতি লনে পায়চারি করছেন। বৃদ্ধা আমাদের পায়ের শব্দে তাকিয়ে উৎসাহের সঙ্গে তাঁর স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, 'দেখো, দেখো কে আইছে।' কামাল লোহানী এগিয়ে এসেই প্রথম ভদ্রমহিলাকে প্রণাম করল। এরপর ভদ্রলোকের প্রায় পা স্পর্শ করার মতো করল। ভদ্রলোক টাইভেস্ট কোট এবং মাথায় ফেল্ট হ্যাট পরা একেবারে সাহেবি পোশাকে, হাতে লাঠি। কামাল আমার হাত ধরে ভদ্রমহিলাকে বলল, কলকাতার রিপোর্টার। এই বলে আমার নামটা জানাল আর ওর পরিচয় দিয়ে আমাকে বলল, ইনি সুফিয়া কামাল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে হাত দিলাম। উনি 'আরে, আরে কী করো' বলে উঠলেন, আমি জবাব দিলাম আপনার মতো সাহসী মহিলা ঢাকায় খুব বেশি আছে বলে তো শুনিনি। আমি আপনার সাহসকেই প্রণাম করলাম। ভদ্রলোক আমাকে হাত ধরে নিয়ে লনে একখানা খালি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কামাল লোহানী বাড়ির বারান্দা থেকে আরও তিনখানা চেয়ার নিয়ে এলো। সুফিয়া কামাল যে বাংলা সাহিত্যের খুব পরিচিত ব্যক্তিত্ব, এটা না বললেও চলে। তবে তাঁর স্বামীকে অনেকেই চেনেন না। তিনি অবিভক্ত বাংলার বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের অফিসার ছিলেন। দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অনেক উচ্চপদে কাজ করেছেন। বছরদশেক আগে অবসর নিয়েছেন। একটু পরে সুফিয়া কামাল আমাদের সবাইকে নিয়ে ভেতরে খাবার টেবিলে গেলেন। এবং শীতের বাংলায় এমন লোভনীয় খাবার আমার সামনে দিলেন, সেটাও ঢাকায় আমার প্রথম খাওয়া– খেজুর রসের পায়েস ও পাটিসাপটা। কামাল লোহানী এই পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং পরবর্তীকালে আমি যতদিন ঢাকায় ছিলাম, সুফিয়া কামালের সঙ্গে আমার দেখা হতো বাংলা একাডেমি, কখনো কবিতার আসরে ও সাধারণ সাহিত্য আলোচনায়। ২৫ মার্চ (১৯৭১) শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পর ঢাকা শহরে যে বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাতে সুফিয়া কামালের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। তখন এ রকম একটা অসমর্থিত খবর কলকাতার খবরের কাগজগুলোয় প্রকাশিত হয়েছিল যে, 'কবি সুফিয়া কামাল পাক সৈন্যদের গুলিতে নিহত।'

৩১ ডিসেম্বর (১৯৭১) আমি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসি। কারণ আগেই বলেছি, বলতে গেলে একবস্ত্রে ঢাকা পৌঁছেছিলাম। আমার জিনিসপত্র আগরতলায়। আমার এক সহকর্মী বন্ধুর বাড়িতে ছিল। ঢাকা থেকে আগরতলা আমাকে আসতে হয়েছিল এমন এক পথে, যা প্রায় আট ঘণ্টার অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ যাত্রাপথ। ঢাকা থেকে রিকশায় শীতলক্ষ্যার পারে এসে একটি লঞ্চে শীতলক্ষ্যা পেরিয়ে আবার ঘণ্টাখানেক একটা বাসে সোনারগাঁও গ্রামে পৌঁছলাম। সোনারগাঁও যে নদীর পারে, সেটিকে ছোটো মেঘনা বলা হয়। কিন্তু ছোটো মেঘনা যতখানি বিস্তৃত, তা দেখে আমার বিস্ময় হয়েছিল এই ভেবে যে, বড়ো মেঘনা কতখানি বড়ো? ছোটো মেঘনা আমি পাড়ি দিলাম অন্য কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে নৌকাতে এবং যে ছেলেটি নৌকা চালাচ্ছিল, তার বয়স খুব বেশি হলে ১৪-১৫ বছর। ওই বয়সেই সে পাকা মাঝি। শীতের মেঘনা নিস্তরঙ্গ হলেও জলের দিকে চোখ মেলে চাইলে একটু ভয় হয়। জলের রং আকাশের কালো মেঘের মতো। আমি ভালো সাঁতার জানি; কিন্তু যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম ততক্ষণ আমার বেশ ভয় ভয় করছিল। ছোটো মেঘনা পাড়ি দিয়ে আবার রিকশায় চেপে ১০-১৫ মিনিট পরে বড়ো মেঘনার পারে এসে পড়লাম। সেখানে দেখলাম আমাদের ভারতীয় সৈন্যদের একটি ঘাঁটি, সেখানে স্টিমারের মতো বড়ো বড়ো লঞ্চ এবং সেই সঙ্গে ভাসমান লোহার প্ল্যাটফর্মের মতো কতগুলো জিনিস বাঁধা রয়েছে। আমাদের কতগুলো ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি। একটি বড়ো লঞ্চ এগুলোকে টেনে বড়ো মেঘনা পাড়ি দিয়ে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ঘাটে যাবে। আমি লঞ্চে উঠে বসলাম। এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল দাউদকান্দির ঘাটে পৌঁছতে। দাউদকান্দি এই অঞ্চলের খুব বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র। তাছাড়া মেঘনার পারে অবস্থিত এই জায়গাটির অনেক ইতিহাস আছে। আমি ইতিহাসের যেটুকু জানি তাতে ১৯৩০-এর এপ্রিলে 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান' ঘটিয়ে, গণেশ ঘোষসহ কয়েকজন বিপ্লবী দাউদকান্দিতে সেই সময়কার ও পরবর্তীকালের বিখ্যাত আইনজীবী কামিনীকুমার দত্তের বাড়িতে কয়েকদিন আত্মগোপন করেছিলেন। দাউদকান্দি ঘাট থেকে কুমিল্লা শহরে যাওয়ার পাকা সড়ক আছে। অটোতে করে কুমিল্লার দিকে এগোবার একটু পরেই দেখতে পেলাম, বহু হিন্দু মন্দির এবং সেখানে রাস্তার ওপর আমাদের জওয়ানদের প্রশ্ন করে জানলাম এগুলো শিবমন্দির। আমি অটো থেকে নেমে মন্দির দেখতে এগিয়ে গেলাম এবং আমাদের সৈন্যদের মতো শিবলিঙ্গে বেলপাতা অর্পণ করে এলাম।

> ছোটো মেঘনা আমি পাড়ি দিলাম অন্য কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে নৌকাতে এবং যে ছেলেটি নৌকা চালাচ্ছিল, তার বয়স খুব বেশি হলে ১৪-১৫ বছর। ওই বয়সেই সে পাকা মাঝি

কুমিল্লা শহরে পৌঁছে একটা চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, ত্রিপুরা সীমান্ত এখান থেকে কতটা পথ? যে নদীটির পারে ত্রিপুরার সোনামুড়া শহর, তা কুমিল্লা থেকে প্রায় ১৮ মাইল। আমাকে কয়েকটি রিকশা বদল করে ওই পথ পাড়ি দিতে হবে। রিকশা করে কুমিল্লা শহরের পথ দিয়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা স্কুলবাড়ি। তার গায়ে বড়ো করে লেখা 'ঈশ্বর পাঠশালা'। এই বিদ্যালয়টির অবিভক্ত বাংলায় খুব নাম-ডাক ছিল। আমি রিকশাওয়ালাকে থামিয়ে বিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে আছি, এই সময় উলটো দিকের বাড়ি থেকে ধুতি পরা একজন বৃদ্ধলোক এগিয়ে এলেন। যেহেতু আমার পরনে সৈন্যদের মতো সবুজ প্যান্ট ও শার্ট ছিল, ভদ্রলোক ভেবেছিলেন আমি বোধহয় ভারতীয় সৈন্য। তিনি এগিয়ে আসতেই আমি তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, আমি কেন এই স্কুলটি সম্পর্কে কৌতূহলী। আমি বললাম যে, এই স্কুলটির অনেক নাম শুনেছি। তাছাড়া আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা অধ্যাপককে খুব ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি, যিনি এই 'ঈশ্বর পাঠশালা'র ছাত্র ছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর নাম জানতে চাইলে আমি জবাব দিলাম। তাঁর নাম অধ্যাপক অম্লান দত্ত। ভদ্রলোক বললেন, 'ও চিনতে পারলাম, ওই তো অগো বাড়ি কাছেই, দেখবেন?' না, বাড়ি দেখতে চাই না, আমি 'ঈশ্বর পাঠশালা' দেখতে চাই। তিনি আমাকে পাঠশালার মধ্যে নিয়ে গেলেন। পাঠশালাটি প্রথম যেভাবে ছিল, এর চালের টিন ও কাঠের খুঁটি কালচক্রের আবর্তনে মাটিতে বসে গিয়ে এতটা নিচু হয়েছে যে, চাল মাথায় ঠেকে যায়। সেখানে এখন আর ক্লাস হয় না; কিন্তু স্মারক হিসেবে সেটি রয়েছে। পাশে দালানবাড়িতে ক্লাস হয়। পরে কলকাতায় সেই যাত্রাতেই আমি অধ্যাপক অম্লান দত্তের সঙ্গে দেখা করে তাঁর 'ঈশ্বর পাঠশালা'র কথা বলেছিলাম। অধ্যাপক অম্লান দত্তকে আমি অম্লানদা বলেই ডাকি। ওই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। তিনি আমাকে এতটাই স্নেহ করতেন যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আমাকে দেখিয়ে বলতেন, 'সুখরঞ্জন যদিও আমার ছাত্র নয়, তাহলেও ও আমার ছাত্রের মতো। বলতে গেলে ওকে আমি ছোটো থেকেই চিনি।' অধ্যাপক অম্লান দত্ত আমার লেখা যুগান্তরের বিভিন্ন রিপোর্টের বহুবার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

এভাবেই আমি আগরতলায় পৌঁছেছিলাম।

লেখক: প্রয়াত সাংবাদিক, ভারত

দীপক-সুরজিৎ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

মানিক ব্যানার্জি

১৯৭১-এর প্রথমদিক। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, যা অধুনা বাংলাদেশ তখন উত্তাল। একদিকে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণের স্বাধীনতার লড়াই– অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, তাদের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও দালালদের সেখানকার মানুষের ওপর নৃশংস অত্যাচার, স্বভাবতই এর ফলে দলে দলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী জেলায় আশ্রয় নিচ্ছিলেন। ভারতও সার্বিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ে তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের সন্ত্রাসের মাত্রাও বাড়তে থাকে।

সেই অগ্নিগর্ভ সময়ের শুরুতে কলকাতার দুই অসীম সাহসী তরুণ সাংবাদিক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরজিৎ ঘোষাল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর অত্যাচারের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় বনগাঁও সীমান্ত দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ খুলনা-যশোর হয়ে ঢাকার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। এদের সঙ্গে আমারও যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি তখন এক Adventure Programme-এ কলকাতার বাইরে থাকায় ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়া হয়নি।

এই ধরনের বিপজ্জনক ও দুরন্ত অভিযানের বীজ রোপিত হয়েছিল কয়েক বছর আগে, যখন আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় অধ্যয়ন শুরু করি। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে (১৯৬৭-৬৯ কোর্স) সাংবাদিকতার ক্লাসে প্রথম দেখা দীপকের সঙ্গে। উদার ও আধুনিক চিন্তাধারায় বড়ো হওয়া দীপক ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন ও দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ভর্তি হলো সাংবাদিকতার ক্লাসে। নেতৃত্ব দেওয়ার স্বভাবজাত গুণে দীপক অচিরেই ছাত্রছাত্রীদের দলনেতা হয়ে উঠল। সেই দলে শামিল ছিলাম আমি, সমর ঘোষাল, নীহার মজুমদার, অমলেন্দু কুণ্ডু ও পুলিনবিহারী (পিন্টু) ভট্টাচার্য। সক্রিয় সমর্থন ছিল স্বপন মুখার্জি, প্রবীর ভট্টাচার্য, কমল ভট্টাচার্য, সমর মুখার্জি, স্বপন মল্লিক, সুকান্ত গাঙ্গুলী এবং তৎকালীন ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ত্রিদিব চক্রবর্তী ও সুবীর চৌধুরীদেরও। মেয়েদের মধ্যে ছবি ঘোষ, প্রতিভা মিত্র,

উর্মিলা মজুমদার, শিখা বোসরাও যোগ দিয়েছিল। সবাই ছিলাম ১৯৬৭-'৬৯-এর ছাত্রছাত্রী। এছাড়া আমাদের আগের ব্যাচের রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত ভট্টাচার্য ও পরের বছরের সুরজিৎ ঘোষাল, অঞ্জন রায়, পাঁচুগোপাল দত্ত প্রমুখ অনেকেই Actively involved ছিল।

সেই ছাত্রসংসদ সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রীর জন্য বেশকিছু কাজ করতে সমর্থ হয়েছিল। যার মধ্যে প্রধান ছিল, এই বিভাগে এমএ ডিগ্রি কোর্স চালু করা। তখন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের মতো সাংবাদিকতা বিভাগের পাঠ্যক্রমের সময়সীমা ছিল দুই বছর। কিন্তু শিক্ষান্তে দেওয়া হতো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। প্রভূত আন্দোলন, ধরনা ও ধর্মঘটের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিপ্লোমার পরিবর্তে ডিগ্রি কোর্স চালু করতে সম্মত হয়। অবশ্য এর সুফল আমরা পাইনি। এই ডিগ্রি কোর্স চালু হতে আরও বছরদুয়েক সময় লেগেছিল।

আরেকটি বিষয় ছিল, বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্টাডি ট্যুরে যাওয়া। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্টও নির্দিষ্ট ছিল। দীপকই খোঁজখবর করে প্রথম সেই খবর বার করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে তদবির করে সেই গ্র্যান্টও বের করে। সেবার আমরা ও আমাদের পরের বছরের ছাত্রদের এক দল সিকিমে যাই। সিকিম তখন ছিল স্বাধীন রাজ্য। যার প্রধান ছিলেন সিকিমের শেষ রাজা বা Chogyal পলডেন থন্ডুপ নামগিয়াল। এই স্টাডি ট্যুরে সেই সময়ে পিটিআইয়ের গ্যাংটকের সংবাদদাতা মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় খুবই সাহায্য করেছিলেন। এই ছাত্রসংসদ সাংবাদিকতার ওপর একটি ম্যাগাজিন করেছিল। আয়োজন করেছিল এক Journalism Seminer-এর। রাজ্যের নামি সাংবাদিকরা এতে অংশ নিয়েছিলেন।

সাংবাদিকতার ক্লাস করার সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণক্ষেত্র থেকে রিপোর্টিংয়ের ঘটনা আমাদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিল। দীপক, সুরজিৎ ও আমি ভাবতাম, স্বপ্ন দেখতাম, শুধু ব্রিফিং নির্ভর রিপোর্টিং না করে ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদন পাঠানোর। অচিরেই সেই সুযোগ এসে গেল পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের হাত ধরে। সেটা আমাদের কাছে আদর্শ সাংবাদিকতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল।

সাংবাদিকতার শিক্ষাক্রম শেষ করার পর যদিও মাত্র কয়েকজনই খবরের কাগজে যোগদান করতে পেরেছিল। অনেকেই চেষ্টা করছিলাম বিভিন্ন খবরের কাগজে বা নিউজ এজেন্সিতে যোগ দেওয়ার। তখন মূলত দীপক, আমি, সুরজিৎ, অরুণ ও অঞ্জন রায় মিলে Youth Press Service (YPS) নামে এক Feature Agency শুরু করেছিলাম। YPS-এর অফিস ছিল মহাত্মা গান্ধী রোডে গ্রেস সিনেমার পাশের বাড়িতে দোতলায়। যেখানে রয়েছে পরিচয় পত্রিকা ও West Bengal & Calcutta University Teacher Association (WBCUTA)-এর দপ্তর। দুর্গম পাহাড়ি পথে Trekking, আদিবাসীদের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও অন্যান্য off Beat বিষয়ে লেখা আমাদের কিছু ফিচার বেশ কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিতও

হয়েছিল। কিন্তু YPS দানা বেঁধে ওঠার আগেই শুরু হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

দীপক তখন অমৃতবাজার পত্রিকার সাব-এডিটর আর সুরজিৎ কলকাতার অন্য ইংরেজি দৈনিক Hindusthan Standard-এ শিক্ষানবিশ সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিল। দীপক থাকত হাওড়ায় রেল কোয়াটার্সে। ওর বাবা ভারতীয় রেলে কাজ করতেন। সুরজিৎ ওর মায়ের সঙ্গে থাকতেন উত্তর কলকাতার বাদুড়বাগান অঞ্চলে। ওর বাবা মারা গেছেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও দুজনেই বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে যুক্ত ছিল, যারা নানারকম Social Work করত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাই আদর্শ সাংবাদিকতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল।

পাকিস্তানি সেনা ও তাদের অনুষঙ্গীদের অত্যাচারে যখন কাতারে কাতারে বাংলাদেশি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলায় আশ্রয় নিচ্ছিল, তখন কয়েকবার দীপক, সুরজিৎ ও আমি সেখানে যাই। তার পরেই ঠিক হয়, পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংস অত্যাচারের খবর ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীনতার জন্য দুঃসাহসিক সংগ্রামের বিবরণ সবাইকে জানাতে হবে।

দীপক ও সুরজিৎ একাত্তরের ২৩ মার্চ বনগাঁও সীমান্ত দিয়ে অধুনা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। মুক্তিযুদ্ধে আন্দোলন ও সীমান্ত দিয়ে লক্ষ শরণার্থীর চলাচলে পাসপোর্ট, ভিসা ছাড়াও সীমান্ত অতিক্রম করা কোনো সমস্যা ছিল না। ওরা বাংলাদেশে ঢোকার পর বিভিন্ন জেলা পার হয়ে রাজধানী ঢাকা পৌঁছায়। এরপর ঢাকা থেকে কুমিল্লা হয়ে আগরতলার সীমান্ত দিয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করে। তখনকার ত্রিপুরার আগরতলায় যুগান্তর প্রতিনিধি অনিল ভট্টাচার্য ও হিন্দুস্থান সমাচারের করেসপনডেন্ট কেশবচন্দ্র সুরের কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। অনিল ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আরও জানা গিয়েছিল যে, আগরতলায় আসার পর ওরা ঢাকা হয়ে কলকাতা ফেরার জন্য আবারও পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে, যখন মুক্তিযুদ্ধ ও সেই সঙ্গে পাকিস্তানি সেনার অত্যাচার আরও তীব্র আকার নেয়।

এর পরই শুরু হয় যুদ্ধ, জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। আমাদের সবার মনে হয়েছিল, যুদ্ধের সময়কার অস্থির পরিস্থিতিতে ওরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের কোথাও রয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। কিন্তু ওদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। নানা রকম অসমর্থিত খবর তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের রাজাকার বাহিনী নাকি দুই ভারতীয় সাংবাদিককে পাকিস্তানি সেনার কাছে ভারতীয় গুপ্তচর বলে ধরিয়ে দেয় এবং পাকিস্তানি সেনারা তাদের হত্যা করে। আবার এই খবরও রটে যে, পাকিস্তানি সেনারা ওদের যুদ্ধবন্দি করে রেখেছে বা যুদ্ধবন্দিদের ছবিতে দীপক, সুরজিতের মতো দুজনকে দেখা গেছে। এসব খবরের কোনো সত্যতা বা সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি।

দীপক-সুরজিৎদের সন্ধান পেতে দীপকের বাবা নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। সঙ্গে ছিলাম আমিও। সেই সময়কার সোশ্যালিস্ট পার্টির এমপি ও সাবেক রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডবতের মাধ্যমেও ভারত সরকারের কাছে ওদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওর বাবা। কিন্তু কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

দীপক আমার সহপাঠী ও আন্তরিক বন্ধু ছাড়াও আরেকটি বিষয়ে আমি ওর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিছুটা ওর অনুপ্রেরণায় সাংবাদিকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার উৎসাহ পাই। সাংবাদিকতা পাঠক্রমের শেষে কিছুদিন যখন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে এদিক-ওদিক কিছু লেখা বেরোচ্ছে; কিন্তু কোনো সংস্থায় সুযোগ পাচ্ছিলাম না, তখন দীপকই ক্রমাগত উৎসাহ দিত। বলত, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, সাফল্য আসবেই। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি আমি ইউএনআইয়ের দিল্লি অফিসে সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করি। পরবর্তী সময়ে ইউএনআইয়ের হয়ে অনেকবারই বাংলাদেশে গিয়েছি। প্রতিবারই ওদের কথা অবধারিতভাবে মনে পড়ে যেত। বিভিন্ন দুর্গম পর্বতাভিযানে বা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে খবর পাঠানোর সময়ও ওদের ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠত।

বয়সে দীপক ছিল আমার প্রায় সমসাময়িক। আর সুরজিৎ কয়েক বছরের ছোট। এখনো মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো কোনো এক সুন্দর সকালে ওরা এসে বলবে, 'আমরা ফিরে এসেছি।'

লেখক: সাংবাদিক, ভারত

সেইসব দিন

জহর সরকার

শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে প্রথম স্মৃতি আমার মর্মমূলে গেঁথে আছে, কারণ সেটা আইনের সঙ্গে আমার প্রথম সংঘর্ষও বটে। মাসটা ছিল জানুয়ারি, ১৯৬৯ সাল। আমার একাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ঠিক এক মাস পরের কথা। আমার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু বলেছিলেন, পাকিস্তানি হাইকমিশনের বাইরে শেখ মুজিবের জেল থেকে মুক্তির দাবিতে আমাদেরকে এক প্রতিবাদ অবস্থানে অবশ্যই শামিল হতে হবে। শশাঙ্কশেখর রায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিষয়ে বুঝিয়ে বলল, এ-ও বলল কীভাবে পাকিস্তান সরকার মুজিবকে দীর্ঘ দুই বছর ধরে কারাবন্দি করে রেখেছে। ২৩ বছরের পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র এবং কাশীপুরের বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান শশাঙ্ক আমাকে মার্কস, হেগেল, গান্ধী, বিবেকানন্দ, নেতাজি এমনকি রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গেও পরিচয় করিয়েছিল। সেই উত্তাল সময়টা ছিল যখন পৃথিবীজোড়া ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ প্যারিস, লন্ডন, বার্লিন থেকে ওহায়ো এবং চীন অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। আমার বয়স তখন ১৭ বছর। আমাদের প্রজন্ম তখন বাম আদর্শ থেকে উৎসারিত শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত ছিল। যদিও আমি, কেন জানি না, বামপন্থার চরম সুরে সুর মেলাতে পারিনি, ওই যে– 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান।'

পার্ক সার্কাস অঞ্চলের একটি বিশেষ স্থানে আমরা মিলিত হলাম, যেখানে মিছিল করে আসা নানা মতাবলম্বী বামপন্থি ছাত্র ও শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। অবিলম্বেই আমরা কিছু চেনা বুদ্ধিজীবীকে দেখতে পেলাম। অবশেষে অন্তত একবার, জীবনে প্রথম নিপীড়িত মানবজাতির সঙ্গে খোলা রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হলাম, যার অনুভূতিটা সত্যিই অসাধারণ ছিল। আমরা প্লাকার্ড হাতে সুশৃঙ্খল সারিতে হাঁটছিলাম; কিন্তু অদূরে পাকিস্তানি অফিসের রাস্তার পুরো ট্রাফিক যাতে গতিরুদ্ধ হয়, সেটা বিশেষভাবে নির্দেশিত ছিল। চারদিকে অজস্র পুলিশ দেখে আমি ঢোক গিললাম; আমায় নিশ্চয়ই ওরা গ্রেফতার করবে। এটা আমার কাছে আশাতীত ছিল এবং আশঙ্কা ছিল, কোনো না কোনো আত্মীয় আমায় দেখে ফেলবে, আমার মা-বাবাকে

জানিয়ে দেবে। কিন্তু আমায় হতাশ হতে হলো, কারণ তেমন উত্তেজক কিছুই ঘটল না। নিষিদ্ধ দরজাগুলোর একশ গজের মধ্যে পুলিশের ব্যারিকেডে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হলাম এবং ওইখানে বসে বসেই গলা ফাটিয়ে উত্তপ্ত স্লোগান দিতে নির্দেশ দেওয়া হলো আমাদের। এরই মধ্যে কিছু রক্তচাপবর্ধক মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল, যখন কয়েকজন অসম সাহসী প্রতিবাদী হঠাৎ করেই লাফ দিয়ে উঠে পুলিশ ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে, কিন্তু হায়! কড়া হাতের ধাক্কায় পিছিয়ে আসতে হয় তাদের, যার সঙ্গে কয়েক ঘা লাঠিও তাদের পিঠে পড়ে। এরপর দুপক্ষ থেকেই গালাগালির বন্যা বয়ে যেতে থাকে আর আমার রক্তচাপ তরতর করে বেড়ে চলে। কিন্তু শশাঙ্ক আমায় শান্ত করে সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে বলে। গাদা গাদা গরম গরম বক্তৃতা শুনতে হলো আর শেষমেশ এক ছোটো আকারের প্রতিনিধিদলকে ভেতরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যারা পাকিস্তানি হাইকমিশনের পদাধিকারীদের হাতে তাদের আবেদনপত্রটি দিয়ে আসবে। এভাবে আইনের সঙ্গে আমার প্রথম সংঘর্ষ শেষ হয় কোনো অ্যাকশন ছাড়াই, শুধু কিছু উত্তেজক বক্তৃতার সম্মুখীন হয়ে নেহাতই জাগতিক এবং অচাঞ্চল্যকরভাবে।

জহর সরকার

মাসদুয়েক বাদে শেখ মুজিবের মুক্তির খবরে আমরা আনন্দিত হই এবং ততদিন পূর্বপাকিস্তান সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠেছিল। তাঁর প্রিয় চট্টগ্রামের ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রগণ্য অবদানের কথা স্মরণ করে গর্বে বুক ফুলে উঠত আমার বাবার। কীভাবে হাজার হাজার কিশোর ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের জীবন দিয়েছে, আর আমি এমন একজন হতভাগ্য যে অন্তত এক ঘণ্টার জন্যও গ্রেফতার হতে পারিনি! কয়েক মাস পর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই। জায়গাটা সেই সময়ে নকশালপন্থিদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। আশা মতোই আমি খুব শীঘ্রই মতবিরোধের কারণে গোলমালে জড়িয়ে পড়লাম, যা উত্তপ্ত বিতর্ক এবং মাঝেমধ্যে হাতাহাতিতেও গড়াত। সেই সংঘর্ষে মুষ্টিমেয় আমরা মাওয়ের সন্তানদের হাতে নির্বিচারে নিষ্পিষ্ট হতাম, যারা আমাদের থেকে ছিল সংখ্যায় অন্তত দশগুণ। তাদের অস্ত্র ছিল আতঙ্ক ছড়ানো, যা গোটা রাজ্যকেই ভীতিগ্রস্ত করেছিল। প্রায়ই স্লোগান, বক্তৃতা আর বোমায় আমাদের ক্লাস ব্যাহত হতো। সাধারণ মানুষ অন্ধকার হওয়ার আগেই বাড়িমুখো ছুটত আর গভীর রাতে গুলির আওয়াজ শোনা যেত প্রায়ই। রেডিও আর খবরের কাগজ রোজই ভর্তি থাকত অসংখ্য মৃত্যুর খবরে; যেমন– নকশালপন্থিরা কীভাবে 'শ্রেণিশত্রুদের খতম' করছে। অবশ্য পুলিশের হৃদয়হীনতার খবরও বাদ যেত না। চরমপন্থিরা পাইপগান আর স্থানীয় কারিগরিতে তৈরি বোমা ব্যবহার করত, মাঝে মাঝে শত্রুর মাথা কেটে নিতেও দ্বিধা করত না। যেমন, কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্তির মাথাও কেটে নেওয়া হয়েছিল। সেসময়ে জীবনটা প্রচণ্ড রুক্ষ, অমসৃণ ওঠাপড়ায় ভরা এবং কলকাতার এই ছাত্রদের কাছে পাকিস্তান বা অন্য কোনো জায়গায় ঘটে যাওয়া উত্তেজক ঘটনাগুলোর খুব একটা গুরুত্ব ছিল না, বরং মাওয়ের 'রেডবুক'-এর ঝলকানিতে সারা কলেজ স্ট্রিটটাকেই পণবন্দি করে রাখত।

১৯৭০-এর আগস্টে যখন আকাশবাণী তরুণ প্রজন্মের জন্য একটা সম্পূর্ণ আলাদা চ্যানেল শুরু করল, যার নাম ছিল 'যুববাণী'। আমরা সবাই প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমি আর আমার বন্ধুরা ময়রা স্ট্রিটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, শুধু আনন্দশঙ্কর আর বাপ্পী লাহিড়িকে দেখতে যাওয়ার জন্যই। খুব শীঘ্রই আমি কলকাতার বিখ্যাত রেডিও স্টেশনের পবিত্র অঙ্গনে পদার্পণ করলাম। আমার এখনো মনে আছে, আমি বাড়িটায় ঢোকামাত্রই এর রাজকীয় আভিজাত্যে কেমন আপ্লুত হয়েছিলাম। বিভাস বোস একজন ইংরেজি রেডিও প্রোগ্রামার, আমার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন (ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন!)। তিনি আমাকে, মানে একজন অখ্যাত রোগা তরুণকে, মানবকণ্ঠের সূক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে পরিচয় করান। তিনি আমায় বাচনভঙ্গি এবং তার নিয়ন্ত্রণ, স্বরের ওঠাপড়া এবং রেডিও সংযোগ মাধ্যমটির খুঁটিনাটি শেখান। আমরা ছাত্ররা ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টুডিও আর টেবিলগুলোর সবুজ আস্তরণের প্রেমে পড়ে যাই। চেনা, অথচ আমাদের স্বপ্নের সেই মাইক্রোফোনগুলো, যার ওপরে জ্বলজ্বল করত– 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' লেখাটা, আমাদের আর কন্ট্রোল প্যানেলের মাঝে থাকা কাচের পার্টিশন আর প্রফেশনাল রেকর্ডিস্টদের বুড়ো আঙুল তুলে নির্দেশ– ঠিক আছে– কী যে ভালো লাগত কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে থাকা কাজে ডুবে থাকা মানুষগুলোকে। প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনত তারা আর ভুল হলেই উত্তেজিত হয়ে অঙ্গভঙ্গি করে উঠত। এখনো গর্ব হয় ভাবলে, প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য ১৫ টাকা করে পেতাম, যার জন্য অজস্র সরকারি নির্দেশিকার পাতায় সই করতে হতো আর আঠা দিয়ে রেভিনিউ স্ট্যাম্প লাগিয়ে সেগুলো আবার কেটে দিতে হতো!

কিন্তু একবার গোলাপি বালিপাথরের তৈরি বাড়িটা থেকে বেরোলেই কলকাতার নগ্ন নকশাল আন্দোলনের ভীতি আমাদের গ্রাস করত। ১৯৭১-এর নির্বাচনের পর পাকিস্তানের উত্তেজক ঘটনাগুলো সত্যিকারের বড়ো খবর ছিল, বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেগুলো নকশাল পুলিশ সংঘর্ষের খবরকেও ম্লান করে দিয়েছিল। আমরা রেডিওতে কান পেতে থাকতাম, খবরের কাগজ থেকেও চোখ সরাতে পারতাম না, কারণ সেই মুহূর্তের রাজনৈতিক নাটক ফেব্রুয়ারি আর মার্চজুড়ে সবাইকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। ঢাকা এবং অন্যত্র ঘটে চলা নৃশংসতা কলকাতাকেও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি করে রেখেছিল। আমাদের আরও রাগিয়ে দিয়ে ২৫ মার্চ এবং তারপরও যত রাজ্যের গুজব ছড়াতে শুরু করল প্রতিদিন। অল ইন্ডিয়া রেডিওই আমাদের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য এবং সাম্প্রতিক খবরের মূল আধার, কারণ প্রজন্মের কাছে পরের দিন সকালের খবরের কাগজের অপেক্ষায় থাকাটা অসহনীয় ছিল। অবশ্য সকালের কাগজগুলো আমাদের উর্ধ্বতনদের একচেটিয়া অধিকারেই থাকত, বাস্তবিকই যারা আমাদের চেয়ে বেশি শঙ্কিত ছিল মিলিটারি আক্রমণের আশঙ্কায়। এই সময়ে, সীমান্তের ওপারে ঘটা ঘটনাগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রজন্মের একটা আবেগের সম্পর্ক তৈরি হয়। 'ওপারের' পীড়িত বাঙালিদের সঙ্গে বাঁধন এতটাই দৃঢ় ছিল যে, শ্বেত-সন্ত্রাসের গল্প বুকে নিয়ে সীমানা পেরিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের অনর্গল স্রোত নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। বোধহয় সম্পূর্ণভাবে এটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল। আমি অবশ্য অন্যদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে ছিলাম। কারণ আমি এর পটভূমিকা নিয়ে আমার চেয়েও কম জানা বন্ধুদের ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জয় বাংলা সৈনিকেরা সেই পীড়িত ভূমিতে আবির্ভূত হয় এবং দখলকারী সৈন্যদের মোকাবিলা শুরু করে, তাদের খাদ্যভাণ্ডার আর সেতু উড়িয়ে দিয়ে। নতুন 'বাংলাদেশ সরকার'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও নিজেদের মিলিটারি শক্তি নিয়ে ওদের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে রাজি না হওয়ার ঘটনা ছাত্রদের এবং বাংলার মানুষকে ক্রোধিত করে তোলে। আমরাও ধৈর্যহারা হই। মনে হতো নিষ্পাপ মানুষ, যারা নিজেদের সংস্কৃতি এবং তাদের অধিকার রক্ষার্থে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে সারা দুনিয়ার মানুষ জেগে উঠতে এত সময় নিচ্ছে কেন? সিনেটর টেড কেনেডির কথা আমার মনে পড়ে, যিনি উদ্বাস্তু এবং উভয় রাষ্ট্রকে তাঁর সমর্থন জানান। ততদিনে আমি বেশ পটু হয়ে উঠেছি এবং আমার বন্ধুদের 'জয় বাংলা বাহিনী'র বহু ছাত্রনেতার নামের সঙ্গে পরিচয় করাতে পারছি। নতুন এই আন্দোলনের ওই নামই আমরা দিয়েছিলাম। আমি পড়াশোনা করে জেনেছিলাম, তাই শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাখনের ভূমিকার বিশ্লেষণ করতে পারতাম, যদিও আমার বিশ্লেষণ হয়তো নির্ভুল ছিল না।

এই উত্তেজনায় অনেকে খোলাখুলি আলোচনা করত এবং সত্যি বলতে কী পশ্চিম বাংলার বহু তরুণকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করেছিল কারণ আমাদের নিপীড়িত ভাই, অত্যাচারিত বোনদের জন্য তাদের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। কে কী করেছিল– এই স্বল্প পরিসরে বলা যাবে না। আমি আমার নিজের পথ খুঁজছিলাম এবং তখনই একজন নেতৃস্থানীয় মানুষ আমায়

রাজ্যজুড়ে গজিয়ে ওঠা জয় বাংলার অনেক বিভাগের মধ্যে একটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি কলেজের পর কিছুদিন সেখানে কাজ শুরু করলাম, সেটা ছিল বালু হক লেনে, সার্কাস এভিনিউর পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশন, যেখানে আমরা ১৯৬৯ সালে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম, তার বেশ কাছে। ১৯৭১ সালে জায়গাটাকে পুরোপুরি একটা দুর্গের মতো আমেরিকান দূতাবাসের থেকেও বেশি সুরক্ষিত করে ফেলা হয়েছিল। আমরা অবাক হয়ে কিছুদিন পরে শুনলাম, পাকিস্তানি অফিসের বাঙালি কর্মীরা বিদ্রোহ করেছে এবং সেখানে টাঙানো পাকিস্তানি পতাকা নিচে নামিয়ে দিয়েছে। আমরা উৎসুক হয়ে দেখতে গেলাম আর নতুন গড়ে উঠতে চলা বাংলাদেশের সবুজ-লাল পতাকা বাড়িটার মাথায় উড়তে দেখে আনন্দাশ্রু ধরে রাখতে পারিনি। অত্যন্ত আবেগতাড়িত একটা মুহূর্ত ছিল সেটা। 'জয় বাংলা' অফিসে আমার কাজ ছিল বিভিন্ন 'রিলিজ'-এর অনুবাদ করা, বাংলা থেকে ইংরেজিতে। এছাড়া নতুন নতুন স্বাধীনতাযোদ্ধার দল, যারা যুদ্ধবিধ্বস্ত ওপার বাংলা থেকে আসছে, তাদের কলকাতা শহরের সঙ্গে সুপরিচিত করানো। অমন অনেক মানুষের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়েছিল, আর তাদের কাছ থেকে আমি বহু হৃদয়বিদারক দুঃখের ঘটনা শুনেছিলাম। কখনো সখনো বলিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকরা গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের চিনিয়ে দিতেন এবং আমি তেমন কয়েকজনের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। যেমন– আবদুল মান্নান, যিনি পরে স্বাধীন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। আরও অনেকে, যাদের সবার নাম আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। যৎসামান্যভাবে হলেও 'স্বাধীনতা আন্দোলন'-এর অংশীদার হতে পারার অনুভূতিটাই আলাদা!

ক্রমেই ভারতে আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছিল এবং আমাদের সেনাদলের সীমান্তের ওপারের বিষয়গুলোয় হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না, সে বিষয়ে কফি হাউসে আমাদের মধ্যে প্রতিদিনই গরম গরম তর্কবিতর্ক হতো। আকাশবাণীতে ততদিনে ওখানে আমি পরিচিত মুখ, সেখানে জানতে পারলাম যে ওদের খোলাখুলি সমর্থনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু বিধিনিষেধ আছে। একদিন আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম তৎকালীন রেডিও স্টেশনের অধিকর্তা দিলীপ সেনগুপ্ত এবং বিভাস বোসের কথায়। দিলীপবাবু স্পষ্টবাদী এবং অনলস কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যিনি পীড়িত দেশটির প্রতি তাঁর তীব্র সহানুভূতি লুকিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি 'যুববাণী'তে অনেক সাহসী অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমতি দেন, যেগুলো কলকাতার 'ক' চ্যানেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সংযত নির্দেশের আওতায় পড়ে না। তিনি আমার কাছে সোজাসুজি জানতে চান, যেসব বাংলাদেশি ছাত্রনেতা কলকাতায় পালিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে কারও কারওকে যুববাণীতে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারব কি না। এ কাজের জন্য আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, কেননা আমি ইংরেজিতে অনুষ্ঠান করতে সাবলীল ছিলাম। কথোপকথনটি সাধারণ বাংলায় না করে ইংরেজিতেই রেকর্ড করানোর আরও একটি কারণ ছিল যে, অনুষ্ঠানটি অন্যান্য মূল ভাষার চ্যানেলে যেমন– আকাশবাণী দিল্লি ইত্যাদিতে সম্প্রচার করা সম্ভব হবে।

এ সুযোগ কোনোমতেই হাতছাড়া করা যাবে না, এই ভেবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি শাজাহান সিরাজকে খুঁজে বের করে তাকে টেনে আনলাম আকাশবাণীতে। সঙ্গে আরেকজন দ্বিতীয় সারির নেতা। তিনি নিম্মি চৌধুরী, বাংলাদেশের একজন স্মার্ট, নতুন ঝকঝকে তরুণী। আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধের সব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে খোলাখুলিভাবে এবং পরিষ্কারভাবে আলোচনা করলাম। কথায় কথায় জানা গেল নিম্মি একজন বাঙালি কূটনীতিক, আইআর চৌধুরীর কন্যা। ও আমাদের আইসক্রিম খাওয়াল আর ওর বাবার বিশাল গাড়িতে চড়িয়ে বাড়ির পথে এগিয়ে দিল। আমরা ফোন নম্বর বিনিময় করলাম। আরেকদিন ওর ভাবী স্বামী, লম্বা, শ্যামবর্ণ, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হলো, যাঁর সম্পর্কে শুনলাম তিনি নাকি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন আর শীঘ্রই 'জয় বাংলা' বাহিনীতে যোগ দেবেন। আমার এইটুকু মনে আছে, মানুষটির সঙ্গে এক শক্তিশালী করমর্দনের সময় তার সবল হাতের চাপে আমার হাত ভেঙে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। অল্প কথাই হয়েছিল আমাদের, এর মধ্যেই বুঝেছিলাম এই ক্যাপ্টেন ডালিম মানুষটি খুব একটা আন্তরিক নন।

পরের কয়েক মাস ১৩ দিনব্যাপী যুদ্ধের দিন-রাতের খবরের জন্য রেডিওতে কান পেতে থাকতাম আমরা। ১৬ ডিসেম্বর, পাকিস্তানি সেনা যখন ঢাকায় আত্মসমর্পণ করল, সত্যিই সে দিনটা ছিল আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। কলকাতার আকাশে-বাতাসে তখন 'জয় বাংলা' আর 'জয় হিন্দ' ভেসে বেড়াচ্ছে, দোকানদাররা পথচলতি মানুষকে বিনে পয়সায় চা, টোস্ট, আলুর চপ, বিস্কুট আর মিষ্টি বিলাচ্ছে। নতুন জন্মানো দেশের অভূতপূর্ব আনন্দ-উদ্দীপনা দুদেশই সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে। কিন্তু জীবন থেমে থাকে না।

আমার মনে পড়ে ইতিহাসের বহু অতিকায় সব ঘটনা, যেমন শেখ মুজিব আর ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এক বিশাল জনসমুদ্রে ভরা ব্রিগেড গ্রাউন্ডে বক্তব্য রাখছেন ইত্যাদি। খুব শীঘ্রই আমায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো স্নাতকস্তরের পরীক্ষা নিয়ে, যা রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল। আমি ভালোভাবেই পাস করলাম; কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ে আমার বিলম্বিত স্নাতকোত্তর ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমি ইন্ডিয়ান 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস'-এর পরীক্ষায় বসলাম, শুধু একটা, যাকে বলে 'ওয়াইল্ড ট্রাই' হিসেবে। ভাগ্য এবং ঈশ্বর দুজনেই আমার ওপর অত্যন্ত সদয় ছিলেন, হয়তো তাই আমি প্রথম চেষ্টাতেই 'আইএএস' এবং 'আইএফএস' দুটো পরীক্ষার মেধাতালিকাতেই বেশ উঁচুতেই স্থান পেলাম। সরকারি প্রশিক্ষণের জন্য আমায় ১৯৭৫ সালের ১৩ জুলাই মুসৌরি যেতে হলো।

এ সুযোগ কোনোমতেই হাতছাড়া করা যাবে না, এই ভেবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি শাজাহান সিরাজকে খুঁজে বের করে তাকে টেনে আনলাম আকাশবাণীতে

বলতে ভুলে গেছি, আমার সব বাংলাদেশি বন্ধুর কাছ থেকে প্রায়ই আমি চিঠি পেতাম। মনে পড়ে, এইরকম একটা চিঠি একদিন নিম্মি চৌধুরীর কাছ থেকে এলো, ভাষা ছিল গর্বিত। সে আমাকে মেজর ডালিমের সঙ্গে তার বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছে। পরে শুনেছিলাম, সে বিয়ের সময় মেজর এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নাকি কীসব গোলমাল হয়েছিল। আমি আইএএস পরীক্ষা এবং এমএ ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেসব ভালো করে জানতে পারিনি। মুসৌরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একদিন স্তম্ভিত হয়ে আমরা শুনলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন ঠাণ্ডামাথায় আক্রমণ করা আততায়ীদের হাতে। আমাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, তাঁর সম্পূর্ণ পরিবার নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে মুষ্টিমেয় ষড়যন্ত্রকারী সেনা অফিসারের হাতে। পাহাড়ি বাতাসে আরও কত খবর ছড়াল, আর আমরা জানলাম, সেই হত্যাকারী, ষড়যন্ত্রকারী সেনাদলে অধিনায়ক ছিলেন আর কেউ নয়, সেই ডালিম, মেজর ডালিম! (হা ঈশ্বর!)

লেখক: সাবেক সিইও, ইন্ডিয়াস ন্যাশনাল পাবলিক ব্রডকাস্টার, প্রসার ভারতী (অল ইন্ডিয়া ও দূরদর্শন)

মুহিত পাল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

আইয়ুব রানা

একাত্তরের ২৫ মার্চ ঢাকা শহরে গণহত্যা চালানোর পর ২৬ থেকে ২৮ মার্চ মৌলভীবাজার জেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ তীব্র করে। এ অঞ্চলের আতঙ্কিত মানুষজন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে ছুটতে থাকেন। মৌলভীবাজারের আওয়ামী লীগ নেতা মীর্জা আজিজ আহমেদ বেগ একদল মুক্তিকামী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাসহরের সীমান্ত চেকপোস্ট চাতলাপুর স্থলবন্দরের দিকে এগোতে থাকেন। এই স্থলবন্দর এলাকার চেকপোস্টে তখন দুটি টিনের ছাউনি দেওয়া এবং টিনের বেড়া দেওয়া অফিস ঘর ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে বেগ সাহেব একটি পোর্টেবল মাইক দিয়ে ভারতের দিকে মুখ করে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের কথা বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, 'ওপারে কেউ কি নেই আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করে।' সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় অংশের রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনের মাঠে দাঁড়িয়ে এসব পর্যবেক্ষণ করছিল কৈলাসহর ছাত্র আন্দোলনের এক সৈনিক ২২ বছরের টগবগে যুবক। সে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি আছি।' বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতেই বেগ সাহেব বুকে জড়িয়ে ধরলেন সেই যুবককে। সেই সঙ্গে হাতের পোর্টেবল মাইকটি তুলে দিলেন সেই যুবকের হাতে। যুবকটি তখন মাইকে নিজের সমর্থন জানিয়ে সবাইকে আহ্বান জানালেন এপারে (ভারতের দিকে) নিরাপদ আশ্রয়ে আসার জন্য। আজিজ বেগ সাহেব কাঁধের ব্যাগটি থেকে একটি লাল-সবুজ পতাকা খুলে বললেন, এটি এই চেকপোস্টে ওঠাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা লাগানো হলো। উপস্থিত ইপিআরের একজন অফিসার তখন বলছিলেন, পাকিস্তানি সেনারা এখানে এসে দেখতে পেলে কী হবে? ওপারের সেই যুবক তখন অভয় দিয়ে বলেছিলেন, 'অসুবিধা হলে আপনি কৈলাসহরে চলে আসবেন।' দেখতে দেখতে অনেক যুবক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে এসেছে ত্রিপুরা রাজ্যের এই সীমান্ত শহরটিতে। কুলাউড়া থানাধীন সৈদলবাজার এলাকার আবদুল গফুর এসেছে বেশ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে। গফুর খুব সাহসী ছেলে। দেখতে দেখতে ওই ভারতীয় যুবক এবং গফুরের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এবার যুবকটির

নাম জানা গেল– মোহিত পাল, কৈলাসহরে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছেন। আদিবাড়ি পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জে। কৈলাসহরের বেসরকারি কলেজ রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। ত্রিপুরার বামপন্থি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মোহিত এবং আজিজ বেগ তখন পরিকল্পনা করলেন কী করে এই চেকপোস্টে ওড়ানো স্বাধীন বাংলার পতাকাকে রক্ষা করা যায়। মোহিত বেগ সাহেবকে নিয়ে গেলেন কৈলাসহর মহকুমা শাসকের কাছে। মহকুমা শাসক ছিলেন একজন অবাঙালি অফিসার, নাম গঙ্গাদাস। খুব ভালো লোক ছিলেন। তিনি বললেন, এখনো সরকারি কোনো নির্দেশ আসেনি শরণার্থীদের বিষয়ে, তবে যারা আসে সবার তালিকা তৈরি করে রাখবেন। মহকুমা শাসক গঙ্গাদাসের সঙ্গে মোহিত পালের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি পরামর্শ দিলেন, ভারতে একটি সংগ্রাম সমর্থক বাহিনী নাম দিয়ে সংগঠন তৈরি করে কাজ করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ অনুযায়ী সংগ্রাম সমর্থক বাহিনীর নামে একটি রাবার স্ট্যাম্প তৈরি করে তালিকার কাজ শুরু হলো। কৈলাসহর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ছিলেন পরাগ দত্ত। তিনিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। প্রথমে বেসরকারিভাবে যারা আসছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। সেই সঙ্গে মুক্তিবাহিনী গড়ার প্রস্তাব আসতেই বেগ সাহেব এবং মুহিত, গফুর– তাঁরা মিলে তালিকা তৈরি শুরু করলেন। কয়েকটি রাইফেলও জোগাড় হলো। চাতলাপুর চেকপোস্টটি অস্থায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যালয় করা হলো। মুহিত তখন এসডিও গঙ্গাদাস মহোদয়ের পরামর্শে সংগ্রাম সমর্থক বাহিনী তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা এবং যারা ভারতে প্রবেশ করছেন, তাদের তালিকা তৈরি করতে সহায়তা করলেন। শরণার্থীরা যে যার মতো থাকার ব্যবস্থা করে ফেলছে। মুক্তিবাহিনী হিসেবে যাদের তালিকা করা হয়েছে, তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হতো। সবার খাওয়ার জন্য বাংলাদেশের ভেতর থেকেই অনেক সবজি আনা হতো। আর এসব কাজ মুহিত-গফুর ওরাই করতেন। কাটারকোনা থেকে নৌকাযোগে প্রায় একশ বস্তা চালও নিয়ে এলো যুবকরা। দেখতে দেখতে দুদিন পার হয়ে গেল। সীমান্তে প্রতিদিনই ভিড় লেগেই আছে। ইতোমধ্যে ভারত সরকারের পক্ষে ত্রিপুরার প্রতিটি থানায় তারবার্তা এলো শরণার্থীদের সহায়তা করার জন্য। একাত্তরে ত্রিপুরা ছিল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, তাই সরাসরি কেন্দ্র থেকে নির্দেশ আসত। শুরু হলো সীমান্ত এলাকাগুলোয় শরণার্থী ক্যাম্প তৈরির। শরণার্থীদের জন্য রেশনকার্ড তৈরি হলো। ভারত সরকার তাদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নিল। কলেজের ছাত্র যারা এনসিসি করত, তাদের মধ্য থেকে শরণার্থী ক্যাম্পে কাজ করার জন্য অস্থায়ীভাবে কর্মী নিয়োগ করা হলো। এরপর শরণার্থীদের পুরো ভার নিল ভারত সরকার। যাদের আত্মীয়স্বজন আছে, তারা শরণার্থী ক্যাম্পে গেলেন না। আবার যাদের নিজস্ব অর্থের অভাব ছিল না, তারা ঘর ভাড়া করে থাকার ব্যবস্থা করলেন। এমন সময় সংবাদ এলো পাকিস্তান বাহিনী শমসেরনগর আক্রমণ করতে পারে। যেসব যুবক মুক্তিবাহিনী হিসেবে কাজ করতে চান, তাঁদের নিয়েই একটা প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেওয়া হলো। স্থানীয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষও সজাগ যাতে মনু নদী পার হয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা চাতলাপুর না আসতে পারে। হঠাৎ দেখা গেল, পশ্চিমদিকে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলো ঘুরতে শুরু করছে। একটু পরেই সংবাদ পাওয়া গেল, মৌলভীবাজারে পাকিস্তান বাহিনী শেলিং শুরু করছে। বেশকিছু হতাহতের সংবাদও পাওয়া গেল। মুহিত, গফুরসহ এক বিরাট বাহিনী শরণার্থীদের নিরাপদে ভারতে প্রবেশের সব ব্যবস্থা করলেন। ভারতে যেসব যুবক মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তাদের সঙ্গে যোগ দিল কিছু ইপিআর।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানি সেনারা শমসেরনগর বিমানঘাঁটি দখল করতে আসে ২৭ মার্চ। আগে থেকেই ইপিআর থেকে এক কোম্পানি জওয়ান যারা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করতে আসে, তাদের নিয়ে স্থানীয় সাধারণ মানুষ এবং ভারতে সংগঠিত যুবকরা মিলে এক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সুবেদার সামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে ইপিআরের সদস্যরা সেদিন প্রতিরোধে মুখ্য ভূমিকা নেন। সেদিন শমসেরনগরে ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা, এক কোম্পানি ইপিআর ও দুই শতাধিক জনতা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এটাই ছিল সিলেটের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। সন্ধ্যায় আবার চাতলাপুর চেকপোস্টের অস্থায়ী ক্যাম্পে বৈঠক বসে মুক্তিবাহিনীতে যারা নাম লিখিয়েছে তাঁদের নিয়ে। সেখানে ছিলেন আজিজ বেগ, সেই ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধা মুহিত। গফুরও ছিলেন। পরদিন ২৮ মার্চ আবার শমসেরনগর বাজারে আক্রমণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এর মধ্যে শমসেরনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোজাফ্ফর আহমেদ, সাজ্জাদুর রহমান, আমজাদ আলী প্রমুখ এক গোপন সভা করে সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর সব ইপিআর সদস্যকে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। ভোরের আলো ফোটার আগেই হাজার হাজার জনতা শমসেরনগর বাজারে জড়ো হতে থাকেন। এমন সময় মৌলভীবাজারের দিক থেকে ৩টি সামরিক গাড়ি করে পাকিস্তানি সেনারা আসে। শমসেরনগর রেল স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়ির পরিত্যক্ত কামরা থেকে পাকিস্তানি সেনারা জনতার দিকে গুলি ছুড়তে শুরু করে। মুহূর্তে এক পাকিস্তানি সেনা লুটিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে আরও একজন আহত হয়ে কাতরাতে থাকে। চারদিক থেকে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হাজার হাজার জনতা চিৎকার করে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা শমসেরনগর বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায়; কিন্তু বিমানঘাঁটি দখল করতে পারেনি। কারণ ওই বিমানঘাঁটিকে বিমান ওঠানামার অনুপযোগী করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে। ইতোমধ্যে পৃথিমপাশা থেকে রাজা সাহেব (নবাব আলী সফদর খান) কৈলাসহরে এসে দলবল নিয়ে ক্যাম্প করেন। সঙ্গে ছিলেন কর্নেল রব, মেজর দত্ত প্রমুখ। কৈলাসহর থেকে বেশকিছু বিএসএফ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় সেখানে গেলেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। মুক্তিযোদ্ধারা সাময়িক কৌশল হিসেবে শেরপুর থেকে পিছু হটে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসেন মৌলভীবাজারে। মৌলভীবাজারে সেদিন মুহিত, আজিজ বেগ এবং অন্য ছাত্রনেতারা কৈলাসহর থেকে বেশকিছু শুকনো খাবার এবং ওষুধপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। কমান্ডেন্ট মানিক চৌধুরীর সঙ্গে সেই ভারতীয় যুবক মুহিতের দেখা শেরপুর থেকে ফিরে আসার পথে মৌলভীবাজারে। কমান্ডেন্ট মানিক চৌধুরী মুহিতকে আগে থেকেই চিনতেন। তাই মুহিতের সঙ্গে পরামর্শ করে মানিক চৌধুরী ঠিক করলেন কৈলাসহরেই আশ্রয় নেবেন। কৈলাসহরে একই রাতে গিয়ে আত্মগোপন করেন এমএনএ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, মৌলভীবাজারের সেই সময়ের প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার সোলেমান হুসেন প্রমুখ। জেল থেকে বেরিয়ে আসেন এমপি আজিজুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলী (পরবর্তীকালে মন্ত্রী), মুছব্বির আলী (পরবর্তীকালে উপজেলা চেয়ারম্যান), মুজিবর রহমান মুজিবসহ (তৎকালীন ছাত্রনেতা) অনেক নেতাই এসে আশ্রয় নেন। ততদিন ভারতের সরকারি সহায়তাও পুরোদমে পেতে শুরু করেছে মুক্তিবাহিনী। প্রতিদিনই মুক্তিবাহিনীতে নতুন নতুন লোক নাম লেখাতে শুরু করেন। ভারতে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে সেই নির্ভীক যুবক গফুর প্রাথমিকভাবে সংগঠিত হওয়া মুক্তিবাহিনী নিয়ে বহু আক্রমণ সংঘটিত করে। আলীনগর ইপিআর ক্যাম্প দখল করে সেখানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঙ্গী ছিল ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধা মুহিত। গফুরের এই আক্রমণের সংবাদ পাকিস্তানি সেনাদের কাছেও ছিল। তাই একদিন গফুরের বাবা, চাচাসহ একই বাড়ির চারজনকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সেনারা। তাদের বেয়নেট দিয়ে আহত করে জ্যান্ত কবর দেয় পৃথিমপাশা বৃন্দাদিঘির পাড়ে। এরপর গফুর তার মাকে বাড়ি থেকে এক গভীর রাতে মুহিতকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসহর নিয়ে যায়। যাওয়ার পথে রাজাকার বাহিনী আক্রমণ করলে কৌশলে দুই বন্ধু রাজাকার বাহিনীর সব সদস্যকে খতম করতে সক্ষম হন। নিদর্শন হিসেবে রাজাকারদের একটি করে কান কেটে

> সেখানে দাঁড়িয়ে বেগ সাহেব একটি পোর্টেবল মাইক দিয়ে ভারতের দিকে মুখ করে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের কথা বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, 'ওপারে কেউ কি নেই আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করে'

নিয়ে যায় ওরা। এই 'কান কাটার বাহিনী' সীমান্ত এলাকার মানুষের মুখে মুখে রূপকথার কাহিনির মতো ছিল সেই সময়। মিত্রবাহিনীর সহায়তায় কীভাবে পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করাতে বাধ্য করা হয়, সেই ইতিহাস সবারই জানা। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরের আগেই ৮ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার মুক্ত হয়। সেদিন মৌলভীবাজার থানা অফিসের দায়িত্বে থাকা মীর্জা আজিজ বেগ ভারতে পরিচয় হওয়া সেই ছাত্রনেতা মুক্তিযোদ্ধা মুহিতকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন– যাদের সম্পদ লুট হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে রাজাকাররা, সেই বিষয়ে তালিকা তৈরি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কয়েকদিন পর সেই ভারতীয় ছাত্র আবার ভারতে চলে যান পড়াশোনা শেষ করে এদেশে পিতৃপুরুষের ভিটেতে ফিরবেন বলে। কমান্ডেন্ট মানিক চৌধুরী বহুবার মুহিতকে হবিগঞ্জে এসে বিশেষ দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু মুহিতের আর আসা হলো না, ভারতেই কাজে যোগ দিলেন সাংবাদিকতায়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণায়ও ব্যস্ত। তার লেখা বইও প্রকাশ হয়েছে ২০০৯ সালে– 'মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর সিলেট পশ্চাৎভূমি কৈলাসহর'। প্রয়াত মন্ত্রী মহসিন আলীসহ আওয়ামী লীগের অনেক সাবেক নেতার কাছের মানুষ তিনি এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তিনি খুবই প্রিয়জন। তাছাড়া মৌলভীবাজারের লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকদের কাছেও তিনি খুবই পরিচিত ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে 'ভারত-বাংলা মৈত্রী উৎসব'-এর আহ্বায়ক। ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলায় বসবাস করছেন। বিশ্বের প্রথম বাঙালি ও পর্যটক হবিগঞ্জের রামনাথ বিশ্বাসের নামে যে ফাউন্ডেশন আছে, সেই 'রামনাথ বিশ্বাস ফাউন্ডেশন'-এর একজন সম্মানিত সদস্য। ঊনকোটি জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মুহিত। ক'বছর আগে শিলচরে সাপ্তাহিক 'বরাক-কণ্ঠ' আয়োজিত ভারত-বাংলা সাংস্কৃতিক উৎসবে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। সেখানেই আমার সঙ্গে পরিচয়। সেদিন চাতলাপুর চেকপোস্টের টিনের ঘরটি দেখিয়ে বললেন, এই জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এটি তীর্থস্থান। এই ঘরটিতে বসেই বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চাতলাপুর চেকপোস্টের সামনেই ভারতীয় অংশে রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনের খেলার মাঠ। এই মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের আর্টিলারি বাহিনী দুটি কামান নিয়ে প্রস্তুত ছিল। এখান থেকেই শমসেরনগরে কামানের গোলা ছুড়ে কাভারিং ফায়ার করা হতো। এই চাতলাপুর চেকপোস্টের সামনে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের যে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল, সেদিন থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালীন এই পতাকার গায়ে হাত দেওয়ার সাহস হয়নি। চাতলাপুর স্থলবন্দরসহ গোটা মনু নদীর পশ্চিম দিকের পুরো মৌজা এলাকা ছিল শুরু থেকেই একাত্তরের অন্যতম 'মুক্তাঞ্চল'। স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান।

লেখক: সাংবাদিক

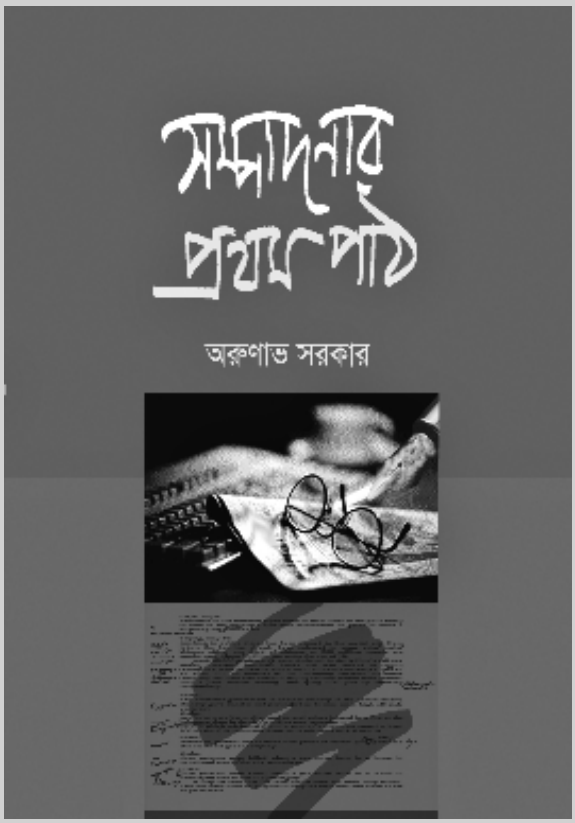

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

যুদ্ধদিনে অবরুদ্ধ সংবাদপত্র

ড. কামরুল হক

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বর গণহত্যা চালানোর পর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে থাকে। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সারা দেশ। অবরুদ্ধ নগরীতে পরিণত হয় ঢাকা। একই সঙ্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রও।

পেছনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে বাহন হিসেবে কাজ করেছে সংবাদপত্র। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' মোকাবিলা করা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ– প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম পরিণতি লাভ করেছে সংবাদপত্রকে ভর করে। তাই বাঙালির ওপর শোষণ-নিপীড়ন চালানোর ক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে বড়ো বাধা মনে করত পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা।

পাকিস্তানি শাসনের ২৩ বছরের বিভিন্ন কালপর্বে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা যেমন বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের রাজনীতি কঠোর হাতে দমন করতে চেয়েছে, তেমনি সংবাদপত্রেরও কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের রেজুলেশন নং ৪ ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্রের ওপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। বলা হয়, এ আইন অমান্য করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এজন্য ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হবে। ২৪নং রেজুলেশনের ঘোষণায় বলা হয়, কোনো লেখনীর সাহায্যে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলে তা সামরিক আইনে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হবে। ১৯৫৯ সালে সরকার এই মর্মে একটি অধ্যাদেশ জারি করে যে, যেসব সংবাদপত্র সরকারের দৃষ্টিতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র কিংবা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর সংবাদ-প্রতিবেদন পরিবেশন করবে, সেসব সংবাদপত্রের মালিকানা সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করবে। সংবাদপত্রের ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য ১৯৬০ সালে 'প্রেস

অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৬০' জারি করা হয়। সরকার এ অধ্যাদেশবলে সন্দেহযোগ্য যে কোনো প্রেস মালিক ও প্রকাশকের কাছ থেকে আইনানুগভাবে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা অর্থ দাবি এবং তা আদায় করতে পারত। ১৯৬০ সালের অর্ডিন্যান্সকে আরও কঠোর করে ১৯৬৩ সালে সরকার 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ' জারি করে। এ নতুন অধ্যাদেশবলে সরকারি প্রেস নোট এবং তথ্যবিবরণী সম্পূর্ণ মুদ্রণের জন্য সংবাদপত্রের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এছাড়া দেশরক্ষা আইনের ৫২(২) (খ) ধারা সংবাদপত্র দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ১১০নং সামরিক বিধি জারি করে। এই সামরিক বিধিতে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, উপরিউক্ত বিধিনিষেধ, কালাকানুন সবই একপর্যায়ে এসে এদেশের সাংবাদিকরা ভঙ্গ করেছেন। (সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, ২০১৬: ১৭-১৮)

২৩ বছরে নানা কালো আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। হয়তো তাই এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চালানোর পরপরই। গণহত্যার সঙ্গে সঙ্গে হানাদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলো। ২৫ মার্চ রাতেই কামানের গোলায় ধ্বংস করে দেওয়া হয় 'দ্য পিপল' ও 'গণবাণী' পত্রিকার অফিস। সামরিক বাহিনীর গোলার আঘাতে

২৩ বছরে নানা কালো আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। হয়তো তাই এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চালানোর পরপরই

ঘটনাস্থলেই নিহত হন দ্য পিপল অফিসে কর্মরত ছয়জন সাংবাদিক। পরদিন ২৬ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী দৈনিক ইত্তেফাকের অফিসে প্রচণ্ড গোলা ছোড়ে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মুখপত্র ইত্তেফাকের অফিসটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ২৮ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর মুখপত্র দৈনিক সংবাদ অফিসও পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পত্রিকা অফিসে কর্মরত সাংবাদিক শহীদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস সংবাদপত্র ছিল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সেই যাত্রা খুবই করুণ, মর্মান্তিক। (জাহান, ২০০৮: ২০২-২০৩)

২৫ মার্চের রাতে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার পর একটানা কারফিউ চলে ২৭ মার্চ সকাল পর্যন্ত। কয়েক ঘণ্টা বিরতি দিয়ে আবার শুরু হয় কারফিউ। বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসে নৈশপালার যেসব সাংবাদিক ২৫ মার্চ রাত থেকে আটকা পড়েছিলেন, ২৭ মার্চ সকালে তারা দ্রুত বাড়ি ফিরে যান। যারা আগেই বাড়িতে ছিলেন, তারা কেউ কেউ খোঁজ নিতে আসেন সংবাদপত্র অফিসের আটকে পড়া সহকর্মীদের।

সেই ভয়াল রাতে মৃত্যুঝুঁকি নিয়েও কিছু সংবাদপত্রে কাজ করেছিলেন সাংবাদিকরা। দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিকরা রাতের পালার কাজ শেষ করেছিলেন। পত্রিকা মুদ্রণও সম্পন্ন হয়েছিল। এমন সময় আচমকা আক্রমণ। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব। পাঠকের হাতে আর পৌঁছল না সেদিনের দৈনিক ইত্তেফাক। ওইদিনের দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান খবরটির শিরোনাম ছিল: 'শেখ মুজিব বলেন: এ গণহত্যা বন্ধ কর: ২৭শে মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে সর্বাত্মক ধর্মঘট'। প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে খবরটি উপস্থাপন করা হয়। চার কলাম শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় অপর একটি খবরের শিরোনাম ছিল: 'এ খেলার পরিণাম ভয়াবহ'।

তবে এক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রম দৈনিক সংগ্রাম। দৈনিক সংগ্রাম ছিল মূলত জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর গোটা দেশ শোকে ও আতঙ্কে স্তব্ধ। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে কোনো সংবাদপত্র বের হতে পারেনি। এমনকি সরকারি সংবাদপত্রও নয়। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার মাঝেও একটি পত্রিকা বের হলো। নাম তার দৈনিক সংগ্রাম। (সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, প্রাগুক্ত, ২০১৬: ২৫)

অন্যদিকে, সংবাদপত্র অফিসে আক্রমণের মাধ্যমেই থেমে যায়নি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের অপতৎপরতা। একই সঙ্গে চলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার প্রক্রিয়া। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ২৬ মার্চেই জারি করা হয় ৭৭ নম্বর সামরিক বিধি। এই বিধির আওতায় যা যা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় তা হলো:

ক. পাকিস্তানের অখণ্ডতা বা সংহতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনা বা সমালোচনার চেষ্টা।
খ. সামরিক শাসন প্রয়োগ এবং তা অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনা বা সমালোচনার চেষ্টা।
গ. জনমনে আতঙ্ক বা হতাশা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচারণা।
ঘ. সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, সরকার অথবা তার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা।
ঙ. পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কিংবা কোনো অঞ্চলের বিরুদ্ধে অথবা পাকিস্তানে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা।
চ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম ধর্মের অবমাননার চেষ্টা এবং 'কায়েদে আজমের' প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবমাননার চেষ্টা।

এই একই বিধিতে সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিষয় সংবাদপত্রে মুদ্রণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। এই আদেশ লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারিত হলো সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। (ধর, ১৯৮৫: ১০১-১০২)

সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের জারি করা ৭৭ নম্বর সামরিক বিধিতে আরও বলা হয়: 'কোন ব্যক্তি সংবাদপত্রে বা কাগজে বা অন্য কোন দলিলে এমন কিছু মুদ্রণ বা প্রকাশ করতে পারবে না, যার মধ্যে পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দল কিংবা কোন নেতা অথবা কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা ও ঝোঁক রয়েছে। সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা, ভীতি ও উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন রাজনৈতিক বিষয় প্রকাশ করা যাবে না।' মোদ্দাকথা হলো, সংবাদপত্রের সার্বিক কণ্ঠরোধ। শুধু এই ৭৭ নম্বর সামরিক বিধি নয়, এরপর নাজিল হতে লাগল একের পর এক সামরিক আইনের আদেশ। যেন একটি ভয়াল শ্বাপদ, কোনো কোনো আলোকে আপাতদৃষ্টিতে নির্বিবাদী মোহন্ত বলে মনে হলেও প্রত্যেকটি বিধি ও আদেশ ছিল দেশের জনগণ, সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের বিবেকী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নখরযুক্ত থাবা। (মোরশেদ, ১৯৮৩: ১০)

হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে বর্বর গণহত্যা চালালেও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধও গড়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসজুড়েই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা প্রচার করতে চেয়েছে যে, দেশের কোথাও কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না, সব জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। শুধু দেশে না, বিদেশেও তা প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তারা। এজন্যই তাদের দরকার ছিল সংবাদপত্রের নিয়মিত প্রকাশনা। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় মানুষের একান্ত সঙ্গী সংবাদপত্র। নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, এটি একদিকে যেমন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিদর্শন, অন্যদিকে নিজেদের প্রপাগান্ডা জনসাধারণ এবং বিশ্ববাসীকে পৌঁছে দেওয়ার বাহন।

এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সংবাদপত্র মালিকদের কাছে অলিখিত নির্দেশ পাঠাল যে, অবিলম্বে সংবাদপত্র আবার

প্রকাশ করতে হবে। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী ২৯ মার্চ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করল প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার ও দৈনিক পূর্বদেশ। প্রেস ট্রাস্টের অপর পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তানের প্রকাশনা শুরু করে ৩০ মার্চ থেকে। আর ২১ মে থেকে দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশনা শুরু করে।

'সংবাদ' ছাড়া ঢাকার প্রধান দৈনিকগুলো প্রকাশনা শুরু করল। অবরুদ্ধ হলেও শুরুতে সাংবাদিকরা সামরিক বিধিকে পাশ কাটিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কিছু তথ্য প্রকাশের প্রচেষ্টা নেন। কিন্তু বিষয়টি পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের নজরে এসে যায়। এরপর তারা আর বাঙালি সাংবাদিকদের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। তাই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নিজেদের মতো করে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রগুলোকে পুরোপুরি সেন্সরশিপের আওতায় নিয়ে আসে।

৭৭নং সামরিক বিধির কার্যকারিতার ওপর দৃষ্টি রাখার জন্য ঢাকায় স্থাপন করা হলো সেন্সরশিপ হাউস। সব খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ ছাপানোর আগে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হতো সেন্সরশিপ হাউসে। এই সেন্সরশিপ হাউসটি ছিল কেন্দ্রীয় তথ্য দফতরের অধীন। ঢাকায় তখন দুটি তথ্য দফতর ছিল– একটি কেন্দ্রীয় সরকারের, অপরটি প্রাদেশিক সরকারের। কিন্তু গণমাধ্যমগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রে এই দুটি তথ্য দফতরের চেয়েও বেশি কর্তৃত্ব ছিল ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স (আইএসপিআর) বিভাগের। এর দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেজর সিদ্দিক সালিক। একাত্তরের ভয়ংকর সেই দিনগুলোয় মেজর সালিক ছিলেন সংবাদপত্র অফিসের আতঙ্ক। শুধু সংবাদপত্র অফিসের ওপরই নয়, সেন্সরশিপ হাউসের ওপরও ছিল তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই সেন্সরশিপ হাউসে যেতেন মেজর সালিক। বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়গুলো কখনো কখনো তাকে অনুবাদ করে শোনাতে হতো। এতকিছুর ফাঁক গলে খুব প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে যায় এমন বিষয় সংবাদপত্রে মুদ্রিত হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। সংবাদপত্র অঙ্গনে বহুকথিত 'লাস্ট চেকপোস্ট' তখন কার্যত স্থানান্তরিত হয়েছিল সেন্সরশিপ হাউসে। কোনো স্টাফ রিপোর্টারের প্রতিবেদন ছাপানো হয়নি পত্রিকায় মাসখানেক। সংবাদপত্রের পাতাজুড়ে তখন শুধু এপিপির সংবাদ। প্রি-সেন্সরশিপ তো ছিলই, তা সত্ত্বেও সংবাদপত্র অফিসগুলোয় মাঝেমধ্যেই পাঠানো হতো প্রেস অ্যাডভাইস। (ধর, প্রাগুক্ত, ১৯৮৫: ১০১-১০২)

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো, এর কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে।

জীবনযাত্রা স্বাভাবিক

সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে সবসময় প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যে, দেশে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে না। সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। দেশের মানুষ খুবই শান্তিতে দৈনন্দিন জীবনযাপন করছে। তবে এসব উদ্দেশ্যমূলক খবরের মধ্যে একটি বার্তা পাওয়া যায়। তা হলো, দেশে ভীষণ রকম অস্বাভাবিক একটি অবস্থা বিরাজ করছে বলেই প্রচার করতে হচ্ছে যে, সবকিছু স্বাভাবিক আছে।

বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এ ধরনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামে ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী পল্লী এলাকা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে'। এতে লেখা হয়:

> *প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসায় শহর ও পার্শ্ববর্তী পল্লী এলাকার নাগরিকগণ তাদের জাতিগঠনমূলক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। গতকাল রোববার পিপিআই এ খবর পরিবেশন করে। পিপিআই'র একজন প্রতিনিধি ঢাকার আশেপাশের গ্রামসমূহ সফরকালে চাষীদেরকে তাদের জমিতে কর্তব্যরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। একজন চাষী প্রতিনিধিকে জানান যে, আসছে মওসুমে তার জমিতে ভাল ফলন হবে বলে তিনি আশা করছেন। ৫৮ বছর বয়স্ক জনাব শাহেদ আলী। দিনের ১২টি ঘণ্টাই তিনি নিজের জমিতে পড়ে থাকেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, এই অঞ্চলে সময় মত বৃষ্টিপাত হওয়ায় এবং শক্তিচালিত পাম্প সরবরাহ হওয়ায় চাষীদের খুবই সুবিধা হয়েছে। চলতি বছরের ইরি, বোরো এবং গোলআলুর উৎপাদন গত বছরের চাইতে অধিকতর সন্তোষজনক। প্রতিনিধিটি বাজারে গিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্বাভাবিক সরবরাহ লক্ষ্য করেছেন। বিভিন্ন বন্ধু দেশ থেকে আগত চিঠিপত্র বিলি হচ্ছে। মার্চের প্রথম দিকে প্রদেশে গোলযোগ বিদ্যমান থাকায় এসব চিঠিপত্রের বেশির ভাগই করাচীতে স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল। পিপিআই'র ঢাকা অফিস ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম বেতার টেলিপ্রিন্টার গত শুক্রবার চালু হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পিআইএ, পিআইডি, রেডিও পাকিস্তান এবং এপিপির বেতার টেলিপ্রিন্টার লাইনসমূহ এর আগেই চালু হয়েছে।*

১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল এ ধরনের আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামে। এই প্রতিবেদনে দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো বিশেষ করে যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনার জীবনযাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক হচ্ছে, এমন ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। তবে এজন্য যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে মুক্তিবাহিনীকে 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী', 'দুষ্কৃতকারী' ও 'রাষ্ট্রবিরোধী' উল্লেখ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোর জীবনযাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে'। এতে লেখা হয়:

> *পাক-ভারত সীমান্তের প্রায় সব কটি প্রধান প্রধান কেন্দ্রসহ পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকা বর্তমানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনার বিভিন্ন শহরের জীবনযাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এপিপি'র একজন বিশেষ সংবাদদাতা এ তথ্য পরিবেশন করেছেন। বেনাপোল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চুসগাছা এবং দর্শনা প্রভৃতি সীমান্তবর্তী শহরগুলো ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গত মঙ্গলবার সেনাবাহিনী সীমান্ত থেকে ৬ মাইল দূরবর্তী সাতক্ষীরার দিকে এগিয়ে যান এবং শহর ও আশেপাশের এলাকাকে মুক্ত করেন। এ অভিযান পরিচালনাকালে তারা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হননি। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যেসব ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও রাষ্ট্রবিরোধীরা দৌরাত্ম্য চালাচ্ছে, তাদেরকে উৎখাত করার জন্য পল্লীবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় পরিচালিত নির্মূল অভিযানও সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলছে। এর আগে এসব দুষ্কৃতিকারী ও রাষ্ট্রবিরোধীরা নাশকতামূলক কার্যকলাপ, খাদ্যসামগ্রী লুট, নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা এবং যোগাযোগের মাধ্যমগুলো ধ্বংস করে শহর ও পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার কাজে লিপ্ত ছিল। নিরীহ গ্রামবাসীরা এসব লোকের নাশকতামূলক কাজে সহযোগিতা করতে রাজী নয়।*

'সংবাদ' ছাড়া ঢাকার প্রধান দৈনিকগুলো প্রকাশনা শুরু করল। অবরুদ্ধ হলেও শুরুতে সাংবাদিকরা সামরিক বিধিকে পাশ কাটিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কিছু তথ্য প্রকাশের প্রচেষ্টা নেন

ঢাকার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক– এমন একটি ধারণা দেওয়া হয় বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত আরেক প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যে বোঝা যায়, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই বিপর্যয়ের তথ্য আড়াল করার জন্যই ঢাকা শহর 'কর্মচঞ্চল ও প্রাণবন্ত' রয়েছে, তা প্রমাণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল এই প্রতিবেদন দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা শহর আবার কর্মচঞ্চল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে'। এতে লেখা হয়:

> *সারা ঢাকা শহরে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা অব্যাহত রয়েছে বলে গতকাল সোমবার এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ। মেঘাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও গতকাল শহর ও শহরের আশেপাশের বাজার ও আবাসিক এলাকাগুলো আরো কর্মচঞ্চল এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য*

যে, শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আরো অধিক সংখ্যায় শহরে আসতে শুরু করেছে।

দোকানপাট খোলার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক, নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার আরো উন্নতির সাথে সাথে খাদ্যশস্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব পূরণ হচ্ছে। বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ, গোশত ও টাটকা শাক-সব্জীর আমদানী বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বাজারে কেনাকাটার জন্য প্রচুর জনসমাগমও হচ্ছে। কর্মব্যস্ত দোকানীদের সর্বপ্রকারে বিক্রয় বৃদ্ধিতে কর্মব্যস্ত দেখা যায়। তাছাড়া বাজারে ন্যায্যমূল্যে রোজকার জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে পেরে খদ্দেরকেও সুখী ও আস্থাশীল মনে হয়।

ঢাকায় আবাসিক এলাকাসমূহে আবার প্রাণচাঞ্চল্যের আভাস লক্ষ্য করা গেছে। ছেলেমেয়েদের সারাক্ষণ বিভিন্ন খেলায় মেতে থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া সন্ধ্যের সময় মহিলাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বাইরে বেরুতেও দেখা যায়।

১৯৭১ সালের ৯ জুন বার্তা সংস্থার এপিপি'র বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে দেশ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযোদ্ধারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দিয়েছেন। যে কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল করার জন্য হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হচ্ছে। এই প্রতিবেদনেও মুক্তিবাহিনীকে 'রাষ্ট্রবিরোধী লোকজন' এবং 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল: 'পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কাজে সেনাবাহিনীর প্রশংসনীয় উদ্যোগ'। এতে লেখা হয়:

> এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলোয় পরোক্ষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। তাই কোথাও স্বাভাবিক দৈনন্দিন তৎপরতা নেই

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকায় এপিপি পরিবেশিত সংবাদে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রবর্তনের সাথে সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের ব্যাপক পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দ্রুত পরিবহণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করিতেছে। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রবিরোধী লোকজন এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল এবং অর্থনীতি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রেল, সড়ক, সেতু, কালভার্ট এবং ফেরীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টে যেসব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এর মধ্যে ছিল:

ক. পূর্ব পাকিস্তানের বড়ো বড়ো শহর ও গ্রামাঞ্চলে শান্ত অবস্থা বিরাজ করছে।
খ. দেশের বিভিন্ন এলাকা হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
গ. সব ধরনের যানবাহন রাস্তায় বের হয়েছে।
ঘ. ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।
ঙ. ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু আছে।
চ. ঢাকার জীবনযাত্রা এতটা প্রাণচঞ্চল যে, শিশুরা নিশ্চিন্তে খেলাধুলা করে বেড়াচ্ছে।
ছ. সরকারি অফিসে কর্মচারীদের লক্ষণীয় কর্মব্যস্ততা।
জ. ঢাকা থেকে পত্রিকা প্রকাশনা শুরু হয়েছে।
ঝ. ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে কর্মচাঞ্চল্য বিরাজ করছে।
ঞ. সিনেমা হলগুলোয় নিয়মিত শো চলছে।
ট. নিয়মিত চিঠিপত্র বিলি হচ্ছে।
ঠ. হাটবাজারে প্রচুর পণ্য আমদানি হচ্ছে। দেদার কেনাকাটা চলছে।

শান্তি কমিটি

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে 'শান্তি কমিটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। খাজা খায়েরউদ্দিন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট এই 'শান্তি কমিটি'র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রধান গোলাম আযম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমিনসহ পাকিস্তানপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতারা শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। এই কমিটির পক্ষ থেকে ১৩ এপ্রিল জোহরের পর বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদ পর্যন্ত মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। বার্তা সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল দৈনিক পাকিস্তানে এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি'। এতে লেখা হয়:

নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত শুক্রবার ঢাকায় খাজা খায়েরউদ্দিনকে আহ্বায়ক করে ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এপিপির খবরে প্রকাশ, কমিটি মঙ্গলবার জোহর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদ পর্যন্ত এক মিছিল বের করবে। কমিটি এক কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে কাজ করার পরিকল্পনা করছে।

গত ৯ই এপ্রিল ঢাকায় প্রতিনিধিত্বশীল নাগরিকদের এক সভায় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির বৃহত্তর ঢাকার ইউনিয়ন ও মহল্লা পর্যায়ে অনুরূপ কমিটি গঠনের ক্ষমতা রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় এগুলো কাজ করবে। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কমিটি সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলোয় পরোক্ষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। তাই কোথাও স্বাভাবিক দৈনন্দিন তৎপরতা নেই। ক্ষেতে-খামারে, কলকারখানায়, অফিস-আদালতে স্বাভাবিক পরিবেশ নেই। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে শান্তি কমিটি গঠনকে সময়োচিত পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এজন্য অভিনন্দনও জানানো হয়। শান্তি কমিটি নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে সম্পাদকীয়তে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'নাগরিক শান্তি কমিটি'। এতে লেখা হয়:

ঢাকার নেতৃস্থানীয় নাগরিকগণ জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শান্তি কমিটি গঠনের মাধ্যমে যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, উহাকে আমরা একটা সময়োচিত পদক্ষেপ হিসাবে অভিনন্দন জানাইতেছি। ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্য সকল স্থানে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। জনসাধারণ তাহাদের স্ব স্ব বৃত্তিতে এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মে বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছেন। শহরের বাজারগুলিতে পণ্যসম্ভার এবং ক্রেতার সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসগুলি পূর্ণোদ্যমে চালু হইয়াছে। যাহারা অন্যত্র গিয়াছিলেন, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হইয়া উঠায় তাহারা এখন নিজেদের আবাসস্থলে ফিরিয়া আসিতেছেন। এই অবস্থায়ও এক শ্রেণীর লোক অহেতুক গুজবের জন্মদান করিতেছে। নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হওয়ায় অচিরেই এ ধরনের বাজে গুজবের অবসান ঘটিবে এবং নাগরিক জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি, স্বস্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমরা সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি।

রাজধানী নগরী ঢাকার ইউনিয়ন ও মহল্লা পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠনের যে উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে, উহাও বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। এই উদ্যোগ নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার

সহায়ক হইবে। ঢাকার নাগরিকদের এই অগ্রবর্তী ভূমিকা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। কেননা, এই মুহূর্তে জনজীবনে স্বস্তি এবং স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নাই।

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল দৈনিক পূর্বদেশ শান্তি কমিটি গঠন প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তেও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মতপ্রকাশ করা হয়। 'শান্তি কমিটি ও জনগণের দায়িত্ব' শীর্ষক এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আজ নাগরিক শান্তি কমিটির উদ্যোগে একটি শান্তি মিছিল জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে বেরিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমার পর চকবাজার মসজিদে শেষ হবে। দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধিকামী নাগরিকদের উদ্যোগে পরিচালিত এই ধরনের শান্তি মিছিলের গুরুত্ব অপরিসীম এবং দেশের প্রতিটি সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ও যুক্তিবাদী মানুষ মাত্রেই আন্তরিকভাবে এই শুভ উদ্যোগের প্রতি অভিনন্দন জানাবে। সারাদেশের মানুষের জীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, অফিস-আদালতে এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও দৈনন্দিন কর্মতৎপরতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে উৎপাদনের চাকা পূর্ণোদ্যমে চালু করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এই নাগরিক শান্তি কমিটির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শুধু ঢাকাতেই নয়। কুমিল্লাতেও অনুরূপ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সেখানকার জনগণ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গত রবিবার একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ঢাকা ও কুমিল্লার এই দৃষ্টান্ত শিগগিরই প্রদেশের অন্যান্য এলাকাকেও অনুপ্রাণিত করবে এবং সারা প্রদেশে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক ও নিয়মিত পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত কিম্বা অন্য যে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের হস্তেক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণের সংকল্প দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করবে। শান্তির সপক্ষে ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসই তাদেরকে নিজেদের প্রতি প্রত্যয়ী ও আস্থাশীল করে তুলতে সাহায্য করবে।

শান্তি কমিটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করা এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শান্তি কমিটি ব্যাপক তৎপরতা চালায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংবাদপত্রের পাতায় সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই সংগঠনের শাখা খোলা, বিভিন্ন স্থানে জনসভা, বৈঠকের খবর এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতি প্রকাশিত হয়। শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় যে মিছিল বের হয়, এ খবরও প্রকাশিত হয়। শান্তি কমিটি সংক্রান্ত রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই সংগঠনের মূল তৎপরতাগুলো ছিল:

ক. পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কার্যক্রমের প্রশংসা করা।
খ. পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো।
গ. ভারতীয় বেতারে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ-তৎপরতা সম্পর্কে যেসব খবর প্রচার করা হতো তাকে গুজব হিসেবে অভিহিত করা এবং তাতে কান না দেওয়ার আহ্বান জানানো।
ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করার আহ্বান জানানো।
ঙ. মুক্তিযোদ্ধারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত ও বিপথগামী। তাই তাদের বুঝিয়ে 'সঠিক পথে' প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো।
চ. জীবনের সর্বক্ষেত্রে আস্থা ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনায় সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানানো।

মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ও যুদ্ধ

মুক্তিযোদ্ধারা সারা দেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ-তৎপরতা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে– এমন প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশের প্রবণতা দেখা যায়।

১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল বার্তা সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে দৈনিক সংগ্রামে এই প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়, নয়াদিল্লি বেতার থেকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সাফল্যের তথ্য তুলে ধরা হয়। কিন্তু এপিপির খবরে তা নেতিবাচকভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনেও মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতকারী' ও 'অনুপ্রবেশকারী' অভিহিত করা হয়েছে। দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দুষ্কৃতিকারী মুক্ত'। এতে লেখা হয়:

ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত পুরো এলাকাটি এখন দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারী মুক্ত হয়েছে। গতকাল বুধবার এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ঢাকায় সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে, ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী যে অভিযান শুরু করেছিল তা পাবনা, ঈশ্বরদী এবং নাটোর হয়ে বর্তমানে রাজশাহীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গ্যারিসনের সাথে মিলিত হয়েছে। এই সমুদয় এলাকাটি এখন দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্ত হয়েছে। সরকারীভাবে আরও বলা হয়েছে যে, আরিচা এবং নগরবাড়ীসহ ঢাকা থেকে পাবনা পর্যন্ত যে সকল ফেরী এতদিন বন্ধ ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেগুলো পুনরায় চালু করেছে।

পাকিস্তান বিমানবাহিনী এলোপাতাড়ি বোমাবর্ষণ করেছে বলে নয়াদিল্লী বেতারে যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে ঢাকায় সরকারীভাবে তাকে ডাহা মিথ্যে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিমানবাহিনী বিগত কয়েকদিন যাবত কোন অভিযান চালায়নি। এমনকি পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর বিমানগুলো এর আগে যেসব অভিযান চালিয়েছিল তাতে তারা খুবই সতর্কতার সাথে কেবলমাত্র দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের ঘাঁটির বিরুদ্ধে অভিযানরত স্থলবাহিনীকেই সাহায্য করে। নয়াদিল্লীর বেতার থেকে কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে যে, সেতু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ঢাকায় এ খবরকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের কোন ঘটনাই ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বেতার এসব উস্কানীমূলক প্রচারণা এ কারণেই চালাচ্ছে, যাতে করে দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারীরা উত্তেজিত হয় এবং এ ধরনের ঘটনা আসলেই ঘটে।

> একই ধরনের একটি প্রতিবেদন ১৯৭১ সালের ৩ মে দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে 'মুক্তিবাহিনী'র নাম উল্লেখ করা হয়। তবে 'মুক্তিবাহিনী' শব্দের আগে 'তথাকথিত' শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়

একই ধরনের একটি প্রতিবেদন ১৯৭১ সালের ৩ মে দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে 'মুক্তিবাহিনী'র নাম উল্লেখ করা হয়। তবে 'মুক্তিবাহিনী' শব্দের আগে 'তথাকথিত' শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে– এ কথাও উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। কিন্তু তারা 'বিশৃঙ্খল' ও 'ছত্রভঙ্গ' হয়ে পড়েছে– এই বার্তা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। নেতিবাচকভাবে হলেও 'বাংলাদেশ' সরকারের কথা এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: 'বগুড়ায় তথাকথিত মুক্তিবাহিনী ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে'। এতে লেখা হয়:

বগুড়া জেলায় অধুনালুপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামী লীগের তথাকথিত মুক্তি বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। একথা জানিয়েছেন এপিপি'র বিশেষ সংবাদদাতা আলতাফ আওয়ার। বগুড়া এবং রংপুরে তিনদিন সফর শেষে এক বার্তায় এপিপি সংবাদদাতা জানান, উক্ত এলাকার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার এক সাক্ষাৎকারে

আমাকে জানান যে, 'মুক্তি বাহিনী'র লোকেরা বর্তমানে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করছে এবং অনেকেই যুদ্ধ থেকে পিঠটান দিয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নাম শুনে তারা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৌঁছানোর সাথে সাথেই তারা তাদের ঘাঁটি থেকে পালিয়ে যায়। বগুড়া জেলার পল্লী এলাকায় অবস্থিত তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর এসব ঘাঁটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।

ফিল্ড অফিসাররা আমাকে জানান, তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর লোকেরা বর্তমানে ওসব এলাকায় নিরীহ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে। তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর লোকেরা নিরীহ জনসাধারণকে বলছে যে, আপনাদের জায়গাটাই সর্বশেষ। যা বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর দখল করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য সব জায়গা থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। আপনারা যদি আমাদের আশ্রয় দেন তবে 'বাংলাদেশ' সরকার আপনাদেরকে অনেক পুরস্কার দেবেন।

বগুড়া শহরে কার্যরত ফিল্ড অফিসারদের সাথে আলোচনাকালে আমি জানতে পারি যে, ভারত মুক্তি বাহিনীকে বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করেছে। যাতে এর দ্বারা উক্ত এলাকার রাস্তা এবং রেল যোগাযোগ বিনষ্ট করা যায়। আমাকে বগুড়া শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে পলাশবাড়ী গ্রামের কাছে বগুড়া-রংপুর রাস্তার প্রধান পুলটি দেখানো হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ পুলটির ক্ষতিগ্রস্ত ১০ গজ মেরামত করেছে। পুলটি বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য হয়েছে এবং সব রকম যানবাহন এ পুলের ওপর দিয়ে চলাচল করছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন পুলটি দখল করে নেয় তখন সেখানে বহু অব্যবহৃত বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায়। এ অভিযানের সময় আটককৃত ভারতে তৈরী হাতবোমা ফিল্ড অফিসাররা আমাকে দেখান।

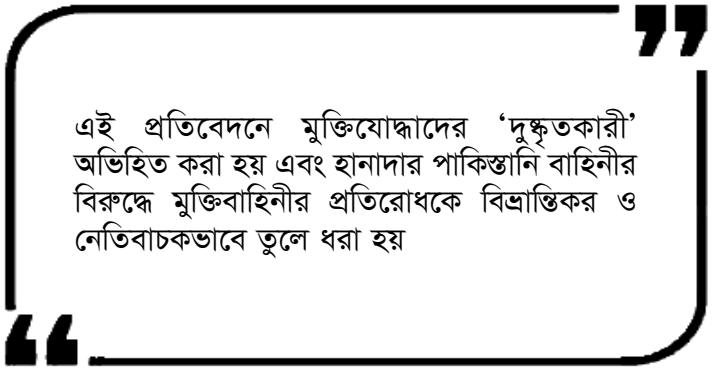

হাতবোমা ছাড়াও পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারী মেশিনগান, ভার্নিকুলার ও কম্পাস উদ্ধার করেন। এগুলো ভারতে তৈরী।

বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এ বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে যেসব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, এর মধ্যে ছিল:

ক. মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড ও যুদ্ধ-তৎপরতাকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা।
গ. বিভিন্ন এলাকা 'দুষ্কৃতকারী'মুক্ত।
ঘ. পাকিস্তান বাহিনী 'দুষ্কৃতকারীদের' উৎখাত করেছে।
ঙ. পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সামরিক কর্তৃপক্ষের আয়ত্তে রয়েছে।
ঘ. মুক্তিযোদ্ধারা মনোবল হারিয়ে ফেলেছে।
ঙ. মুক্তিযোদ্ধারা বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ

পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন নির্দেশ ও ঘোষণাভিত্তিক বেশকিছু প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামে বার্তা সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে এ ধরনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি ছিল আওয়ামী লীগের তহবিলে আদানপ্রদান বন্ধ রাখার নির্দেশবিষয়ক। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের তহবিল সংক্রান্ত আদান-প্রদান বন্ধ রাখার নির্দেশ'। এতে লেখা হয়:

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সকল ব্যক্তিকে বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের তহবিল সংক্রান্ত সকল আদান-প্রদান বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। গত রোববার এখানে জারীকৃত প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ১৮ নম্বর আদেশে একথা বলা হয়। গত ২৬শে মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ তহবিলের সমস্ত আদান-প্রদানের বিস্তারিত হিসেব ৩০ দিনের মধ্যে রাওয়ালপিণ্ডিস্থ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতরে পেশ করার জন্যও ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তির কাছে যদি নগদ অথবা তার ব্যাংক একাউন্টে আওয়ামী লীগের টাকা থেকে থাকে, তবে সেসব ব্যক্তিকেও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতরে তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব ৩০ দিনের মধ্যে পেশ করতে হবে।

বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামে ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল। এই প্রতিবেদনে মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতকারী' অভিহিত করা হয় এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধকে বিভ্রান্তিকর ও নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য জানানোর জন্য নির্দেশনা জারির কথা জানানো হয় এই প্রতিবেদনে। শিরোনাম ছিল: 'দুষ্কৃতিকারীদের সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ'। এতে লেখা হয়:

ঢাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সাথে সাথে ঢাকার কোন কোন এলাকায় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী শান্তিপ্রিয় লোকদের ওপর জবরদস্তি ও তাদেরকে হয়রানি করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তাদের কেহ কেহ নিজেদের সামরিক বাহিনীর লোক বলে ভুয়া পরিচয় দিচ্ছে। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ এ সকল ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে জানানো হয়েছে। জনগণের সুবিধার জন্য ঢাকায় অভিযোগ কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হয়েছে। ... এ সকল অভিযোগ কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে মিলিটারী পুলিশের একটি করে ক্ষুদ্র দলও থাকবে। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যে কোন প্রকার ভুয়া পরিচিতি ও শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে সাথে সাথে সংবাদ দেয়ার জন্য সকল নাগরিকের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামে এ ধরনের আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রেস নোটের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারিদের কাজে যোগদানের কঠোর নির্দেশ প্রদানের কথা বলা হয়। অন্যথায় তাদের সামরিক আইন অনুযায়ী শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনেও প্রতীয়মান হয় যে, দেশে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল এবং স্বীকার করা হয়েছে যে, পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল: 'সকল কর্মচারীদের ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ'। এতে লেখা হয়:

পূর্ব পাকিস্তানে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের আগামী ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন বলে গতকাল এপিপি পরিবেশিত খবরে জানানো হয়েছে। এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, যে সকল কর্মচারী সর্বশেষ আগামী ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হবেন তাদেরকে ১২০ নম্বর সামরিক নির্দেশ মোতাবেক শাস্তি প্রদান ছাড়াও চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে। প্রেসনোটের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

লক্ষ্য করা গেছে যে, বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের গত ২৭শে মার্চ কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ কাজে যোগদানে ব্যর্থ হয়েছেন। পূর্ববর্তী নির্দেশ পালনে অনেক কর্মচারীর সত্যিকারের অসুবিধাসমূহ বিবেচনা করে সরকার সহানুভূতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেছেন ও এ যাবত কোন প্রকার শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছেন। এখন যেহেতু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ও অসুবিধাসমূহ অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে সেহেতু সকল সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের সর্বশেষ আগামী ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অন্যথায় ১২০ নম্বর সামরিক নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে শাস্তি প্রদান ছাড়াও তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ-তৎপরতা যখন আরও জোরদার হয়েছে, তখন মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য প্রদান ও গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ। সরকারি প্রেস নোটের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত

এই প্রতিবেদন দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর। এই প্রতিবেদনে লক্ষণীয় একটি বিষয় হচ্ছে, 'ডুপ্লিকেটিং মেশিন'কে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ আগ্নেয়াস্ত্রের মতোই বিবেচনা করত। এর কারণও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ডুপ্লিকেটিং মেশিনে ঢাকা থেকে বেশকিছু সংবাদ-বুলেটিন, লিফলেট, প্যাম্পলেট গোপনে প্রকাশিত হতো। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো লিপিবদ্ধ ও প্রকাশনার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন অবরুদ্ধ সাংবাদিকরা। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল: 'সরকারের সিদ্ধান্ত: দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার বা খবরের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে'। এতে লেখা হয়:

যেসব অনুগত ব্যক্তি দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতারের মত নির্ভরযোগ্য খবর দেবে বা নিজেরা দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কাছে পেশ করবে সরকার তাদের যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে গতকাল বুধবার এক প্রেসনোটে জানানো হয়েছে। এপিপি খবরে প্রকাশ, পুরস্কারের হার নিম্নরূপ:

ক. দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার অথবা দুষ্কৃতিকারীদের সাথে সফল মোকাবিলার খবর দেওয়ার জন্যে ৫০০ টাকা।
খ. ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতারের জন্য ৭৫০ টাকা।
গ. রাইফেল, বোমা বা ডুপ্লিকেটিং মেশিন বা অপরাধ করা যায় এমন অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের জন্য ১০০০ টাকা।
ঘ. দুষ্কৃতিকারীদের নেতা গ্রেফতারের জন্য ২০০০ টাকা।

বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার অথবা দুষ্কৃতিদলের নেতা গ্রেফতারের জন্য দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বড় অঙ্কের পুরস্কার দেবার বিষয় বিবেচিত হতে পারে। জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এক হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার মঞ্জুর করতে পারবেন।

দুষ্কৃতিকারীদের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ হবে:

ক. তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত সদস্য, তথাকথিত মুক্তি বাহিনী ভর্তিতে সাহায্যকারী।
খ. স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের খাদ্য, যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহকারী।
গ. স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানকারী।
ঘ. বিদ্রোহীদের 'ইনফরমার' বা বার্তাবাহকরূপে যারা কাজ করে এবং
ঙ. তথাকথিত মুক্তি বাহিনী সম্পর্কিত নাশকতামূলক লিফলেট, প্যাম্পলেট প্রভৃতির লেখক বা প্রকাশক।

বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এ বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে যেসব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, এর মধ্যে ছিল:

ক. আওয়ামী লীগকে সহায়তা না করার নির্দেশ।
খ. পাকিস্তান বাহিনীর গাড়ি চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য তৈরি ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ।
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতকারী' হিসেবে অভিহিত করে তাদের সম্পর্কে সতর্কীকরণ।
ঘ. সরকারি কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ।
ঙ. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনা ও পুলিশ সদস্যদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ।

রাজাকারদের কৃতিত্ব প্রচার

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি আলবদর, আলশামস ও রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। তাদের কার্যক্রম ও তৎপরতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো। এক মাসে রাজাকাররা ময়মনসিংহ জেলায় কী কী তৎপরতা চালিয়েছে, এর বিবরণ সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ আগস্ট দৈনিক পাকিস্তানে। তবে এই প্রতিবেদনে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ-তৎপরতার প্রতিফলন ঘটেছে। এই প্রতিবেদনে মুক্তিবাহিনীকে 'দুষ্কৃতকারী' অভিহিত করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: 'রাজাকাররা ৭০ জন দুষ্কৃতিকারীকে হত্যা করেছে'। এতে লেখা হয়:

রাজাকাররা ময়মনসিংহ জেলায় গত মাসে ৭০ জন রাষ্ট্রবিরোধী লোককে নিহত এবং বহুজনকে আহত করেছে। এছাড়া তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করেছে। গতকাল সোমবার ঢাকায় এপিপি এ খবর পরিবেশন করেছে। এখানে প্রাপ্ত বিস্তারিত খবরে প্রকাশ, দুষ্কৃতিকারীরা গত ৪ঠা জুলাই শেরপুরের কাছে একটি গ্রামের সেতু ধ্বংস করার চেষ্টা করে। রাজাকাররা তাদের বহুজনকে হতাহত করে সেতু ধ্বংস করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। দুষ্কৃতিকারীরা ১৯টি লাশ, ১৩ খণ্ড টিএনটি, কয়েকটি হাতবোমা, ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন এবং ভারতে তৈরী ১৯টি বিস্ফোরক টিউব ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

শেরপুর থেকে ২০ মাইল দূরবর্তী একটি গ্রামে দুষ্কৃতিকারীদের অবস্থানের খবর পেয়ে পরদিন রাজাকাররা উক্ত গ্রামে গিয়ে ২০ জন দুষ্কৃতিকারীকে হত্যা করেছে এবং কিছু রাইফেল, হাতবোমা এবং ৩০০ মণ চাল উদ্ধার করেছে।

১৯৭১ সালের ২৯ অক্টোবর দৈনিক পূর্বদেশে এ ধরনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনেও মুক্তিযোদ্ধাদের 'ভারতীয় চর' অভিহিত করা হয়। প্রতিবেদনে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ-তৎপরতার প্রতিফলন দেখা যায়। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন এলাকায় রাজাকারদের তৎপরতা'। এতে লেখা হয়:

মফস্বল এলাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে রাজাকাররা প্রায় প্রতিদিন ভারতীয় চরদের মোকাবিলা করছে। এতে তারা গুরুত্বপূর্ণ সেতু, জনগণের জানমাল এবং ইজ্জত রক্ষা করছে। সিলেট থেকে পাওয়া এক খবরে জানা যায় যে, সেখানে আজ রাজাকাররা সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় চরদের আক্রমণ নস্যাৎ করে তিনটি সেতু রক্ষা করেছে। বাধাদানের সময় রাজাকাররা চারজন ভারতীয় চরকে হত্যা করে। ঘটনার পূর্ণ বিবরণে জানা যায়, রাজাকাররা পূর্ব সীমান্ত বরাবর দুইটি সেতু পাহারা দিচ্ছিল। ভারতীয় অনুচরদের তিনটি দল সীমান্ত অতিক্রম করে রাজাকারদের উপর গুলী ছুড়তে শুরু করে, তারা সেতুগুলোও ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করে। রাজাকাররা সাফল্যের সাথে প্রত্যুত্তর দেয় এবং অনুচরদের চারজনকে হত্যা করে। বাকিরা দ্রুত ভারতীয় অঞ্চলে পালিয়ে যায়। সেতুগুলোর কোন ক্ষতি হয় নি।

> এক মাসে রাজাকাররা ময়মনসিংহ জেলায় কী কী তৎপরতা চালিয়েছে, এর বিবরণ সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ আগস্ট দৈনিক পাকিস্তানে

১৯৭১ সালের ৮ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকেও এ ধরনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে জানানো হয়, আলশামস ও আলবদর বাহিনী মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে। তবে এই প্রতিবেদনেও মুক্তিযোদ্ধাদের 'ভারতীয় এজেন্ট' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বার্তা সংস্থা এপিপি পরিবেশিত এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: 'আল-শামস ও আল-বদরের তৎপরতা'। এতে লেখা হয়:

রাজাকারদের আল-শামস ও আল-বদর গ্রুপ গতকাল (রবিবার) প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে সাহসিকতাপূর্ণ কার্য সম্পাদনা করে বলিয়া গতকাল ঢাকায় প্রাপ্ত রিপোর্টে প্রকাশ। দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী জেলা হইতে এইসব সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলীর রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর হইতে এক রিপোর্টে বলা হয়, দিনাজপুরের পশ্চিমে মহেশপুর এলাকায় টহলদানকালে আল-শামস রাজাকারের একটি দল একদল ভারতীয় এজেন্টকে চ্যালেঞ্জ করে। তাহারা দুরভিসন্ধি নিয়া নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করিতেছিল। ভারতীয় এজেন্টগণ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে গুলিবর্ষণ করে। রাজাকারগণ পাল্টা গুলি চালায়। ১৫

মিনিটের বেশি সময় গুলিবিনিময় অব্যাহত থাকে। রাজাকারদের একটি গ্রুপ সামনের দিক হইতে ভারতীয় এজেন্টদের ব্যস্ত রাখাকালে কয়েকজন রাজাকার পাশের দিক দিয়া কয়েকটি গুলি ছোঁড়ে। ভারতীয় এজেন্টগণ পাশের দিক হইতে গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ৩টি স্টেনগান, ৪টি রাইফেল এবং ২২টি হাতবোমা ফেলিয়া পলায়ন করে। পলায়নের সময় তাহাদের ৫ জন নিহত হয়। রাজাকারদেরও ২ জন আহত হয়। আল-বদর রাজাকারগণ গতকাল ময়মনসিংহে দুইটি সেতু সাফল্যের সাথে রক্ষা করে। উহাদের একটি সরিষাবাড়ী এবং অপরটি ইসলামপুরের নিকট অবস্থিত। ভারতীয় এজেন্টগণ সেতুগুলি ধ্বংস করার চেষ্টা করিতেছিল।

অনুরূপভাবে গতকাল যশোর জেলায় রাজাকারগণ সফদরপুরের নিকট ভারতীয় এজেন্টদের রেল লাইন অপসারণের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। সংঘর্ষে দুইজন ভারতীয় এজেন্ট আহত হয়।

বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এ বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে যেসব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, এর মধ্যে ছিল:

ক. মুক্তিযোদ্ধাদের 'ভারতীয় চর' ও 'রাষ্ট্রবিরোধী' অভিহিত করে তাদের নির্মূল অভিযানে আলবদর, আলশামস ও রাজাকারদের সাফল্য অর্জন।
খ. আলবদর, আলশামস ও রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের 'হত্যা' করেছে।
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন ঘাঁটি থেকে আলবদর, আলশামস ও রাজাকাররা অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে।
ঘ. সাফল্যের প্রেক্ষাপটে রাজাকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুলিশের পাশাপাশি রাজাকার মোতায়েনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের ঘোষণা।
ঙ. দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের হটিয়ে রাস্তাঘাট, সেতু-কালভার্ট রক্ষা করা।

এসব প্রতিবেদনই বলে দেয় যে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কী ধরনের খবর প্রকাশিত হতো অবরুদ্ধ সংবাদপত্রে। স্বাধীনতা-পূর্ব বা স্বাধীনতা-উত্তরকালে একই নাম, মেক-আপ, গেট-আপের হলেও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এই সংবাদপত্রগুলো ছিল মূলত পাকিস্তানি সরকারের অপপ্রচার আর প্রপাগান্ডার বাহন। সংবাদপত্রগুলো সামরিক জান্তার মুখপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না। তবে অবরুদ্ধ সংবাদপত্রের অনেক প্রতিবেদনেই পরোক্ষভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে চলমান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ-তৎপরতার তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নেতিবাচক প্রতিবেদন থেকেও প্রকৃত তথ্যের আভাস পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস অবরুদ্ধ সংবাদপত্রে কর্মরত বেশির ভাগ সাংবাদিক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সময় কাটিয়েছেন। প্রায় বন্দিই ছিলেন তারা। নানা নজরদারি, খবরদারির মধ্যে পেশাগত ঘানি টানতে হয়েছে তাদের। বাধ্য হয়েছেন বিভ্রান্তিকর খবর সংবলিত সংবাদপত্র প্রকাশ করতে। সত্য ঘটনা লিখতে পারেননি। হয়তো লেখনী অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে, সোচ্চার হতে চেয়েছে। কিন্তু পারেননি। নানা সমস্যা ছিল। নিজের মৃত্যুভয়, সন্তান-পরিজনের জীবনশঙ্কা ছিল। তবে ঘটনার তরঙ্গচূড়ায় সাংবাদিকদের অবস্থান। তাই নানা সূত্র থেকে প্রকৃত খবর চলে আসত তাদের হাতে। সেসব খবর নিজেদের মধ্যে বিনিময় করতেন তারা। সুযোগ পেলেই দেশের বাইরে পাচার করতেন। অনেক খবর তারা বাহকের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন।

প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েও সাংবাদিকদের অনেকেই সত্য প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের কেউ কেউ দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াতে পারেননি। যে কারণে প্রাণ দিতে হয়েছে সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুদ্দীন আহমদ, এস এ মান্নান (লাডু ভাই), আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নাজমুল হক, এ কে এম শহীদুল্লাহ (শহীদ সাবের), আবুল বাশার, শিবসাধন চক্রবর্তী, চিশ্‌তি শাহ্ হেলালুর রহমান, মুহম্মদ আখতার, সেলিনা পারভীনের মতো অনেক সাংবাদিককে।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস অবরুদ্ধ ছিল ঢাকার সংবাদপত্র। অবরুদ্ধ ছিল সাংবাদিকদের পেশাগত জীবন। কিন্তু অবরুদ্ধ ছিল না তাদের বিবেক। বিবেক ছিল মুক্ত। স্বাধীন বাংলাদেশপ্রত্যাশী। মুক্তিযুদ্ধকালে অনেক সাংবাদিকই হয়তো ইচ্ছের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। কারণ, গোয়েন্দা নজরদারি ছিল অনেকের ওপর। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই যারা দেশ ছাড়তে পেরেছিলেন, তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর যারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন, তাদের কাজ করতে হয় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অধিকৃত সংবাদপত্রে। পরে কেউ কেউ সুযোগ মতো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আবার অনেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেনি। অনেকে গোয়েন্দা নজরদারি থেকে বের হয়ে আত্মগোপন করেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. জাহান, মো. এমরান (২০০৮), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।
২. ধর, সুব্রত শঙ্কর (১৯৮৫), *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।
৩. মোরশেদ, হেদায়েত হোসাইন (১৯৮৩), *অবরুদ্ধ সংবাদপত্র '৭১ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল*, ঢাকা: নসাস
৪. *সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা: একাত্তরের ঘাতকদের জবান জুলুম ষড়যন্ত্র চিত্র (২০১৬)*, সম্পাদক: দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

লেখক: গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

যুদ্ধদিনে মুক্তিবার্তা ‘জয়বাংলা’

শাহেলা আক্তার

জয় বাংলা! বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে একটি অনন্য স্লোগান। এই স্লোগানটি মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে চলার শক্তি ও প্রেরণায় পরিণত হয়েছিল। জয় বাংলা স্লোগানটিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসর বাঙালির মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠা রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনী ভয় পেত। শব্দটি শেলের মতো আঘাত হানত তাদের বুকে। অন্যদিকে এ স্লোগান বাংলার দামাল ছেলেদের মনে সাহস দিয়েছে, তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি জুগিয়েছে। জয় বাংলা স্লোগানটি তাই শুধু একটি স্লোগানে সীমাবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠেছিল আমাদের মুক্তিবার্তা। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার জয় বাংলা স্লোগানটির মাহাত্ম্য খুব ভালোভাবেই বুঝেছিল। তাই তাঁরা তাঁদের মুখপত্র হিসেবে বের করেছিলেন একটি পত্রিকা, যার নাম ‘জয়বাংলা’।

মুক্তিযুদ্ধের পত্রিকা ‘জয়বাংলা’

মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে অনেক সংবাদপত্র বেরিয়েছে, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে শানিত করেছে, শক্তিশালী করেছে। যুদ্ধকালীন নয় মাসে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রকাশিত এসব পত্রিকা এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অবরুদ্ধ গোটা বাংলাদেশে যখন জাতীয় পত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধের খবর দিতে পারছিল না, মুক্তিযোদ্ধাদের যখন তাদের চিহ্নিত করতে হচ্ছিল দুষ্কৃতকারী বলে, তখন এঁরাই প্রকাশ করে চলছিল মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ এবং এ সংক্রান্ত নানা নিবন্ধ।[১] (ইমামুর রশীদ, মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা, নিরীক্ষা, ১৫৩তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২২) ঢাকার বাইরের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত এসব পত্রপত্রিকা এগিয়ে এসেছিল মূলত মুক্তিযুদ্ধকে বিস্তৃত ও সংহত করার কাজে। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা দলগত উদ্যোগে এসব পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল। ইমামুর রশীদের মতে, ‘ওই সময়ে ৩৬টিরও বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা থেকে।[২] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র’ গ্রন্থেও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে ৩৬টির বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

এসব পত্রিকার মধ্যে সর্বপ্রথম যে পত্রিকাটি বেরোয়, এর নাম 'দৈনিক জয়বাংলা'। পত্রিকাটি রাজশাহীর নওগাঁ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' গ্রন্থের গণমাধ্যম সংক্রান্ত ষষ্ঠ খণ্ডে পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ১১তম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলো সংকলিত রয়েছে। এরপর থেকে 'দৈনিক জয়বাংলা'র আর কোনো সংখ্যা পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব এ সময় রাজশাহী শত্রুকবলিত হয়ে পড়ায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর প্রায় এক মাস পর প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (রেজিস্ট্রেশন নম্বর-১) প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'জয়বাংলা' নামের একটি পত্রিকা, যা মূলত আওয়ামী লীগের মুখপত্র ছিল।[৩] (ইমামুর রশীদ, নিরীক্ষা, ৩৩তম সংখ্যা)

কেমন ছিল জয়বাংলা?

জয়বাংলা প্রথমদিকে আট পাতার পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু জনপ্রিয় হওয়ায় এবং বিজ্ঞাপন পাওয়ায় মাঝেমধ্যেই এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। আট পাতার জায়গায় কখনো ১২, কখনো ১০ পাতায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি মূলত চার কলামে প্রকাশ পেত এবং এর আকার ছিল ১৭ ইঞ্চি বাই সাড়ে ১০ ইঞ্চি। পত্রিকাটির লেটার হেড তৈরি করেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। জয়বাংলার মূল্য রাখা হয়েছিল ২৫ পয়সা। জয়বাংলা আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ পেলেও এটি ছিল অন্যদিকে প্রবাসী সরকারের মুখপত্র। প্রথম সংখ্যার লেটার হেডের নিচে এর প্রমাণ মেলে। যাতে লেখা ছিল:

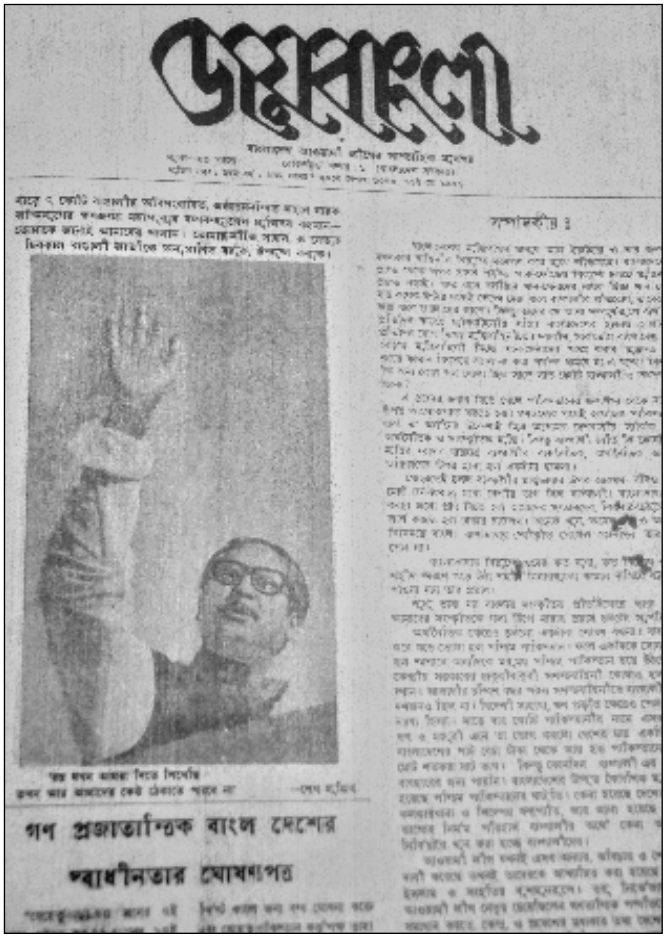

জয়বাংলা

গণ প্রজাতান্ত্রিক বাংলা দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

জয়বাংলা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র, রেজিস্টার নম্বর-১। ব্র্যাকেটে লেখা ছিল বাংলাদেশ সরকার।

জয়বাংলা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মে, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ২৭ বৈশাখ স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর থেকে।

জয়বাংলার নেপথ্যের কারিকর

পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মতিন আহমেদ চৌধুরী, এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও প্রকাশক ছিলেন আহমদ রফিক। এ দুটোই মূলত ছদ্মনাম। মুজিবনগর সরকারের তথ্য বেতার ও গণমাধ্যমের এমএনএ ইনচার্জ আবদুল মান্নানই ছিলেন আহমদ রফিক এবং অন্যদিকে বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরীই মতিন আহমেদ চৌধুরী ছদ্মনামে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আবদুল রাজ্জাক চৌধুরী, আবুল মনজুর, কবি আসাদ চৌধুরী, মো. সলিমুল্লাহ, অণু ইসলাম প্রমুখ। পত্রিকা প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন সারোয়ার জাহান। ভাষাসৈনিক গাজীউল হক ছিলেন পত্রিকার হকার। এ প্রসঙ্গে জয়বাংলার সংগ্রাহক ও সংকলক অণু ইসলাম বলেন, 'ভাবতে অবাক লাগে, ভাষা আন্দোলনের বীর নেতা গাজীউল ভাই এই পত্রিকার হকার হয়ে শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশন, চৌরঙ্গি, গড়িয়াহাট টালিগঞ্জ রাস্তায় রাস্তায় ট্র্যাডিশনাল হকারদের মতো জয়বাংলা বিক্রি ও প্রচার করে বেড়াতেন। কোনো প্রকার আভিজাত্য, লজ্জা বা লুকোচুরি করেননি।[৪] (জয়বাংলা, সংগ্রাহকের কথা)

পত্রিকা বের করতে অর্থ লাগে। প্রবাসী সরকারকে কে দেবে সেই অর্থ। অবশেষে স্পন্সর পাওয়া গেল। আনন্দবাজার গ্রুপ কাগজ দিত আবার প্রকাশনার ব্যয়ও মেটাত। অণু ইসলাম এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'পত্রিকা প্রকাশে সম্ভাব্য ভারতীয় স্পন্সর খোঁজা হচ্ছে বলে তিনি (আবদুল মান্নান) জানান। মনে হলো, স্পন্সর হাতে পাওয়া গেছে। আসলে তাই। কলকাতার বিখ্যাত আনন্দবাজার গ্রুপ কাগজের জোগান দিত। অন্যান্য ব্যয় প্রবাসী সরকার প্রায় ক্ষেত্রেই মেটাত। আমি অনেক সময় নগদ মূল্যে নিউজপ্রিন্ট ক্রয় করতাম। আবার সেসময় নিউজপ্রিন্টের স্থলে প্রিন্টিং খরচও পরিশোধ করত আনন্দবাজার। এই দিকটা প্রায়শ দেখতেন প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।'

কী কী থাকত জয়বাংলায়

জয়বাংলা ১৯৭১ সালের ১১ মে থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংখ্যায় সম্পাদকীয়, বঙ্গবন্ধুসহ নেতাদের বাণী, মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ, ছবি, বিজ্ঞপ্তি, শুভেচ্ছাবাণী, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে সাবধানবাণী, উৎসাহ বা অভয়বাণী, বাংলাদেশের ইতিহাস এসব প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে জন্ম বলেই হয়তো যুদ্ধের সংবাদ ও সম্পাদকীয় ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া ১৯৭২ সালে মুক্ত স্বাধীন দেশে জয়বাংলার একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয় ম্যাগাজিনের আকৃতিতে।

সম্পাদকীয়: জয়বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলো মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক অবস্থা বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। ২৬ মার্চ-পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণের জন্য এসব সম্পাদকীয় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। ১১ মে প্রকাশিত জয়বাংলার প্রথম সংখ্যা থেকে ২৪ ডিসেম্বর শেষ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৩২টি। ২টি সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রকাশ হয়নি। এর মধ্যে একটি হলো ৩২তম সংখ্যা এবং অন্যটি ৩৪তম সংখ্যা। তবে ৩৪তম সংখ্যায় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর একটি স্বনামে কলাম রয়েছে, যা অনেকটা সম্পাদকীয় ধরনের লেখা। এর শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় চলেছি। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী'।

তিনি শুরুতে লিখেছেন: 'এবার মুজিবনগর থেকে ঢাকায় ফেরার পালা। কত স্মৃতিমাখা কুষ্টিয়ার সেই আমের বাগান– যেখানে উচ্চারিত হয়েছে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাপত্র, মুজিবনগরের প্রতি ধূলিকণায় লেখা কত শহীদের রক্তাক্ত কাহিনী, নয় মাসের কত সুখ দুঃখের স্মৃতি, একটি নবজাত প্রজাতন্ত্রের সরকারি কাজকর্মের তৎপরতা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও কর্মীদের সেই-অনলস খাটনি, জয়বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সেই চাঞ্চল্যকর উত্তেজনামাখা দিনগুলো, সব পেছনে ফেলে আবার ফিরে চলেছি ঢাকায়। এই ঢাকা ছেড়ে একদিন এসেছিলাম বজ্রশপথ বুকে, এখন ফিরে চলেছি– আনন্দাশ্রু আর শোকাশ্রু দুই-ই চোখে নিয়ে।'

শেষের দিকে লিখেছেন:

'ঢাকার কান্না মুজিবনগরের এই পরিত্যক্ত আকাশেও যেন শোকের কুয়াশা জমিয়েছে, পৌষের কুয়াশার চাইতেও এই কুয়াশা ঘন এবং ভারী। মুজিবনগর এখন শূন্য। জয়বাংলারও এটাই– মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত শেষ সংখ্যা। এরপর জয়বাংলা নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে ঢাকা থেকে।'[৫]

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। চারদিক উৎসবমুখর পরিবেশ। এরকম পরিবেশে জয়বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করল সম্পাদকীয়: 'ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়'। এতে বলা হয়েছে, 'ঢাকা মুক্ত। ঢাকা এখন আমাদের। জয়বাংলা। স্বাধীনতার এই পবিত্র উষালগ্নে সাড়ে সাত কোটি মানুষের পরম প্রত্যাশা পূরণের এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা ভাবাবেগে অধীর হয়ে নয়, শান্ত, সমাহিত ও সৌম্য হৃদয়ে স্মরণ করি অসংখ্য বীরের রক্তস্নাত ও মাতার অশ্রুধারাকে। স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু– শেখ মুজিবুর রহমানকে। রাত্রির তমসা শেষে আসিবে না দিন? এই প্রশ্নের জবাব এসেছে মহানগরী ঢাকায় স্বাধীনতার রক্তরাঙা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। আমরা আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসীর অকুতোভয় মৈত্রী এবং তাদের জগৎ বরেণ্য নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতের বীর সৈনিকেরাও রক্ত দিয়েছেন, আত্মদান করেছেন এবং রক্তঋণের অচ্ছেদ্য রাখিতে সারা বাংলাদেশকে বেঁধে ফেলেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের মৈত্রী সুদৃঢ় হোক। স্বাধীন বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক।'

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ তখন বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ-ভারত সম্মিলিত বাহিনীর অভিযানের মুখে ততক্ষণে মুক্ত হয়েছে কুমিল্লা, সিলেট, বাহ্মণবাড়িয়া, যশোর দুর্গসহ যশোর আখাউড়া, খুলনা, চাঁদপুরসহ বেশকিছু এলাকা। ঢাকাও মুক্ত হওয়ার পথে। বাংলাদেশকে ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত। এই অবস্থায় 'জয়বাংলা' পত্রিকা একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে। যার সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'জয় বাংলা'। যাতে লেখা হয়:

'স্বাধীন বাংলাদেশ আজ জগৎ সভায় সম্মানিত ও স্বীকৃত। এশিয়ার সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রী দেশ বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আরও বহু দেশের স্বীকৃতিদান আসন্ন, একদিকে যখন মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অগ্রগতির মুখে গোটা দখলীকৃত বাংলাদেশ অচিরেই মুক্ত হতে চলেছে, ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের এই স্বীকৃতি শুধু বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিযুদ্ধের জয় নয়, গোটা এশিয়ায় গণতন্ত্র ও মানব স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও বিজয়।[৬]

মার্চে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যুদ্ধ হয়েছে গেরিলা পদ্ধতিতে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যে যেভাবে পেরেছে পাকিস্তানিদের খতম করেছে; কিন্তু সবই হয়েছে গেরিলা পদ্ধতিতে। সম্মুখযুদ্ধে নয়। অক্টোবরে মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ হয়। একাত্তরের ২২ অক্টোবর জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

'মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা নৌযান দ্বারা ইতিমধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের নৌবহর গড়ে তোলা হয়েছে। বাঙালী বৈমানিকেরা আকাশ যুদ্ধেরও প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এবার শুধু হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতির গেরিলা যুদ্ধ নয়, এবার সম্মুখযুদ্ধ। নারীঘাতী-শিশুঘাতী হানাদার বর্বরদের সমুচিত শিক্ষা দেয়া এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য মুক্তিবাহিনী এখন সবরকমে প্রস্তুত।'

জয়বাংলার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয় মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিবাহিনীর স্বপক্ষে লেখা হয়েছিল। এতে এসেছে পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের আলাদা হয়ে যাওয়ার পেছনের ইতিহাস। সম্পাদকীয়টিতে প্রশ্ন তোলা হয়:

বাঙালি জাতি কি কোনোদিন পেয়েছে মুক্তির স্বাদ? বারবার বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ওপর হানা হলো একটানা হামলা। আওয়ামী লীগ যখনই এসব অন্যায়-অবিচার ও শোষণ-বঞ্চনার প্রতিকার দাবি করেছে, তখনই তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ভারতের দালালরূপে, ইসলাম ও সংহতির দুশমনরূপে।

এই সম্পাদকীয়র শেষে রয়েছে:

আবার বলি এ যুদ্ধ আমরা চাইনি। বাধ্য হয়েই আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করেছি। নিজেদের সরকার গঠন করেছি। কারণ তারা আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা রাখেনি। জয়বাংলা।

আরও কিছু সম্পাদকীয়

১. বাস্তুত্যাগীরা তাদের সম্পত্তি ফেরত পাবেই (৯ জুন ১৯৭১, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ১)
২. শান্তি মানবতা ও স্বাধীনতার দাবী (২ জুন ১৯৭১, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ১)
৩. এরই নাম কি স্বাভাবিক অবস্থা (২৫ জুন ১৯৭১, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ১)
৪. তোমরা তোমরা আমরা আমরা (২ জুলাই '৭১, অষ্টম সংখ্যা, পৃ. ২)

জয়বাংলা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

জল্লাদদের সাথে আর থাকতে চাই না

কিছু আসবে যাবে না.....

৫. পিকিং-ওয়াশিংটন সমঝোতা (১১তম সংখ্যা, পৃ. ২)
৬. জাতিসংঘের মাধ্যমে নয়া চক্রান্ত (১২তম সংখ্যা, দ্বিতীয় পাতা)
৭. চৌদ্দই আগস্টের মৃত্যু (প্রথম বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা, পৃ. ২)
৮. ইয়াহিয়ার মস্তিষ্ক-বিকৃতি (প্রথম বর্ষ, ১৮তম সংখ্যা, পৃ. ২)
৯. সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি (১৯তম সংখ্যা, পৃ. ২)

সংবাদ বা খবর

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পাশাপাশি জয়বাংলা পত্রিকাও মুক্তিযুদ্ধের খবর, পাকিস্তানি হানাদারদের খতম করার খবর, রণাঙ্গনের শত্রুপক্ষের পরাজয়ের খবর পরিবেশনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিত, তাদের উদ্দীপ্ত করত। এসব সংবাদের সবই যে শতভাগ সত্যি ছিল তা নয়। সাংবাদিকতার নিয়মনীতি মেনে যে তা প্রকাশ করা হতো তা-ও নয়। কিন্তু এসব সংবাদ অবরুদ্ধ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, তাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য উদ্দীপ্ত করতে এসব যুদ্ধ-সংবাদের ছিল অপরিসীম ক্ষমতা।

মুক্তিযুদ্ধের জয়ের সংবাদ ছিল তাই জয়বাংলার প্রধান আকর্ষণ। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যেসব সংবাদ ও ফিচার ছাপা হতো, সেগুলো গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য রণাঙ্গনের ছবি, পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচারের ছবি, কার্টুন ইত্যাদি ছাপা হতো জয়বাংলায়। এ ধরনের একটি সংবাদ আইটেম ছিল 'রণাঙ্গনে'। জয়বাংলা ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'রণাঙ্গনে'তে তাই পুরো সপ্তাহের যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যেত। অনেকটা ফিচারধর্মী এই কলামে নিয়মিতভাবে যুদ্ধের সংবাদ ছাপা হতো। জয়বাংলার দ্বিতীয় সংখ্যার রণাঙ্গনের শিরোনাম ছিল:

'এ সপ্তাহের লড়াইয়ে আরও
সহস্রাধিক শত্রু সৈন্য নিহত'

চার কলামজুড়ে রণাঙ্গনের ছবিসহ প্রকাশিত এই সংবাদে বলা হয়:

'দেড় মাস আগে ইয়াহিয়া-টিক্কার জল্লাদ বাহিনী সুপরিকল্পিত উপায়ে বাংলাদেশের ওপর যে গণহত্যা শুরু করেছিল আজ তা এমন এক পর্যায়ে এসেছে, যেখানে তারা প্রত্যহ বাংলার মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড চাপের ফলে ভীতসন্ত্রস্ত ও নাজেহাল হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন তরুণ মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকফৌজকে দিতে হচ্ছে প্রাণ, দিতে হচ্ছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ। দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মৃত্যুঞ্জয়ী আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরবঙ্গ সেক্টরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে দিনের পর দিন পাকফৌজের উপর গেরিলা কৌশলে চোরাগুপ্তা, ঝটিকা, কখনো বা অতর্কিত হামলা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এতে গত এক সপ্তাহে অন্তত আরও এক সহস্র পাক সৈন্য নিহত হয়েছে।'[৭]

ওই একই সংখ্যার আরেকটি সংবাদ শিরোনাম:

'খুনী মওদুদী কি বলছে'

এই সংবাদে বলা হয়েছে, '১৯৫৩ সালে লাহোরে মাজহাবী খুনির তালিকার শীর্ষস্থান অধিকারী দাঙ্গা বাধিয়ে ১০ সহস্র কাদিয়ানীকে হত্যা করে যে মওলানা মওদুদী বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেই মওলানা মওদুদী বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর জল্লাদের কার্যকলাপের এক ইসলামী যুক্তি আবিষ্কার করেছেন। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদেরা যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তার সমর্থনে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে লিখিত এক পত্রে মওলানা মওদুদী বলেছেন যে বাঙালী মুসলমান ও হিন্দুতে তেমন কোন তফাৎ নেই, এবং বাঙালী মুসলমানদের হিন্দু ধর্মান্তর রোধ করার জন্যই পাকিস্তান সেনাবাহিনী কয়েক লাখ বাঙালী মুসলমানদের হত্যা করেছে।'

জয়বাংলার চতুর্থ সংখ্যায় একটি সংবাদের শিরোনাম এরকম: 'নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী দল'

এই সংবাদে রয়েছে:

তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল ২৫শে মে নয়াদিল্লীর উদ্দেশে মুজিবনগর ত্যাগ করেছেন। নয়াদিল্লীতে তারা ভারতীয় পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে উভয় দেশের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করবেন।'[৮]

আরেকটি সংবাদ:

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান...'

> প্রথম সংখ্যা থেকেই তাই ছবির সঠিক ব্যবহারে জয়বাংলা ছিল পারদর্শী। এসব ছবি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রণাঙ্গন থেকে পাঠানো। আবার অনেক সময় জয়বাংলায় কর্মরত সাংবাদিকরাও স্পটে গিয়ে ছবি তুলে এনেছেন

এ সংবাদে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের পরিবারবর্গের দায়িত্ব সরকার বহন করবে বলে বলা হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধে আহত বা পঙ্গুকে ভরণপোষণ সরকার করবে বলে সংবাদে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

১৬ জুলাই জয়বাংলার দশম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এদিন জয়বাংলার প্রথম পাতায় তিনটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তিনটিই আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিকে ঘিরে। তিনটি সংবাদের শিরোনাম হলো:

১. আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দুর্জয় সংকল্প। আমরা শত্রু বিতাড়নের শেষ যুদ্ধ লড়ছি।
২. পার্লামেন্টারী পার্টির যুক্ত সভা।
৩. অগ্নিসন্তান-মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও দেশবাসীর মনোবলের প্রশংসা।

একই দিনের আরেকটি সংবাদের শিরোনাম: 'পাকিস্তান মার্কিন অর্থসাহায্য পাবে না'। বক্স আইটেমের এই সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে যে, 'বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়ার সরকার উন্নয়ন প্রকল্পের নতুন তালিকা প্রস্তুত না করা পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সাহায্য বন্ধ রাখবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র ১৩ জুলাই ওয়াশিংটনে এই তথ্য প্রকাশ করেন।'[৯]

২৩ জুলাই প্রকাশিত জয়বাংলায় যুদ্ধের কিছু সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এরকমই একটি সংবাদ:

'খোদ ঢাকা শহরেই'

প্রথম পাতায় প্রথম কলামে পরিবেশিত এ সংবাদে বলা হয়েছে: 'বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরের গণসংযোগ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে যে, দুর্জয় মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু পাকসেনাদের সদর দপ্তরে প্রচণ্ড তৎপরতা বৃদ্ধি করেছেন।'

একই সংখ্যায় আরেকটি সংবাদের শিরোনাম: 'বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানের ওপর ক্ষুব্ধ।'

আরও কিছু সংবাদ

১. জাতিসংঘের কাছে ২২টি সংস্থার আবেদন (৩১ জুলাই, প্রথম পাতা, কলাম-৪)
২. মার্কিন কূটনৈতিকের মন্তব্য– বাংলাদেশের ৩ কোটি লোক গৃহহীন (১২তম সংখ্যা, পৃ. ১০)
৩. নৃশংসতা চলছে (১৩তম সংখ্যা, প্রথম পাতা)
৪. দালাল নিধন চলছে (১৩তম সংখ্যা, পৃ. ৩)
৫. রাষ্ট্রপতির যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সাহায্য
৬. বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে হবে
৭. বাংলাদেশের সমর্থনে সিংহল
৮. জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে (২০তম সংখ্যা)
৯. হয় জিতব, না হয়– ধ্বংস হয়ে যাবো –সৈয়দ নজরুল ইসলাম (২১তম সংখ্যা, পৃ. ৩)
১০. চূড়ান্ত বিজয় বাঙ্গালীদের হাতের মুঠোয় (২২তম সংখ্যা, পৃ. ৩)
১১. অতি চালাকের গলায় দড়ি, ভুট্টো সাহেব গ্যাঁড়াকলে আটকে গেছেন (২৪তম সংখ্যা, পৃ. ৩)
১২. দালাল খতম (২৭তম সংখ্যা, পৃ. ১)
১৩. লাকসামে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ (২৯তম সংখ্যা)
১৪. ২১ জন বুদ্ধিজীবীর আবেদন (৩৪তম সংখ্যা, ২৪ ডিসেম্বর)
১৫. মুজিবনগর থেকে ঢাকায় একই প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধু কবে ফিরবেন (৩৪তম সংখ্যা, ২৪ ডিসেম্বর)।

ছবি

ছবি কথা বলে। বলা হয়ে থাকে, একটি ছবি হাজারও শব্দের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। প্রথম সংখ্যা থেকেই তাই ছবির সঠিক ব্যবহারে জয়বাংলা ছিল পারদর্শী। এসব ছবি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রণাঙ্গন থেকে পাঠানো। আবার অনেক সময় জয়বাংলায় কর্মরত সাংবাদিকরাও স্পটে গিয়ে ছবি তুলে এনেছেন। জয়বাংলার প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতার প্রথম কলামে ব্যবহৃত হয় বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি, যার নিচে ক্যাপশন ছিল: 'রক্ত যখন আমরা দিতে শিখেছি তখন আর আমাদের কেউ ঠেকাতে পারবেন না'।

একই সংখ্যার তৃতীয় পাতায় ছাপা হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের মুক্তিফৌজের সালাম গ্রহণরত একটি ছবি।

আটের পাতায় প্রকাশিত হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসভাবে মানুষ হত্যার নিদর্শনস্বরূপ লাশের ছবি।

দ্বিতীয় সংখ্যার তৃতীয় পাতায় প্রকাশিত হয় গেরিলা যুদ্ধরত মুক্তিফৌজের ছবি, যার ক্যাপশন ছিল: 'শত্রু সৈন্যের দল আসছে শুনে ওৎ পেতে আছে মুক্তিফৌজের লোকেরা। এমনভাবে আজ তারা অতিষ্ঠ করে তুলেছে ইয়াহিয়ার সৈন্যদের।'

একই সংখ্যার সাতের পাতার একটি ছবি হচ্ছে– মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের ছবি। ক্যাপশন ছিল: 'মুক্তিফৌজের কেন্দ্রে কেন্দ্রে চলছে ট্রেনিং'। তৃতীয় সংখ্যার প্রথম পাতায় ছিল মওলানা ভাসানীর ছবি। তৃতীয় পাতার একটি ছবি খুবই মর্মস্পর্শী, যার ক্যাপশন ছিল এমন: 'বৃষ্টির পানির স্রোত নয়। মানব রক্তের স্রোত বইতে দেখা যাচ্ছে ছবিতে'। পাবনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটের একটি কোয়ার্টারে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে কয়েক শ বাঙালিকে। তাদেরই রক্ত বয়ে চলেছে ড্রেন বেয়ে।

চতুর্থ সংখ্যার প্রথম পাতায় ব্যবহৃত ছবিটি একটি মসজিদের, যা পাকিস্তানিদের আক্রমণে ভেঙে চুরমার। ছবির ক্যাপশন সে কথাই বলছে: 'পশ্চিম পাকিস্তানের নমরুদ-ফেরাউনদের হাত থেকে বাংলাদেশে আল্লাহর ঘরগুলোও রেহাই পায়নি। একটা মসজিদের সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর মিনারটি দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় সর্বশক্তিমানের কাছে জল্লাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনার'। একই সংখ্যার শেষ পাতায় (৮) প্রকাশিত হয়েছে একটি আশ্রয় ক্যাম্পের ছবি, যাতে একটি পরিবারকে চিন্তিত মুখে বসে থাকতে দেখা যায়। ক্যাপশনটি এরকম: 'পরিবারের পুরুষ

লোকগুলোর সবাই মারা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সৈন্যদের গুলিতে। বেঁচে রয়েছে শুধু নারী ও শিশুগুলো। তারা আশ্রয় নিয়েছে সীমান্ত পারের কোন ক্যাম্পে। কিন্তু সেখানে বসে বসেও তাদের ভাবনার অন্ত নেই। তাই তারা কপালে হাত দিয়ে ভাবছে বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা।'

১৩তম সংখ্যার প্রথম পাতায় একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে, যাতে মৃত দুটি শিশুর রক্তাক্ত দেহ বিছানায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই ছবির ক্যাপশন এরকম: হানাদার দস্যু সৈন্যের গুলিতে দুই অবোধ নিষ্পাপ শিশুর ঘুম আর ভাঙলো না। বুকের টকটকে লাল রক্তে ভেসে গেল শিশুর নিশ্চিত নিদ্রার শয্যা। ৩ এপ্রিল ঢাকার উপকণ্ঠে জিঞ্জিরায় হানাদার দস্যু সৈন্যের বর্বরতার ফটো

২২তম সংখ্যার চারের পাতায় প্রকাশিত হয় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর একটি ছবি। যার ক্যাপশন ছিল এরকম: 'পশ্চিমবঙ্গ সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন'।

৩ ডিসেম্বর জয়বাংলার ৩০তম সংখ্যার তিনের পাতায় একটি ছবির ক্যাপশন এরকম: 'মুক্তাঞ্চলের এক অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব আবদুল মান্নান এমএনএ এবং অন্যান্য'।

১৪ ডিসেম্বর বিজয়ের প্রাক্কালে জয়বাংলার ৩২তম সংখ্যার প্রথম পাতায় ৫টি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, যার ৪টিই বিজয় উল্লাসের ছবি।

১৬ ডিসেম্বর ৩৩তম সংখ্যার শেষ পাতায় মুক্তিবাহিনীর ৪টি ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

২৪ ডিসেম্বর ৩৪তম ও শেষ সংখ্যার প্রথম পাতায় বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি ছাপা হয়। আর কোনো ছবি প্রকাশ পায়নি।

কার্টুন: ক্যারিকেচার কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র কোনো বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে। জয়বাংলা তার বিভিন্ন সংখ্যায় কার্টুন প্রকাশ করেছে। জয়বাংলার কার্টুনিস্ট

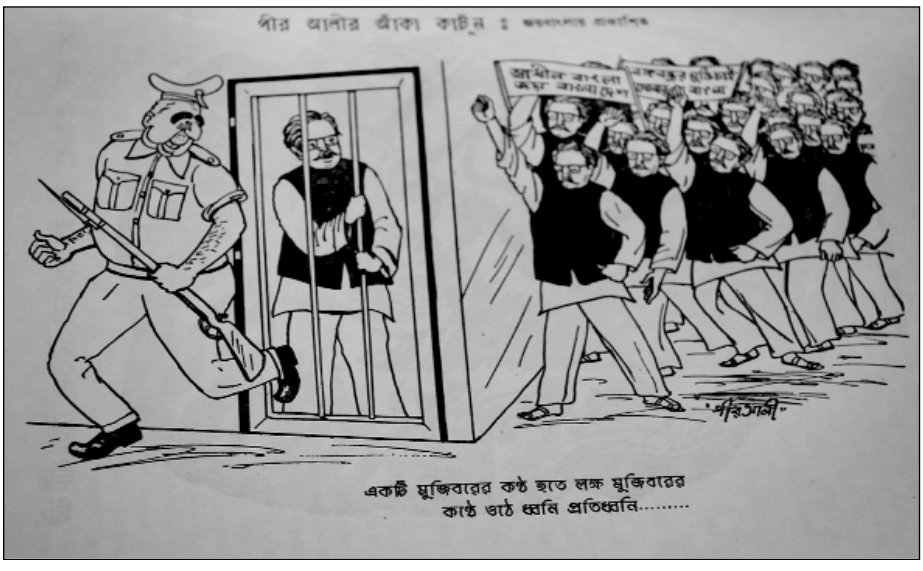

ছিলেন দুজন– পটুয়া কামরুল হাসান এবং শিল্পী পীর আলী। জয়বাংলায় প্রকাশিত বিখ্যাত একটি কার্টুন হলো ইয়াহিয়ার দানবীয় ছবি। কার্টুনটি এঁকেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান।

২ জুলাই জয়বাংলার অষ্টম সংখ্যায় পাঁচের পাতাজুড়ে এই কার্টুনটি প্রকাশিত হয়। যার ক্যাপশন ছিল: 'এই জানোয়ারটাকে হত্যা করতে হবে। তৃতীয় সংখ্যার আট পাতায় একটি কার্টুন প্রকাশ পেয়েছে, যার শিরোনাম: 'ইয়াহিয়া খানরা বলছে, বাংলাদেশে সব শান্ত'। ষষ্ঠ সংখ্যার আটের পাতায় আরও একটি কার্টুন প্রকাশ পেয়েছে, যার মূল বক্তব্য– 'অনেক লোকের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত'।

এছাড়া ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১৫তম, ২০তম, ২৪তম ও ৩০তম সংখ্যায় আরও কিছু কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে।

৬ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া একই সময় ভুটানও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। এ উপলক্ষ্যে জয়বাংলা একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, যাতে ইয়াহিয়ার কার্টুন প্রকাশিত হয়। এই কার্টুনের ক্যাপশন ছিল এরকম: 'এই জানোয়ারটি এখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে'।

১৬ ডিসেম্বর জয়বাংলার ৩৩তম সংখ্যায় দুটি কার্টুন প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে একটি কার্টুনে বন্দি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পাশে হাজার বঙ্গবন্ধুর মিছিল। এই কার্টুনের ক্যাপশন ছিল এরকম: 'এক মুজিবের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবের কণ্ঠে ওঠে ধ্বনি প্রতিধ্বনি।' এই কার্টুনটি এঁকেছিলেন পীর আলী।

আরেকটি কার্টুন ছিল ইয়াহিয়ার, যা সপ্তম পাতায় ছাপা হয়। এর ক্যাপশন ছিল: 'এই জানোয়ারটি বিতাড়িত হয়েছে'।

লক্ষ করলে দেখা যায়, জয়বাংলার সম্পাদক খুব সতর্কতার সঙ্গেই ছবি ও কার্টুনগুলো প্রকাশ করেছেন, যাতে এসব ছবি ও কার্টুন মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সাহস জোগায়, তাদেরকে শত্রুদের প্রতি ক্রোধান্বিত করে তোলে বা তারা আরও তেজদীপ্তভাবে যুদ্ধে এগিয়ে চলে। দেখা গেছে, পটুয়া কামরুল হাসান অঙ্কিত ইয়াহিয়ার সেই বিখ্যাত কার্টুনটি বেশ কয়েকবারই প্রকাশ করেছে জয় বাংলা। মূল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দেওয়া। মাত্র নয় মাসে আমাদের জয়লাভের পেছনে জয়বাংলায় প্রকাশিত এসব ছবি ও কার্টুনের যে অসামান্য অবদান রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পত্রিকার ভাষা

জয়বাংলার ভাষা ছিল খুব প্রাঞ্জল্য ও সহজসরল। সমসাময়িক অন্যান্য পত্রপত্রিকা যেখানে সাধু ভাষা ব্যবহার করত, সেখানে জয়বাংলা বেছে নিয়েছিল চলিত ভাষা। আবার চলিত ভাষা হলেও তা যেন সব অঞ্চলের মানুষ সমভাবে বুঝতে পারে জয়বাংলার কারিকরদের নজর ছিল সেদিকে। এ কারণে জয়বাংলা বাক্যগঠনে আঞ্চলিক ও জটিল শব্দ এড়িয়ে চলত। আবার নীতিগত দিক থেকেও জয়বাংলার কারিকররা ছিলেন অনেক বেশি সচেতন। এ কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোনো নির্যাতিত নারীর ছবি ও ঠিকানা জয়বাংলা প্রকাশ করেনি। কোনো অশ্লীল শব্দ বা বাক্যও জয়বাংলায় প্রকাশ পেত না। যুদ্ধের রণকৌশল হিসেবে অনেক সময় অনেক প্রপাগান্ডামূলক সংবাদ জয়বাংলা প্রকাশ করত। কিন্তু তাতেও ছিল ভদ্রতা ও রুচির পরিচয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস অবরুদ্ধ দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বের হয়েছে অনেক পত্রপত্রিকা। এসব পত্রিকা বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিপর্যায়ে প্রকাশিত হলেও সবারই মূল লক্ষ্য ছিল অবরুদ্ধ মানুষের মনোবল দৃঢ় রাখা। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের নৈতিক দৃঢ়তা সমুন্নত রেখে অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্পর্কে সবাইকে উজ্জীবিত রাখা। জয়বাংলা এসব পত্রিকার মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিল। কারণ সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হতো। এতে যারা কাজ করতেন আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন– এমন চিন্তা, ধ্যানধারণা তাদের কারোরই ছিল না, যা ছিল তা হলো– দেশপ্রেম আর দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রাণের আকুতি। জয়বাংলা তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ও যুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের এক অসামান্য দলিল।

তথ্যসূত্র

১. ইমামুর রশীদ, নিরীক্ষা, ১৫৩তম সংখ্যা, পৃ. ২৩
২. প্রাগুক্ত
৩. ইমামুর রশীদ, নিরীক্ষা, ৩৩তম সংখ্যা
৪. জয়বাংলা সংগ্রাহকের কথা
৫. জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ৩৪তম সংখ্যা, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
৬. জয়বাংলা, ৩১তম সংখ্যা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১
৭. প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জয়বাংলা, পৃ. ১০
৮. প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ৮
৯. ১৩ জুলাই ১৯৭১, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

লেখক: সহকারী সম্পাদক (ফিচার), পিআইবি

একাত্তরের ফটোসাংবাদিকতা ও মিশেল লরেন্ট

মিনহাজ উদ্দিন

১৯৭১ সালে মার্চের উত্তাল দিনগুলোয় পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রে কমবেশি গণমানুষের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ছিল। এমনকি মর্নিং নিউজ ও সংগ্রামের মতো পত্রিকাও আন্দোলনের পক্ষে সুর মিলিয়েছে। তবে অসহযোগ আন্দোলনে দৈনিক ইত্তেফাকের পাশাপাশি ইতিবাচক সাহসী ভূমিকা রাখে আবিদুর রহমান সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পিপল'। এই পত্রিকাই প্রথম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে 'অকুপেশন আর্মি' হিসেবে উল্লেখ করে। (রায়, ২০১৫)। উত্তাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ও পরের দিনগুলোয় ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক, মুজিব-ভুট্টো বৈঠক ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদপত্রগুলো বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে ছবিসহ। ওই সময় ফটোসাংবাদিক রশীদ তালুকদার, আফতাব আহমদ, আনোয়ার হোসেন ও এসএ হাদির তোলা ছবি দৈনিক ইত্তেফাকসহ অন্যান্য সংবাদপত্রে ছাপা হতো। যাতে প্রতিফলিত হতো আন্দোলন-সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। ওই সময় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে কাঁধে রাইফেল নিয়ে মার্চ করে চলা নারীদের একটি মিছিলের ছবি আলোড়ন তুলেছিল। ইত্তেফাকের জন্য রশীদ তালুকদারের তোলা ওই ছবি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের একটি বিশেষ 'আইকন' হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে।

মুক্তিকামী ও স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেওয়া এই সংবাদমাধ্যমের প্রতি পাকিস্তানি জান্তাদের আক্রোশ ছিল প্রবল। সে কারণেই ক্র্যাকডাউনের শুরুতেই আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলো। বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয় দ্য পিপল ও দৈনিক ইত্তেফাক। পুড়িয়ে দেওয়া হয় সংবাদ অফিস। যাতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারান সাংবাদিক শহীদ সাবের (রায়, ২০১৫)। লেখককে এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক আবেদ খান জানিয়েছেন, ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে ইত্তেফাক অফিসে পাকিস্তানি সেনা কনভয় থেকে দুইবার ব্রাশফায়ার করা হয়। মারা যায় পত্রিকাটির এক অফিস সহকারী ও এক হকার। বর্বর ওই আক্রমণের পর সংবাদমাধ্যমের ওপরও নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয় (আবেদ খানের সাক্ষাৎকার : ২০১৯)। ২১ মে থেকে দৈনিক ইত্তেফাক নতুন করে প্রকাশিত হলেও ১৯৭১ সালে আর প্রকাশিত হতে পারেনি সংবাদ ও পিপল। আর অন্য যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হতো, তাতে সংবাদ ও ছবি প্রকাশে ছিল

প্রবল কড়াকড়ি। পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের প্রতাপশালী কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিকের অনুমোদন ছাড়া কিছুই প্রকাশিত হতো না। ছবি, সংবাদ– কিছুই না। তাই অবরুদ্ধ সময়ে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ছবি, পাকিস্তানি গণহত্যার ছবি প্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। তবে সেজন্য রশীদ তালুকদার ও আফতাব আহমদদের ক্যামেরার লেন্স বন্ধ থাকেনি। তাঁরা ছবি তুলেছেন, যা স্বাধীনতার পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পরিণত হয়েছে ঐতিহাসিক দলিলে।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ও ফটোসাংবাদিকতায় বিধিনিষেধ, ভয়ভীতি থাকলেও মুক্তাঞ্চলে বা শরণার্থীশিবিরগুলোতে সাংবাদিকতায় কোনো বাধা ছিল না। একটি জাতির মুক্তিসংগ্রাম, মানবিক বিপর্যয়ের ছবি খুবই সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলেছেন বিশ্বের অনেক গুণী ফটোসাংবাদিক। যাদের অন্যতম ছিলেন রঘু রায়। ১৯৭১ সালে তিনি ভারতের প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর প্রধান ফটোসাংবাদিক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর তোলা ছবিগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের অনন্য দলিল হিসেবে আজও সমাদৃত। স্বাধীন বাংলাদেশে ফটোসাংবাদিকতার প্রথম আলোচিত ছবিগুলো তোলা হয় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের। রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। যে সংবাদ-ছবিগুলো শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ছবিগুলো তুলেছিলেন ঢাকায় অবস্থানরত এপি'র ফটোসাংবাদিক ও দৈনিক ইত্তেফাকের রশীদ তালুকদার, আফতাব আহমদসহ অন্যরা। এছাড়া বিদেশি কিছু ফটোসাংবাদিক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও পাকিস্তানি গণহত্যার ছবিই তোলেননি, পুরোদস্তুর সাংবাদিক হিসেবেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। যাঁদের অন্যতম ফরাসি নাগরিক, এপি'র ফটোসাংবাদিক মিশেল লরেন্ট।

রাইফেল কাঁধে মেয়েদের দৃপ্ত পদক্ষেপে রাজপথ প্রদক্ষিণ। ছবি: রশীদ তালুকদার

একজন মিশেল লরেন্টের ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ নিয়ে আঁতকে দেওয়ার মতো একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছিল প্রভাবশালী সাময়িকী টাইমে। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ প্রকাশিত সংবাদটির শিরোনাম ছিল: 'At Dacca University Burning Bodies of Students Still Lay In Their Beds … A Mass Grave Had Been Hastily Covered …' এর প্রতিবেদক ছিলেন মিশেল লরেন্ট।

প্রসঙ্গত, মিশেল টাইম ম্যাগাজিনের সংবাদকর্মী ছিলেন না। তিনি মূলত ছিলেন এপি'র (অ্যাসোসিয়েট প্রেস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদ সংস্থা) ফটোগ্রাফার। টাইম ম্যাগাজিনে এই প্রতিবেদনটি এপি'র বরাত দিয়েই ছাপা হয়েছিল।

একজন যুদ্ধ-ফটোসাংবাদিক হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ছিলেন মিশেল। পেয়েছেন পুলিৎজার পুরস্কারও। টাইম ম্যাগাজিনে তাঁর বরাত দিয়ে ওই প্রতিবেদনটি ছাপানোর অন্যতম কারণ ছিল– তিনি ছিলেন ঢাকার বুকে সংঘটিত গণহত্যার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর মাত্র দুজন বিদেশি সাংবাদিক পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের একজন এই মিশেল লরেন্ট এবং অন্যজন টেলিগ্রাফের সায়মন জন ড্রিং। সায়মন ও মিশেল ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেন। হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালের

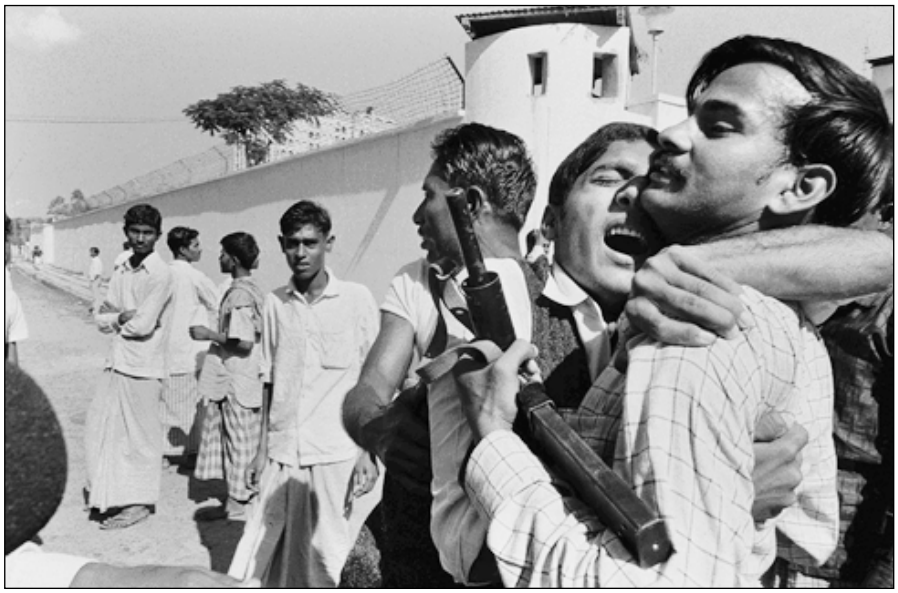

বিজয়, ১৬ ডিসেম্বর। ছবি: রঘু রায়

কর্মীদের সহযোগিতায় পাঞ্জাবি গায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পুরান ঢাকায় যে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, মিশেলের দেওয়া সেই বর্ণনা অনুসারেই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিল টাইম (মিনহাজ, ২০১৬)।

প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের হত্যাযজ্ঞের প্রসঙ্গে মিশেল বলেন, 'At the university burning bodies of some students still lay in their dormitory beds. The dormitories had been hit by direct tank fire. A mass grave had been hastily covered at the Jagannath College (*Actually, Jagannath Hall of Dhaka University*) and 200 students were reported killed in Iqbal hall. About 20 bodies were still lying in the grounds and the dormitories. Troops are reported to have fired bazookas into the medical college hospital, but the casualty toll was not known.' (page: 166, Assignment Bangladesh '71, 1999).

সায়মন, মিশেল ও একজন সিদ্দিক সালিক

২৫ মার্চ রাতের ক্র্যাকডাউট, ঢাকার গণহত্যা ও হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালের পরিস্থিতি নিয়ে

লেখকের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে সায়মন জন ড্রিংয়ের। ২০১৩ সালে সায়মন যখন যমুনা টেলিভিশনে উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত ছিলেন, তখন লেখক ওই টিভি স্টেশনে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেসময় সায়মন ড্রিং লেখককে জানান, ২৬ মার্চ ছিল কারফিউ। থমথমে, ভীতিকর পরিস্থিতি। ওইদিন বিকালে হোটেলে আসেন মেজর সিদ্দিক সালিক। তিনি ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার। পাকিস্তানি সরকারের প্রেস লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন তিনি। শতাধিক বিদেশি রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, ভিডিও জার্নালিস্টকে কৌশলে দেশ ছাড়ার হুমকি দেন মেজর সিদ্দিক সালিক। তিনি বলেছিলেন– এটা একটা গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি। এখানে থাকা খুবই ভয়ংকর। আমরা তোমাদের নিরাপত্তার কথাই ভাবছি! তোমাদের এখানে (ঢাকায়) থাকা নিরাপদ নয়।

মিশেল লরেন্ট

মেজর সালিকের হুমকি উপেক্ষা করে হোটেলে থেকে যান সায়মন। পরে তিনি জানতে পারেন– আরও একজন লুকিয়ে আছেন, তিনি ফটোসাংবাদিক মিশেল লরেন্ট। মিশেলের কথা জানতে পেরে সায়মন খুশি হন। ভেবেছিলেন একজন প্রতিবেদক ও একজন ফটোগ্রাফার মিলে ভালো কাজ করা যাবে। ২৭ মার্চ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই দুজনই বের হয়েছিলেন একসঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরান ঢাকায় দেখেছিলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বীভৎসতা। প্রচুর ছবি তুলেছিলেন মিশেল। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের গণহত্যার ছবি ও জহুরুল হক (সাবেক ইকবাল হল) হলের হত্যাযজ্ঞের ছবি।

সেসময় ঢাকার রাস্তায় টহল দিচ্ছিল পাকিস্তানি সেনারা। অবরুদ্ধ ঢাকায় তখন ত্রাসের রাজত্ব। কাজ শেষ করে জহুরুল হক হলের সামনে একটি টহল দলকে দেখতে পান সায়মন ও মিশেল। সায়মনের ধারণা, ওই টহল দল তাদের দেখে ফেলেছিল। পরে হয়তো তারাই তথ্যটি জানিয়েছিল মেজর সিদ্দিক সালিককে। তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের দুঃসময় (মিনহাজ, ২০১৬)।

হারিয়ে যাওয়া সেই গণহত্যার ছবির রিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ফেরার পর সায়মন ও মিশেলের প্রধান চিন্তা ছিল কীভাবে ঢাকা ত্যাগ করা যায়? কারণ তাদের হাতে তাজা প্রতিবেদন আর দুর্দান্ত সব ছবি ছিল, যা পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার জ্বলন্ত প্রমাণ। ওই সময় দেশত্যাগের জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ টিকিটের বিপরীতে নম্বর স্লিপ দিত, যে স্লিপ তাদের ছিল না। হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালের বাঙালি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় সায়মন ও মিশেল এক জার্মান নাগরিকের কাছ থেকে দুটি নম্বর স্লিপ জোগাড় করেন।

তখন মিশেল ও সায়মনের মূল চিন্তা ছিল তাদের ক্যামেরা, ফিল্ম ও রিপোর্টের নোটগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে। তারা সহযোগিতার জন্য প্রথমে যান ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশনে। কিন্তু দূতাবাস কর্মকর্তা তাদের জানান, কোনোভাবেই কিছু করা সম্ভব নয়। সেখান থেকে তারা যান জার্মান অ্যাম্বাসিতে। এখানে তারা সহায়োগিতার আশ্বাস পান। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ ডিপ্লোমেটিক ট্যাগ লাগিয়ে মিশেলের ফিল্মগুলো পাঠাতে রাজি হয়েছিল। সেই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে মিশেল গণহত্যার ছবি তোলা অর্ধেক ফিল্ম (৯ রোল ছবি) জার্মান অ্যাম্বাসিতে জমা দিয়ে আসেন। অ্যাম্বাসি কর্তারা জানিয়েছিল, বনে (তৎকালীন জার্মানির রাজধানী) পৌঁছার পর তারাই এপি'কে ফোন করবে। আর এপি কর্তৃপক্ষ ছবির ফিল্মগুলো নিয়ে যাবে।

সায়মন ড্রিং লেখককে জানিয়েছেন, ওই রিলগুলো আর বনে পৌঁছায়নি। তাদের ধারণা, মেজর সিদ্দিক সালিক সব জেনে গিয়েছিলেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সেসময় হয়তো সব ডিপ্লোমেটিক ডকুমেন্ট আলাদা করে সার্চ করেছিল, তাতেই হয়তো জব্দ হয় গণহত্যার ছবির রিলগুলো। আর মিশেলের কাছে থাকা বাকি ছবির রিলগুলো জব্দ হয়েছিল করাচি বিমানবন্দরে। সেখানে তাদের কঠিন তল্লাশির মুখে পড়তে হয়েছিল। একেবারেই বিবস্ত্র করে পাকিস্তানি সেনারা তাদের তল্লাশি করেছিল।

প্রথম দফায় ঢাকা-করাচি-কলম্বো রুটে নানা ঝক্কিঝামেলা পার হয়ে ব্যাংকক পৌঁছেছিলেন সায়মন ও মিশেল। সেখান থেকেই তারা প্রতিবেদন লেখেন। মিশেলের বরাত দিয়ে এপি প্রতিবেদন তৈরি করে। আর সায়মন টেলিগ্রাফের জন্য লেখেন 'Casualties like to be heavy' শিরোনামে তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদনটি। মিশেল লরেন্ট ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত হন। সায়মন ড্রিং জানিয়েছেন, ভিয়েতনামে যোদ্ধারা কাছে থেকে গুলি করে মিশেলকে হত্যা করে। আর মিশেলই ছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত শেষ সাংবাদিক।

তথ্যসূত্র

১. Assignment Bangladesh '71, (1999), A Compilation by Maudood Elahi, Dhaka: Momim Publications.
২. মিনহাজ, রাহাত (২০১৬), সায়মন ড্রিং ও অন্যান্যের একাত্তর, ঢাকা: শ্রাবণ।
৩. সায়মন ড্রিং, সাক্ষাৎকার, নভেম্বর, ২০১৩।
৪. আবেদ খান, সাক্ষাৎকার, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৫. রায়, সুধাংশু (২০১৫), রিপোর্টিং, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সন্ধানে ...

জাফর ওয়াজেদ

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক উজ্জ্বল ইতিহাস। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী অধ্যায়। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কত কঠিন সংগ্রাম আর আত্মদান করতে হয়েছে, জানে তা বাঙালি। কিন্তু এই অবদানচিত্র ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। 'বাঙালির ইতিহাস নাই' বলে এককালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন। আর আজ বাঙালিকে দুঃখ করতে হয় মুক্তিযুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ৪৮ বছরেও রচিত হয়নি বলে। সেই ত্রিশের দশকের বিপ্লবীদের স্মরণে গাওয়া গানের মতো, 'মুক্তির মন্দিরে সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।' বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবলই অশ্রুজলে লেখা। তথ্য ও গবেষণাসমৃদ্ধ তেমন কোনো কাজ হয়নি বলে একালের প্রজন্ম জানে না সঠিক ইতিহাস, সঠিক তথ্য। অথচ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা যাবে না বলে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বারবার উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাদের উপলব্ধিতে আসে না যে, ইতিহাস রচিত হয়নি বলেই বারবার বিকৃতির শিকার হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার কাজটি হয়েছে দুই যুগের বেশি সময় ধরে। আর সে কারণেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইতিহাস পৌঁছেনি। রচনার কাজ প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে পড়ে। পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক জান্তাশাসক ও তাদের উত্তরসূরিরা একদিকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার পথটি রুদ্ধ করে দিয়ে বিকৃত এক ইতিহাসকে উপস্থাপন করেছিল। তারা গণহত্যাকারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হানাদার হিসেবে উচ্চারণেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। নানা বিভ্রান্তির বেড়াজাল ও বিভ্রমের কুয়াশায় মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও আদর্শ এবং অঙ্গীকারকে ভূলুণ্ঠিত করে পাকিস্তানি ভাবধারায় দেশকে যেভাবে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল হানাদারদের দোসর যুদ্ধাপরাধীরাও সমাজ ও রাজনীতিতে। একাত্তরের পরাজিত শক্তিরা ক্ষমতার অলিন্দে বসে জনমত থেকে মুক্তিযুদ্ধের সবকিছু মুছে দিতে চেয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানি, নির্যাতন, গ্রেফতার, গুম, হত্যা– সবই চালিয়েছে সামরিক জান্তাশাসক। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের দ্রুতগামী সময়ের প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সুনির্দিষ্ট তথ্যাবলি সংগ্রহ ও বিচারবিশ্লেষণের ক্ষেত্রগুলো নানাভাবে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়েছে। সামরিক জান্তা শাসনামলে 'মুক্তিযোদ্ধা' পরিচয় প্রদানও ছিল বিপজ্জনক। তাই বিস্ময়কর ও বেদনাদায়কভাবে বাঙালির ইতিহাস রচনায় সম্ভাবনার ক্যানভাসটিকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বহু দলিলদস্তাবেজ জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ

রাজনৈতিক দলের অবস্থান বহাল থাকায় ইতিহাস রচনার কাজ সহজসাধ্য হয়ে উঠছে না। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই নয় মাসকে সৃষ্টি করেছে আর কতদিন, কত মাস, কত বছর– তার আদ্যোপান্ত তথ্য অদ্যাবধি সংগ্রহ করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বাপর ইতিহাস যথাযথভাবে তুলে না আনায় প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রটি আসলেই বিশালাকার। এর বিস্তৃতি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছিল। বিশ্বের আর কোনো স্বাধীনতা-সংগ্রামে এভাবে তৃণমূল থেকে যোদ্ধা তৈরি হওয়ার ঘটনা জানা যায় না। বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, নারী, সাধারণ গৃহস্থ, দিনমজুররাও এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যে কারণে পুরো মুক্তিযুদ্ধই ছিল জনযুদ্ধ। সাধারণ মানুষ, খেতে না পাওয়া মানুষও মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছে, তা অতুলনীয়। জনসম্পৃক্ততার সেসব ইতিহাস অপ্রকাশিতই থেকে গেছে।

সাড়ে সাত কোটি প্রাণপ্রহরী প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠেছিল একাত্তরে নেতার একটি ডাকে, অঙ্গুলি হেলনে। ভাষা আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান হয়ে একাত্তর এসেছিল জাতির জীবনে। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল স্বপ্ন ও বাস্তবের দোলাচল। এই দোলাচল থেকে নতুন প্রজন্মকে মুক্ত করতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শেষাবধি আত্ম-অস্বীকারের চেতনায় পরিণত হওয়ার দিকেই ধাবিত হবে। পরাজিত শক্তি নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুদ্ধতম ধারণাকে পর্যুদস্ত করেছে। সেই শুদ্ধতম ধারণাকে বলিষ্ঠতম কাঠামোর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন, মূলত প্রত্যক্ষভাবে আদর্শ ও অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের নানা গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা সংকলিত হয়নি। ফলে মুক্তিযুদ্ধের একটি বিন্যস্ত চিত্র পাওয়া যায় না।

> গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই নয় মাসকে সৃষ্টি করেছে আর কতদিন, কত মাস, কত বছর– তার আদ্যোপান্ত তথ্য অদ্যাবধি সংগ্রহ করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বাপর ইতিহাস যথাযথভাবে তুলে না আনায় প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে

স্বাধীনতার পরপরই ইতিহাস রচনার কাজটি শুরু করা যায়নি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায়। পরবর্তীকালে হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের দলিলপত্র সংগ্রহ ও গ্রন্থভুক্ত করার কাজ চলে। তারা পনেরো খণ্ডে যে দলিলগুলো উপস্থাপন করেছেন, তা-ও সংগৃহীত তথ্যের একটি অংশমাত্র। বাকি হাজার হাজার তথ্য গায়েব হয়ে গেছে। বস্তাবন্দি সেসবের কিছু উইপোকায় কেটেছে। কয়েক বছর পরিশ্রম করে তারা যে সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন, সেসব গ্রন্থভুক্ত হলে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজ এগিয়ে যেত। এই কাজের পর আসলে আর কোনো কাজ হয়নি। এসব কাজ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া করা অসম্ভব। সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে বা যৌথভাবে কিংবা সরকারের একক উদ্যোগেও হতে পারে ইতিহাস রচনার কাজ। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন ১৯৯৭ সালের দিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণার কাজে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৃক্ত ইনস্টিটিউট গড়ার কাজটি শুরু করেছিলেন। কিন্তু জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায় এসে বন্ধ করে দেয় সব কাজ। বাংলা একাডেমি জেলাভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। কিন্তু জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায় এসে এই প্রকল্পটিও বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে তথ্য সংগ্রাহকরা প্রকাশকদের মাধ্যমে বইগুলো প্রকাশ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পাঁচ হাজারের বেশি গ্রন্থ রয়েছে। অধিকাংশই বর্ণনা, স্মৃতিচারণ ও তথ্যের। সে অর্থে গবেষণা হয়নি খুব একটা। সবচেয়ে বড়ো ঘাটতি রয়েছে একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধীসহ স্বাধীনতাবিরোধীদের বিষয়ে। ৪৮ বছর পার হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত রাজাকারের পূর্ণাঙ্গ তালিকাই তৈরি হয়নি। তবে আশার কথা– এবার এই তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ সরকার নিয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিস্তারিত ঘটনা নিয়েও বই তেমন একটা নেই। গবেষণার সুযোগ থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের অভাবে কাজ হচ্ছে না। যুদ্ধাপরাধী রাজাকার ও দালালদের নিয়ে গবেষণারত শাহরিয়ার কবির যেমনটা জানালেন– স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানপন্থিরাই বেশি সময় দেশের শাসনক্ষমতায় থেকে ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতায় এসে মৌলবাদী জামায়াত-বিএনপি প্রকৃত ইতিহাস মুছে ফেলে দেখাতে চেয়েছে পাকিস্তান নয়, ভারতই হলো বাংলাদেশের শত্রু। সঠিক ইতিহাস না থাকায় এই অপপ্রচার এখনো চলছে। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের মতে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যখন বর্ণিত হয়, তখন সম্মুখযুদ্ধগুলোর ওপরই গুরুত্বারোপ করা হয়। গেরিলাযুদ্ধের প্রতি ততটা নয়। এগারোটি সেক্টরে যে যুদ্ধ হয়েছিল অন্তিমে, সেটিই হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কাঠামো। যে ইতিহাস লেখা হয় তাতে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা থাকে অস্পষ্ট। বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ইতিহাসবিদ এবং ইতিহাস রচনা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি চ্যালেঞ্জও বটে। এই ইতিহাস রচনার পদ্ধতি কী হবে, সে ব্যাপারেও কোনো প্রখ্যাত পণ্ডিত এখন পর্যন্ত কোনো গ্রহণযোগ্য দিকনির্দেশনা দেননি। এই ইতিহাস যথাযথভাবে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে লিখতে হলে এবং এর অনন্য স্রষ্টা কৃষকসন্তান ও ব্রাত্যজনের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে হলে ফিল্ডওয়ার্ক পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। ইতিহাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষকরা এ ধরনের কাজ অদ্যাবধি করেননি। প্রয়োজন মাঠপর্যায়ে বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুধু রণাঙ্গনের ইতিহাস নয়। এর আরও অনেক দিক রয়েছে। সেসব উদ্ঘাটনের কাজ অপর্যাপ্ত। সংবাদপত্র এক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা পালন করে আসছে নব্বই-পরবর্তীকাল থেকে। অবশ্য দৈনিক জনকণ্ঠ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিল মুক্তিযুদ্ধের অনেক তথ্য। যার মধ্যে কুমিল্লার রসুলপুর বধ্যভূমি নিয়ে লেখা প্রকাশের পর সেখানে স্মৃতিসৌধ করা হয়। এই লেখার কাজে জড়িত সাংবাদিক ও গবেষক এবং শিশুসাহিত্যিক মোস্তফা হোসেইন জানান, তথ্য সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সময় লাগতেই পারে। তবে যেভাবে ধীরগতিতে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমন্বয়হীন কাজ হচ্ছে তাতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা শেষ হবে কি না, এ নিয়ে সংশয় রয়েছে। একাত্তরের প্রজন্ম ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার কারণে এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করায় তথ্য সংগ্রহের কাজ দুরূহ হয়ে পড়ছে। যারা বেঁচে আছেন, তাদের কাছ থেকে দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকতার অভাবে তা করা যাচ্ছে না। অনেক দলিলপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের স্মারকও। মুজিবনগর সরকারের অনেক দলিলপত্র যুদ্ধ শেষে দেশে আনা হয়নি। সামরিক বাহিনীর কোনো দলিলও বেসামরিক পর্যায়ে দেওয়া হয়নি। প্রতিশ্রুতি থাকলেও মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক আফসান চৌধুরী শঙ্কিত যে, ইতিহাসচর্চার যে সম্পদ বা রসদ লাগে, এর অন্তিমলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এরপর আলোচনা হতে পারে, বিশ্লেষণ হতে পারে; কিন্তু মৌলিক ইতিহাস গবেষণা সম্ভব না-ও হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব লেখা পাওয়া যায়, এর অধিকাংশই যুদ্ধ সংক্রান্ত। মুজিবনগর সরকার নিয়ে সে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এইচটি ইমাম দলিলপত্রসহ বেশ বড়োসড়ো প্রশ্ন লিখেছেন, যা গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। শরণার্থী জীবন ও সমস্যা নিয়ে কিছুই লেখা হয়নি। ভারত সরকারের ভূমিকা, যুবশিবির, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ভূমিকা, প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা, স্বদেশে আটকে পড়া বাঙালিদের ওপর বর্বরতা, দালালি ইত্যাকার বিষয় নিয়ে কোনো কাজ হয়নি।

আজকের প্রজন্মের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর ইতিহাসের কিছুই জানে না। জানার সুযোগও নেই। শুধু ৭ মার্চের ভাষণ শুনে একটা কাঠামো হয়তো তারা দাঁড় করায়। আমাদের সৌভাগ্য যে, ওই ভাষণে পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসের রূপরেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এত বিশাল মুক্তিযুদ্ধের অনেক দিকই তাদের অজানা। যে কারণে একাত্তরের দালাল, রাজাকাররা জনজীবনে মিশে যেতে পারছে। তাদের নামে স্থাপনা হচ্ছে। একাত্তরের ঘাতক দালালরাও মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম ওঠাতে পারছে।

দেশ, জাতির স্বার্থে সরকারের উচিত দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ, যাতে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হতে পারে। নতুবা সবই বৃথা আস্ফালনে পরিণত হবে। বীরের জাতির অবস্থান ক্রমশ নিম্নমুখী হবে, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস রচনা যাদের দায়িত্ব, তাদের উদাসীনতা-অবহেলা ক্ষমার অযোগ্য অবশ্যই।

লেখক: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

চরণ ছুঁয়ে যাই

বাঙালির জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। পেছনে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের ইতিহাস। সেই লড়াই-সংগ্রামের বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটিতে সাংবাদিক সমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন প্রাণের তোয়াক্কা না করেই তাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। কেউ আবার সরাসরি হাতে তুলে নিয়েছেন অস্ত্র। এই ভূমিকাই তাঁদের নিয়ে আসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তার এদেশীয় দোসরদের রোষের কেন্দ্রে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেই রোষের শিকার হয়ে নির্মমভাবে প্রাণ হারানো শহিদ সাংবাদিকদের কথা জানাচ্ছেন– **পপি দেবী থাপা**

সিরাজুদ্দীন হোসেন

সিরাজুদ্দীন হোসেনের জন্ম ১৯২৯ সালের ১ মার্চ মাগুরা জেলার শালিখা থানার শরুশুনা গ্রাম। সাংবাদিকতা জীবনের শুরু ইংরেজ আমলের শেষের দিকে। দেশমাতৃকার সব লড়াই-সংগ্রামে তাঁর কলম ছিল সক্রিয়। ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী ও বার্তা সম্পাদক। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে রেখেছেন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা। ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহপাঠী।

আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ছিল যোগাযোগ। দিয়েছেন সঠিক পরামর্শ। জানিয়েছেন বিবৃতি পেস্টিং হওয়ার খবরও। ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা এলে মানুষকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে একের পর এক জ্বালাময়ী রিপোর্ট প্রকাশ করে ইত্তেফাক। যার নেপথ্য কারিকর সিরাজুদ্দীন হোসেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে প্রবাসী সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন গোপন তথ্য। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর রাজাকার-আলবদরের একটি দল তাঁকে শান্তিনগরের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর।

তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'যাঁহারা ইতিহাস রচনার যোগ্যতা রাখেন, শহীদ সাংবাদিক

সিরাজুদ্দীন হোসেন তাঁহাদের অন্যতম। সিরাজের রক্তসিক্ত মাটিতে আমরা সোনার ফসল ফলাইব। শহীদ সিরাজ উপার্জনকে বড় করিয়া দেখেন নাই, বরং সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনগণের সেবা করিয়াছেন।'

শহীদুল্লা কায়সার

বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র শহীদুল্লা কায়সারের জন্ম ১৯২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী জেলায়। পুরো নাম আবু নইম মোহাম্মদ শহীদুল্লা। পিতা মওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ ছিলেন কলকাতার মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যাপক। মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন, উচ্চশিক্ষিত না হয়েও সেসময়ের নারী আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ছিলেন যুক্ত। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় শহীদুল্লা কায়সার জড়িয়ে পড়েন বামপন্থি ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে। অসাধারণ বাগ্মিতা আর লেখনীশক্তি তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে পার্টি এবং সাধারণ মানুষের কাছে। অর্থনীতিতে এমএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হওয়ার কারণে ১৯৫২-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত থাকতে হয়েছে কারাগারে। ১৯৫৬ সালে সেখান থেকে বেরিয়ে যোগ দেন 'দৈনিক ইত্তেফাকে'। এরপর ১৯৫৮ সালে 'সংবাদ'-এ সহকারী সম্পাদক পদে। পরবর্তী সময়ে কর্মদক্ষতার গুণে যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পান। সংবাদে তিনি দেশপ্রেমিক ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' এবং বিশ্বকর্মা ছদ্মনামে 'বিচিত্র কথা'– এই দুটি জনপ্রিয় কলাম লিখতেন। 'কবে পোহাবে বিভাবরী' উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের পুরোটা সময়ে লেখা।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১। 'সংবাদ'-এর যে সংখ্যাটি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হবে তার হেডলাইন, বিষয় ইত্যাদি নিয়ে খসড়া ডামি করছিলেন। সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনীর ৭-৮ জন অস্ত্রধারী সদস্য ২৯নং কায়েতটুলীর বাড়ি থেকে নিয়ে যায় শহীদুল্লাকে। যাওয়ার আগে স্ত্রী পান্না কায়সারকে বলেন, 'আমার জন্য ভেবো না, আমি ফিরে আসব। স্বাধীন বাংলাদেশের সূর্যোদয় আমাকে দেখতেই হবে।' তিনি আর ফিরে আসেননি কখনো। খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁর লাশও।

খোন্দকার আবু তালেব

জন্ম ১৯২১ সালের ২৩ মার্চ সাতক্ষীরার সদর থানার সাতানি গ্রামে। বাবা খোন্দকার আবদুর রউফ, মা রোকেয়া খাতুন। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে সব আন্দোলনে ছিলেন বলিষ্ঠ কর্মী। ১৯৪৮ সালে সাংবাদিকতা পেশায় আগমন দৈনিক আজাদের সহ-সম্পাদক হিসেবে। এরপর সংবাদের সহ-সম্পাদক। চিফ রিপোর্টার হন দৈনিক ইত্তেফাকের। ১৯৬৬তে হলেন সান্ধ্য দৈনিক আওয়াজ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। এরপর দৈনিক পয়গামের ফিচার সম্পাদক। এসব কিছুর মাঝে অল্প সময়ের জন্য দৈনিক ইনসাফ, পাকিস্তান অবজারভার, মর্নিং নিউজ এবং দৈনিক ইত্তেহাদেও কাজ করেন। তিনি ছিলেন নতুন সাংবাদিক গড়ার কারিকর। বাংলাদেশের সাংবাদিক ইউনিয়নের জন্ম ও বিকাশের জন্য যাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৬১-৬২ সালে। ১৯৬৬তে ইংরেজিতে প্রণীত ছয় দফা, ১৯৭০-এর আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের অনুবাদও করেছিলেন তিনি। বই ছিল নিত্যসঙ্গী। রবীন্দ্রসাহিত্যের সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। থাকতেন ঢাকার মিরপুরের ১০ নম্বর সেকশনের বি-ব্লকের ২ নম্বর রোডে। ২৬ মার্চের আগে থেকেই বাঙালিদের প্রতি চলছিল সেখানকার বিহারিদের হুমকি, অত্যাচার। ২৪ মার্চ তিনি পরিবারের সবাইকে চামেলীবাগে বোনের বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য নিজে থেকে যান মিরপুরে। কারণ বঙ্গবন্ধু স্বয়ং তাঁকে মিরপুরে থেকে সেখানকার খবরাখবর জানাতে বলেছেন। রাতে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে তিনি চলে যান বোনের বাসায়। পরিবারের সবার অনুরোধে আপাতত মিরপুরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেখানকার খবরাখবর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। ২৯ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর মেয়ে সখিনা খোন্দকারের ভাষ্য থেকে জানা যায়, সেদিন অফিসে যাওয়ার পথে ইত্তেফাকের অবাঙালি চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট আবদুল হালিমের সঙ্গে দেখা হলে সে তাঁকে গাড়িতে করে মিরপুরে নিয়ে গিয়ে কাদের মোল্লার হাতে তুলে দেয়। সেখানেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাঁকে।

নিজামুদ্দীন আহমদ

১৯২৯ সালে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং থানার মাওয়া গ্রামে জন্ম নেওয়া নিজামুদ্দীন আহমদ ছিলেন সাহসী আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক বলিষ্ঠ সাংবাদিক। বাবা সিরাজুল ইসলাম ছিলেন জাহাজের অডিট অফিসার। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাবস্থায় সাংবাদিকতার শুরু। ১৯৫০ সালে করাচি থেকে প্রকাশিত 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট' পত্রিকায়, এরপর দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক আজাদ, ঢাকা টাইমস, পাকিস্তান অবজারভার, এপিপি, এএফপি, রয়টার, ইউপিআই নামক সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় কাজ করেন। ঢাকায় প্রথম এপিপি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৯৫৮ সালে। ১৯৫৯ সালে যোগ দেন পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনালে। ১৯৬৪ সালে পিপিআইয়ের সম্পাদক হন। এখানে কাজ করার সময় তিনি বেশ কয়েকটি বিদেশি সংস্থার পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে যোগ দেন নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ২৫তম অধিবেশনে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরে ছাত্রদের ১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানে কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রতিটি আন্দোলনের খবর বিদেশি সংবাদমাধ্যমে পাঠাতেন গুরুত্বের সঙ্গে। ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত সহচর। পাকিস্তানের দুই অংশের সব রাজনৈতিক খবর সরবরাহ করতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। ২৬ মার্চ খুব ভোরে পরিবারের বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে পড়েন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়া ঢাকা শহরে। যতটা সম্ভব গণহত্যার সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলো পাঠান আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধি ম্যাক ব্রাউনসহ অন্য বিদেশি সাংবাদিকদের মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ডসহ গণহত্যার তথ্য ও ছবি সংগ্রহের জন্য নিয়ে যেতেন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আরোপিত কড়া সেন্সরশিপের মধ্যেও তিনি দেশের অভ্যন্তরের ঘটনা এবং যুদ্ধের যাবতীয় বর্ণনা নিয়মিত বিবিসিসহ অন্যান্য বিদেশি গণমাধ্যমে সরবরাহ করেছেন, যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে। মুক্তিবাহিনীকে সহায়তাসহ ভারতে অবস্থানরত রাজনীতিকদের সঙ্গে রাখতেন যোগাযোগ। আর এসব কারণে জেনারেল রাও ফরমান আলীর দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুবার ডেকে নিয়ে সতর্ক করা হয়। নিরাপত্তার কারণে তখন রাতে থাকতেন হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। তিনি কৌশলে তা এড়িয়ে যান।

১২ ডিসেম্বর পুরান ঢাকার ১২ নম্বর রোকনপুরের বাসা। দুপুরের খাবার খাচ্ছেন নিজামুদ্দীন। দরজায় ঘাতকের কড়া নাড়ার শব্দ। আর্মি আর আলবদর বাহিনীর লোকজন তাঁকে হাত ধোয়ার সময় না দিয়েই সামনে-পেছনে দুটি রাইফেল উঁচিয়ে বাসা থেকে বের করে। গায়ে থাকা গেঞ্জি ছিঁড়ে চোখ বেঁধে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে গাড়িতে তোলে। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর।

এসএ মান্নান (লাডু ভাই)

জন্ম ১৯২৮ সালে কলকাতায় এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ডাকনাম লাডু। বাবা শেখ আবদুল গণি ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। মা আঞ্জুমানআরা বেগম। দেশভাগের আগে দৈনিক আজাদের সহ-সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু। দেশভাগের পর দৈনিক আজাদ এবং পরে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। স্পোর্টস ফেডারেশন, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, চ্যানেল ক্রসিং কমিটি, ক্রীড়ালেখক ক্লাব প্রভৃতি সংস্থার সদস্য ছিলেন। ১৯৬৪ সালে গিয়েছিলেন টোকিও অলিম্পিক গেমসে পূর্ব পাকিস্তানের ডেলিগেশন ম্যানেজার হিসেবে। দৈনিক পাকিস্তান, সংবাদ ও অবজারভারে নিয়মিত কলাম লিখতেন। ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর রাজাকাররা তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি।

আ ন ম গোলাম মোস্তফা

জন্ম ১৯৪৩ সালের ১১ ডিসেম্বর নীলফামারীর পঙ্গা গ্রামে। বাবা জহিরুদ্দিন আহমেদ। স্কুলজীবনেই লোখালেখি শুরু। নিয়মিত লিখতেন স্কুল ম্যাগাজিনে। নির্বাচিত হন দিনাজপুর জিলা স্কুলের ছাত্র সংসদের সম্পাদক। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দিনাজপুর জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন দুইবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়ার পর রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। পালন করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া চলাকালীন শুরু করেন সাংবাদিকতা। 'সংবাদ' পত্রিকার বার্তা বিভাগে সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৬তে দৈনিক আজাদে সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে। একই সঙ্গে সম্পাদনা করতেন মাসিক মোহাম্মদী। সম্পাদনা করেছেন 'অন্তরঙ্গ' নামে একটি সাময়িকীও। ১৯৬৯ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় তাঁর লেখা রাজনৈতিক কলাম আন্দোলনে যোগ করে নতুন মাত্রা। ওই বছরের আগস্টে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। একই সঙ্গে সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সেসময় একটি কাজ করতেন, তা হলো– দেশ স্বাধীন হলে কী কী করবেন এর তালিকা তৈরি করা। ১১ ডিসেম্বর ভোর ৪টা। আলবদর বাহিনীর ১২-১৩ জন সশস্ত্র সদস্য গাড়িতে এসে দৈনিক পূর্বদেশ অফিসে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাঁকে নিয়ে যায়। ছোটো ভাই পূর্বদেশ অফিসে গিয়ে জানলেন সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর।

সৈয়দ নাজমুল হক

নাজমুল হকের জন্ম মাতুলালয়ে ১৯৪১ সালের ৫ জুলাই খুলনার কান্দাপাড়া গ্রামে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেখক এমাদুল হক আর মা শামসুন নাহারের পুত্র তিনি। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন এবং ১৯৭০ সালে আবারও এমএ ডিগ্রি নেন সাংবাদিকতায়। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক আইনবিরোধী আন্দোলন এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বরে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তাঁর। এ সময় পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনালের চিফ রিপোর্টার, কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিস ও হংকংয়ের এশিয়ান নিউজ এজেন্সির ঢাকার সংবাদদাতা এবং ঢাকা টাইমসের সিটি এডিটর হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকদের পত্রিকা 'ভিস্তা' সম্পাদনা করেছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পুরো প্রসিডিংয়ের রিপোর্ট করেন তিনি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান '৬৯ সালের অক্টোবরে ইউরোপ ও লন্ডন সফরে গেলে নাজমুল হককে তাঁর একান্ত সচিব হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যান। এ সময় বিবিসি ও লন্ডন টেলিভিশনে অংশগ্রহণ করে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের মতবাদও প্রচার করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু তা যথাযথ রিপোর্ট করার জন্য ডেকে নেন নাজমুলকে। তিনি তা বিভিন্ন পত্রিকায় সঠিকভাবে পরিবেশন করেন। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সঙ্গে একমত পোষণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন দেন এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচারের কথা বিদেশি সংবাদপত্রে পৌঁছান। ৬ আগস্ট বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আটকে রেখে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পীড়ন করে। সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় ২০ সেপ্টেম্বর তাঁকে ঢাকায় এনে নজরবন্দি করে রাখা হয়। আবারও ১৯ অক্টোবর গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে শেখ মুজিবের গোপন বিচারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অমানুষিক নির্যাতন করে। তা সত্ত্বেও মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি তিনি। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁকে ফেরত আনা হয় ঢাকায়।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৪টা। আলবদর বাহিনীর ৮-১০ জন অস্ত্রধারী ৯০নং পুরানা পল্টন বাসায় আসে। তারা তাঁকে চোখ বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে জিপে উঠিয়ে নিয়ে যায়। সেই থেকে তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

একেএম শহীদুল্লাহ (শহীদ সাবের)

শহীদ সাবেরের জন্ম ১৯৩০ সালের ১৮ ডিসেম্বর কক্সবাজারের ঈদগাঁ গ্রামে নানাবাড়িতে। বাবা সালামতউল্লা ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা। মা শরিফা খাতুন। ঈদগাঁ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর মামার সঙ্গে চলে আসেন কলকাতায়। ছোটোবেলা থেকেই প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন সাবের। ১৯৪০ সালে শিশু বয়সেই 'ছোটদের আসর'-এর লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব পালন করেন। ছিলেন 'কিশোর সংঘ' থেকে প্রকাশিত 'ছন্দশিলা' পত্রিকার সম্পাদক। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম লেখা। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আইএ প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাবস্থায় ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এই সংগঠনের কার্যকলাপকে সহজভাবে মেনে নেয়নি মুসলিম লীগ সরকার। ১৯৫০ সালে গ্রেফতার হন সাবের। জেলে থাকাকালীন 'আরেক দুনিয়া থেকে' শীর্ষক লেখাটি সম্পন্ন করেন, যা ছাপা হয় কলকাতার নতুন সাহিত্য পত্রিকায়। চট্টগ্রাম থেকে নেওয়া হয় রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে। বিনা বিচারে জেল খাটেন চার বছর। এ জেল থেকেই আইএ পাস। সেখান থেকে বেরিয়ে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে নৈশ ক্লাসে ভর্তি হয়ে ১৯৫৫ সালে বিএ ডিগ্রি অর্জন। দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক পদে সাহিত্য পাতার দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে অসুস্থ হতে শুরু করেন। সন্‌জীদা খাতুন আর ওয়াহিদুল হকের সংসারে কিছুদিন থাকার পর সংবাদ অফিসে থাকতেন। অস্থিরতা, অসুস্থতা আর এলোমেলো জীবন চলার মাঝেও থেমে থাকেনি তাঁর কলম। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ রাতে সত্য আর প্রগতির কণ্ঠরোধ করে দিতে পুড়িয়ে দেওয়া হয় 'সংবাদ'-এর অফিস। আর সেই আগুনে তাঁর শেষ আশ্রয়ের সঙ্গে পুড়ে যান শহীদ সাবের।

আবুল বাশার

জন্ম টাঙ্গাইল শহরে। বাবা আবদুল গনি চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। ছোটোবেলা থেকেই সাংবাদিকতার প্রতি ছিল তাঁর বাড়তি ঝোঁক। সাংবাদিকতা নিয়ে পড়ালেখা করতে লাহোর গমন। সেখানকার পাঠ চুকিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ। সাংবাদিকতার শুরু ১৯৬৮ সালে ইংরেজি দৈনিক দ্য মর্নিং নিউজে। মনেপ্রাণে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা আবুল বাশার সময়ের ডাকে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সরাসরি যোগ দেন রণাঙ্গনে। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে রণাঙ্গনে একের পর এক অপারেশন চালিয়ে যান। ঢাকার মগবাজারে বঙ্গু আজাদের বাসায় থাকতেন তিনি। মগবাজারের এই বাড়িকে কেন্দ্র করে মুক্তিযোদ্ধাদের এক গেরিলাবাহিনী গড়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে এই বাসা থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ মেলেনি তাঁর।

শিবসাধন চক্রবর্তী

শিবসাধন চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৪৬ সালের ২৫ মার্চ নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ থানার বিরাহিমপুর গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিতবাড়িতে। বাবা হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী। মা সুনীতি প্রভা চক্রবর্তী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শেষে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯৬৯ সালে 'ডেইলি পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতার শুরু। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (গণতদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ২৭ মার্চ) রমনার কালীমন্দির এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন শিবসাধন চক্রবর্তী।

চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান

১৯৪৯ সালে বগুড়া শহরের রহমাননগরে জন্ম চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমানের। বাবা চিশ্‌তী মুন-সুর রহমান, মা সাজেদা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি-সচেতন হেলালুর রহমানের সাংবাদিকতা শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন। ১৯৭১ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়

রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১-এর ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলা পতাকা উত্তোলন দিবসে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের প্যারেডে নেতৃত্ব দেন তিনি। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ইকবাল হল আক্রমণ করলে জানালার কার্নিশে কাটিয়ে দেন সারারাত। ২৬ মার্চ গোলাগুলির শব্দ বন্ধ হওয়ায় কার্নিশ থেকে মাথা তুলতেই এক পাকিস্তানি সেনার নজরে পড়েন। সেখান থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এক মেজরের কাছে। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়েও রেহাই পাননি। প্রথম গুলিটি লাগে তাঁর বুকে। গুলিবিদ্ধ চিশ্‌তীর মুখে মৃত্যুপূর্ব উচ্চারণটি ছিল– 'জয় বাংলা'। সেখানে ক্ষান্ত হয়নি ঘাতকরা। তাঁর মৃতদেহটি নীলক্ষেত পেট্রোল পাম্পে নিয়ে গিয়ে পাম্পের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলে।

মুহম্মদ আখতার

মুহম্মদ আখতারের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১ আগস্ট টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার কিসামত গ্রামে। বাবা মীর মো. হাসান আলী, মা আমেনা খাতুন। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পড়াকালীন শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখে ১৯৫৫ সালে ঢাকায় চলে আসেন জীবিকার তাগিদে। কর্মজীবন শুরু দৈনিক ইত্তেফাকে সংশোধক হিসেবে। ইত্তেফাক ছেড়ে একসময় যোগ দেন রেডিও পাকিস্তানের পাক্ষিক পত্রিকা 'এলান'-এ। পরবর্তী সময়ে সরকারি চাকরি ছেড়ে ইস্টার্ন প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেডের ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় দেশের প্রথম পাক্ষিক ম্যাগাজিন 'ললনা'। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকার আশপাশে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর বাসায় আসত, তাদের অনেককেই তিনি ভারতে যাওয়ার পথ চিনিয়ে দিয়েছেন। মুহম্মদ আখতারের ছোটো ভাই বলেন, ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর, মতান্তরে নিউ নেশনের সম্পাদক আবু মো. মুফাজ্জল বলেন, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পুরানা পল্টনের বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর জামায়াতে ইসলামী, আলবদর বাহিনী মুহম্মদ আখতার, এসএ মান্নান (লাডু), আবু মো. মুফাজ্জলকে চোখ বেঁধে গাড়িতে উঠিয়ে আলবদর বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায়। ১৮ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আশরাফ রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে মুহম্মদ আখতারের প্রায় বিকৃত মৃতদেহটি দেখতে পান। সম্ভব হয়নি অর্ধগলিত লাশটি উঠিয়ে আনা। ওখানেই দাফন করা হয় তাঁকে।

সেলিনা পারভীন

সেলিনা পারভীনের জন্ম ৩১ মার্চ ১৯৩১ সালের নোয়াখালী জেলার ছোট কল্যাণনগর গ্রামে। বাবা মৌলবি আবিদুর রহমান, মা মোসাম্মৎ সাজেদা খাতুন। সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু মুহম্মদ আখতার সম্পাদিত ললনায়। এখানে কাজ করার সময়ই সেলিনা পারভীন নিজের সম্পাদনায় বের করেন 'শিলালিপি' নামে সাহিত্যপত্রিকা। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে 'ললনা' বন্ধ হয়ে গেলে সেলিনা পারভীন ব্যস্ত হয়ে উঠেন 'শিলালিপি' নিয়ে। তখন 'শিলালিপি' বিক্রয়ের লব্ধ অর্থ দিয়ে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন নানাভাবে। ১৯৭১ সালে রাও ফরমান আলীর নির্দেশ অমান্য করে তাঁর পত্রিকার শেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ করেছিলেন– স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের ১১৫নং (তৎকালীন) নিউ সার্কুলার রোডের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় ঘাতকরা। ১৪ ডিসেম্বর গভীর রাতে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সাংবাদিক সেলিনা পারভীনকে।

স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছ তোমরা; কিন্তু দেখে যেতে পারনি স্বাধীনতা। তোমরা আছ স্বাধীন এই বাংলার শ্যামলে-সবুজে, ফুলে-ফলে, সব উন্নয়নে, সাফল্যে। বিজয়ের এই মাসে তোমাদেরই চরণ ছুঁয়ে যাই।

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

লেখক: সহকারী সম্পাদক, দ্য নিউজভিউজ বিডি ডটকম

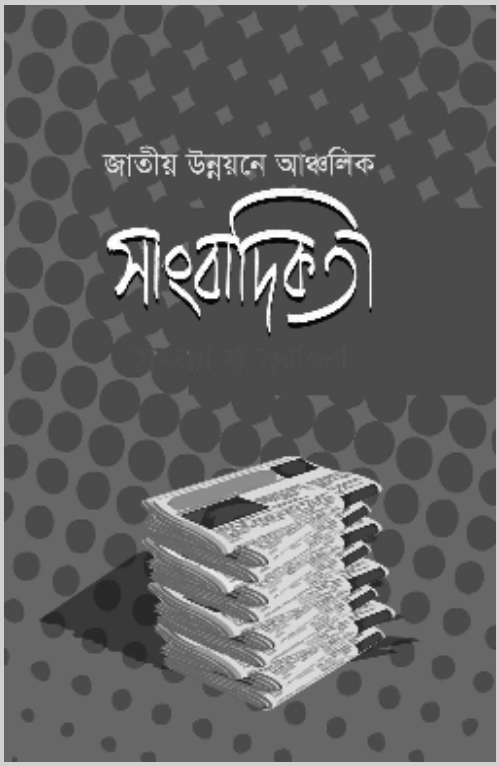

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা